ইভান ইয়েফ্রেমভ ◦ কিনার রাজ্য

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

ইভান ইয়েফ্রেমভ

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

সূচী

পৃঃ

মুখবন্ধ ৭

প্রথম অধ্যায়। ভাস্করের শিষ্য ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়। ফেনার রাজ্য ৪৮

তৃতীয় অধ্যায়। ফারাও'র ক্রীতদাস ৮৪

চতুর্থ অধ্যায়। মুক্তিসংগ্রাম ১১৭

পঞ্চম অধ্যায়। সোনার প্রান্তর ১৭০

ষষ্ঠ অধ্যায়। অন্ধকার পথ ২১৩

সপ্তম অধ্যায়। বনের শক্তি ২৫৪

অষ্টম অধ্যায়। বাতাসের সন্তান ২৯৬

মুখবন্ধ

নেভার কম্পিত বুকের উপর হেমন্তের তাজা বাতাস। ঝলমলে রোদে পিটার আর পল দুর্গের দীর্ঘ সরু চূড়া সোনালি রেখার মতো নীল আকাশের চাঁদোয়াটাকে ফুঁড়ে দিয়েছে। তার নিচেই প্রাসাদসেতু মোহন ভঙ্গীতে তার চওড়া পিঠ বাঁকিয়ে দাঁড়িয়েছে ঢেউয়ের উপর। উন্মথিত ঢেউ জ্বলে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বাঁধের গ্রানিট বাঁধান সিঁড়ির গায়ে।

বেঞ্চিতে বসা একটি তরুণ নাবিক হাতের ঘড়িটা দেখেই লাফিয়ে উঠে বাঁধের উপর দিয়ে চলে গেল এড্‌মিরাল্টির বাড়িটা পার হয়ে। বাড়িটার হলুদে দেয়ালগুলোর শ্বেত স্তম্ভের মুকুট উঠে গেছে হেমন্তের স্বচ্ছ আকাশে। পিচের রাস্তা ধরে নিঃশব্দে চলেছে গাড়ি, তাদের কাচে ও নানা রঙের গায়ে সূর্যের আলোর খেলা। ছেলেটি হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে চলেছে, চারদিকের ব্যস্ততার প্রতি তার কোন নজরই নেই। বেশ হাল্‌কা দৃঢ় পদক্ষেপে সে চলেছে, হাঁটার পরিশ্রমে গরম হয়ে ওঠাতে জাহাজী টুপিটা ঠেলে দিল মাথার পিছনে। তারপর হেমন্তী রঙের আগুন-লাগা

একটা বাগান পার হয়ে একটা ফাঁকা জায়গাকে পাশে রেখে সে এসে দাঁড়াল হার্মিটাজ মিউজিয়মের দোরগোড়ায়। মিউজিয়মের পালিশ করা গ্রানিটের দুটো বিরাট মূর্তি ধরে রেখেছে কুঁজো পথটার উপরে মস্ত ঝুলবারান্দাটাকে। বিরাট মূর্তিদুটোর গায়ের পলস্তরায় বোঝা যায় জার্মান বোমার দাগ। ভারি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে ছেলেটি তার কালো ওভারকোটটা খুলে ফেলে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল সাদা গ্রানিটের চওড়া সিঁড়ির দিকে। প্রায়ান্ধকার ভেস্‌টিব্যুল থেকে সিঁড়িটা গিয়ে পড়েছে শ্বেত স্তম্ভশোভিত বারান্দায়, সামনে গ্রানিটের মূর্তির সারি।

একটি দীর্ঘাঙ্গী তন্বী তরুণী হাসিমুখে ছেলেটির দিকে এগিয়ে এল। তার একটু দূরে দূরে বসান উৎসুক চোখদুটি যেন হয়ে উঠল আরো কালো, আরো আবেগভরা। ছেলেটি একটু লজ্জিত ভাবে তার দিকে তাকিয়ে দেখল মেয়েটি তার ওভারকোট রাখার চাকতিটি ব্যাগে ভরে রাখছে। বুঝতে পারল তবে তার দেরী হয়নি। ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই সে প্রস্তাব জানাল প্রাগৈতিহাসিক শাখাটা থেকে মিউজিয়ম দেখা সুরু করার।

দর্শকদের ভিতর দিয়ে তারা চলল স্তম্ভসারি পেরিয়ে — উজ্জ্বল রঙিন চিত্রশোভিত ছাদটাকে তারা ধরে রেখেছে। পার হয়ে গেল কয়েকটি বড় ঘর। বহু পুরনো ফুলদানি, অজানা ভাষার শিলালিপি, প্রাচীন মিশরের বিষণ্ণ কালো মূর্তি, শবাধার, মামি প্রভৃতি নানা রকম অন্ত্যেষ্টি উপকরণে নিচের তলার বিমর্ষ গ্যালারিগুলিতে যেন আরো হাঁপ ধরে যায়। এ সব দেখে উজ্জ্বল রং আর সূর্যালোকের জন্য তরুণতরুণী দুটি অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। উপরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা। তাড়াতাড়ি আরো দুটো ঘর পার হয়ে তারা এসে পড়ল পাশের একটা সিঁড়িতে। সিঁড়িটা উঠেছে ছোট্ট একটা ঘর থেকে, যার সরু সরু লম্বা জানলাগুলো দিয়ে চোখে পড়ে ম্লান আকাশ। সাদা স্তম্ভগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে একাধিক আটকোণা কনিক্যাল শো-কেস। কিন্তু তার ভিতরকার প্রাচীন শিল্পের ছোটখাট নিদর্শনে দর্শকদের তেমন কোন আকর্ষণ নেই মনে হল।

হঠাৎ তৃতীয় শো-কেসে মেয়েটির চোখে পড়ল সুন্দর সবুজে-নীলে মেশান এক অপূর্ব আলো, এত উজ্জ্বল যে মনে হল জিনিসটা নিজেই বুঝি আলোর উৎস। মেয়েটি তার সঙ্গীকে শো-কেসের কাছে নিয়ে গেল। রুপোলি ভেলভেটের ঢালু গায়ে বসান রয়েছে একটা চ্যাপ্টা পাথর, ধারগুলো একটু গোল। পাথরটি অসাধারণ রকম নির্মল আর স্বচ্ছ। সবুজে-নীলে মেশান রং যেমন উজ্জ্বল, তেমনি গভীর হাল্কা আর খুসিতে ভরা। মানুষের হাতে মসৃণ করা তার গায়ে তীক্ষ্ম রেখায় খোদাই করা ছিল কড়ে আঙুলের সমান ছোট ছোট মানুষের মূর্তি।

স্বচ্ছ পাথরটির রং, উজ্জ্বলতা আর আলো ঘরের বিষণ্ণ কঠোরতা আর হেমন্ত আকাশের ম্লান আভার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সঙ্গীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পেঁছল মেয়েটির কানে। সে দেখল তার চোখদুটি স্মৃতিতে স্বপ্নাচ্ছন্ন।

'ঠিক যেন দক্ষিণ সমুদ্রের একটি সুন্দর বিকেল,' তরুণ নাবিকটি ধীরে ধীরে বলল। তার কথায় ফুটে উঠছে প্রত্যক্ষদর্শীর দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি।

'তা আমি দেখিনি,' মেয়েটি বলল, 'তবে এই পাথরটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি কেমন এক গভীরতা, আলো কিংবা আনন্দ ... ঠিক বোঝাতে পারব না ... এমন পাথর কোথায় পাওয়া যায় ?'

শো-কেস চারটের সাধারণ পরিচয়নামায় লেখা রয়েছে: 'আন্তায় সমাধি, সপ্তম শতক, মধ্য নীপার অঞ্চল, রস্ নদী।' ঐ বিশেষ শো-কেসটার ভিতর আর একটা লেখা: 'গ্রেবেনেৎস সমাধি, প্রাচীন গোষ্ঠীর দেবালয়।' দুটোর একটাতেও কিছুই বোঝা গেল না। ঐ অত্যাশ্চর্য পাথরটার চারপাশের আর জিনিসগুলোও সমান দুর্বোধ্য: মর্চে পড়া বিশ্রী ভাঙা ছুরি আর বর্শার ফলা — দেখে চেনাই যায় না, চ্যাপ্টা পাত্র, কালো ব্রোঞ্জের আর রুপোর ট্র্যাপেজিয়াম আকারে একধরনের দুল।

'এসব কিয়েভ অঞ্চলে পাওয়া গেছে,' ছেলেটি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল, 'কিন্তু উক্রেনে যে আবার এ জাতীয় পাথর কোথাও পাওয়া যায়, তা তো

জানতাম না… কাকে জিজ্ঞেস করি ?' বিরাট গ্যালারির চারদিকটা ছেলেটি চেয়ে দেখল।

দুর্ভাগ্যবশত মিউজিয়মের গাইড্‌রা তখন কেউ ধারেকাছে ছিল না, কেবল সিঁড়ির কাছে চেয়ারের উপর বসে ছিল জিনিসপত্র তদারকী করার মেয়েটি।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। নেমে এলেন একজন লম্বা ভদ্রলোক, পরনে তাঁর সযত্নে ইস্ত্রী করা কালো স্যুট্‌। যে ভাবে চেয়ারে-বসা মেয়েটি চট করে উঠে পড়ে ভদ্রলোককে সমীহভরে অভিবাদন জানাল তা থেকে তরুণীটি আঁচ করল, ভদ্রলোকটি মিউজিয়মের বেশ একজন হোমরাচোমরা কেউ। সঙ্গে সঙ্গে সে তার সঙ্গীকে ছোট্ট একটা ঠেলা মারল। ছেলেটি অবশ্য তার আগেই এগিয়ে গেছে নবাগত ভদ্রলোকটির দিকে। সামরিক কায়দায় এটেনশন হয়ে সে বলতে সুরু করল:

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

বৈজ্ঞানিকটি বললেন, 'নিশ্চয়। কী জানতে চান বলুন?'

দূরের জিনিস দেখতে পান না বলে ভদ্রলোক চোখ কুঁচকে ছেলেটি আর মেয়েটিকে ভাল করে চেয়ে দেখলেন।

ছেলেটি তাদের কৌতূহলের সামগ্রীটির কথা বলতে ভদ্রলোক হেসে উঠে বললেন:

'বাঃ, ভাল জিনিসের প্রতি আপনার তো বেশ নজর আছে দেখছি! আমাদের মিউজিয়মের সবচেয়ে কৌতূহলজনক সামগ্রীর একটির ওপর চোখ পড়েছে আপনার। খোদাইয়ের কাজটা ভাল করে দেখেছেন?.. দেখেননি?.. বড় ছোট? এটা কী করতে আছে? দেখুন এবার!' শো-কেসের মাথার কাছে লাগান একটা কাঠের ফ্রেম ভদ্রলোক কাচের উপর বসিয়ে দিলেন। ঠিক পাথরটার উপরে বিরাট এক ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস। ভদ্রলোক একটা সুইচ টিপে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কাচটার উপর এসে পড়ল উজ্জ্বল আলো। আগের চেয়ে আরো দ্বিগুণ উৎসাহে ছেলেমেয়ে দুটি ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসের উপর ঝুঁকে পড়ল। খোদাই-করা মূর্তিগুলি অনেক বড় হয়ে যেন সজীব হয়ে উঠল। স্বচ্ছ সবুজ-নীল পাথরটার

একধারে খুব সূক্ষ্ম স্বল্প রেখায় রূপায়িত একটি নগ্ন মেয়ে, ডান হাতটি তার গালে ঠেকান। নরম পেলব কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়েছে গোছা গোছা ঘন কোঁকড়া চুল।

পাথরের বাকি অংশটায় পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটি পুরুষ। পুরুষদের মূর্তিগুলিতে নারীমূর্তিটির চেয়েও বেশি নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে।

সুগঠিত পেশীবহুল মূর্তি তিনটিকে ধরা হয়েছে গতির মুহূর্তে। তাদের সেই ভঙ্গী শক্তিশালী উদ্যত অথচ সংযত। মাঝখানের সবচেয়ে লম্বা বিরাটকায় লোকটি তার হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়েছে পাশের দুজনের কাঁধের উপর। পাশের লোকদুটি বর্শা নিয়ে সমনোযোগে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন শত্রুর আক্রমণ ফেরাতে তারা প্রস্তুত। শক্তিশালী যোদ্ধার সতর্কতা ফুটে উঠেছে তাদের ভঙ্গীতে।

ছোট্ট ঐ তিনটি মূর্তি মহাশিল্পীর সৃষ্টি। ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব আর সহসংগ্রাম — এই মূল ভাবটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অসাধারণ শক্তিতে।

এই শিল্পকার্যের উপাদান আর পটভূমির কাজ করছে উজ্জ্বল স্বচ্ছ পাথরটি, তার মোহনীয়তায় মূর্তিগুলির সৌন্দর্য আরো বেড়েছে। এক স্বচ্ছ কবোষ্ণ আভা পাথরটার যেন গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে সোনার রোদের খুসিতে ভরে দিয়েছে জড়িয়ে-ধরা লোক তিনটিকে ...

মূর্তিগুলির নিচে আর পাথরটার ভাঙা মসৃণ কিনারায় তাড়াহুড়ো করে কেটে দেওয়া হয়েছে কতগুলো দুর্বোধ্য দাগ।

'ভাল করে দেখেছেন? বেশ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছেন দেখছি।' পণ্ডিতের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল ছেলেমেয়ে দুটি। 'আচ্ছা। যদি চান তো পাথরটার কথা আপনাদের কিছু বলতে পারি। অতীতের ঐতিহাসিক নজিরে এজাতীয় ধাঁধা মাঝে মাঝে আমাদের হাতে আসে। ধাঁধাটা শুনুন তাহলে। পাথরটা হচ্ছে পান্না। এমনিতে খুব একটা দুর্লভ জিনিস নয়। কিন্তু এরকম স্বচ্ছ সবুজে-নীলে মেশান পান্না খুবই দুর্লভ। একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া আর কোথাও এ পাথর পাওয়া যায় না। এই হচ্ছে প্রথম বক্তব্য। পাথরের গায়ের এই খোদাই কাজকে বলে ক্যামিও।

হেলিনীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ পর্বে গ্রীসে এ জাতীয় জিনিসের অত্যন্ত সমাদর ছিল। পান্না খুবই শক্ত পাথর। তার উপর এমন নিখুঁৎভাবে খোদাই করার জন্য যে হীরার প্রয়োজন গ্রীক ভাস্করদের সে হীরা ছিল না। এই গেল দ্বিতীয় বক্তব্য। এর পর আসে ঐ তিনটি পুরুষমূর্তির কথা — মাঝখানের লোকটি নিঃসন্দেহে নিগ্রো, ডান দিকের জন গ্রীক, বাঁদিকেরটি কোন ভূমধ্যসাগরীয় জাতির লোক, ক্রীটান কিম্বা এট্রাস্‌কান। শেষ কালে, আঙ্গিক আর শিল্পগুণ দেখে বোঝা যায় যে, গ্রীক ইতিহাসের অত্যন্ত সমৃদ্ধির কালেই এর সৃষ্টি। কিন্তু তবু এতে এমন সব চিহ্ন আছে যা দেখে মনে হয় এর সৃষ্টি অনেক আগে। তারপর বর্শার চেহারাটাও বড় অদ্ভুত, গ্রীস বা মিশরে ওরকম বর্শা দেখা যায় না ... তা ছাড়া আরো কয়েকটা পরস্পরবিরোধী দুর্বোধ্য তথ্য আছে ... কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্যামিওটি চোখের সামনে জাজ্বল্য বর্তমান ...'

পণ্ডিত একটু থেমে তারপর আবার আগেকার মতো বিনা ভণিতায় সুরু করলেন:

'ইতিহাসের আরো অনেক ধাঁধা আছে। তার প্রত্যেকটি দেখেই বুঝতে পারি: আমাদের জ্ঞান কত কম। প্রাচীন কালের জীবন নিয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি খুবই সংকীর্ণ। আমাদের স্বর্ণভাণ্ডারে শকদের শিল্প সংগ্রহের মধ্যে একটা সোনার বক্‌লস আছে। দুহাজার ছশ' বছরের পুরনো। তার গায়ে খুঁটিয়ে আঁকা বিলুপ্ত ছুরি-দাঁত বাঘের ছবি। জীবাশ্ম-বৈজ্ঞানিকদের মতে ছুরি-দাঁত বাঘ তিন লক্ষ বছর আগেই লোপ পেয়েছে ... তারপর মিশরী দেয়ালচিত্রেও দেখবেন মিশরের সবরকম জীবজন্তুর ছবি কী নিখুঁৎভাবেই না আঁকা হয়েছে। তাদের মধ্যে আছে বিরাট হায়েনার মতো বিপুলকায় এক অজানা জন্তু — মিশরে, এমন কি সারা আফ্রিকাতে, এ জাতীয় জন্তু একেবারেই অপরিচিত। কায়রো মিউজিয়মে একটি মেয়ের মূর্তি আছে। মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল খৃষ্ট পূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত আখেতাতোন নগরীর ধ্বংসাবশেষে। মূর্তির মেয়েটি কিন্তু মিশরী নয়, কাজটাও অন্য দেশী, একেবারে অন্য জগতের যেন। আমার সহকর্মীরা বলবেন মূর্তির কাজটা

কন-ভেন্-সনা-লিজ্ম,' পণ্ডিত একটু বিদ্রূপের ভাবে টেনে টেনে বললেন। 'এ সূত্রে সর্বদা আরেকটা গল্পের কথা মনে পড়ে। মিশরী দেয়ালচিত্রে প্রায়ই একজাতের ছোট্ট মাছ দেখতে পাবেন। ছোট্ট মাছ, কিছুই বৈশিষ্ট্য নেই, কেবল প্রত্যেক ছবিতেই মাছটা উল্টো হয়ে আছে, পেটের দিকটা উপরে। মিশরীদের ছবি সবসময় এত নিখুঁৎ ও যথাযথ, তাই প্রশ্ন জাগে, এরকম অস্বাভাবিক মাছ তারা আঁকল কী করে। ব্যাখ্যার অবশ্য অভাব হয়নি: কেউ বলল কনভেন্সনালিজ্ম, কেউ বলল ধর্ম প্রভাব, এমন কি আমোন্ দেবের উপাসনা। বেশ বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা, সবাই সন্তুষ্টও হল। তারপর হঠাৎ জানা গেল নীল নদীতে আজও ওরকম মাছ পাওয়া যায় — উপর দিকে পেট করেই তারা সাঁতার কাটে! জানবার জিনিস বটে!.. কিন্তু দেখুন, কথায় কথায় ওদিকে সময় চলে যাচ্ছে! আচ্ছা আসি তাহলে, ইতিহাসের ধাঁধাগুলো সত্যিই অদ্ভুত ...'

মেয়েটি বলে উঠল, 'এক মিনিট, অধ্যাপক! মাপ করবেন, এই ধাঁধাটার উত্তর আপনি কি দিতে পারেন না ... পাথরটা সম্বন্ধে আপনার কী মত তা জানতে চাই ...' অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেল মেয়েটি।

পণ্ডিত হেসে বললেন:

'আপনাদের হাত থেকে কিছুতেই ছাড়ান নেই দেখছি। যা বলব তা আমার আন্দাজ মাত্র। একটা কথা অবশ্য নিশ্চিত যে, প্রকৃত শিল্প হল জীবনের রূপায়ণ এবং শিল্প নিজেও সজীব, মহত্ত্বের সর্বোচ্চ শিখরে সে ওঠে পুরাতনের সঙ্গে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই। দূর অতীতে, এই ক্যামিওটি সৃষ্টির যুগে যে দাসত্ব আর উৎপীড়ন ছিল তার তুলনা হয় না। বহু লোক সারা জীবন কাটিয়েছে অসীম দুঃখভোগের মধ্যে। কিন্তু উৎপীড়িত যারা তারা মাঝে মাঝে অস্ত্রধারণ করেছে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে। এই ক্যামিওটি দেখলে মনে হয় মুক্তির লড়াইয়ের ভিতর দিয়েই এই তিনটি লোকের বন্ধুত্বের জন্ম ... হয়ত দাসত্বের হাত থেকে এরা মাতৃভূমিতে পালিয়েছিল ... আমার তো মনে হয়, এই ক্যামিওটি কালের গর্ভে বিলীন অতীত সংগ্রামের সাক্ষ্য। হয়ত এই অজানা শিল্পী নিজেও সেই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন ... সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর নিশ্চয়

যোগ ছিল, তা না হলে এমন নিখুঁৎ সৃষ্টি সম্ভব হত না। আর আপনারাও এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন না।*

বিপুল তথ্যভারে আত্মহারা হয়ে তরুণতরুণী দুটি আবার ঝুঁকে পড়ল ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের উপর। পাথরটা যেন আরো রহস্যময়, আরো দুর্বোধ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল।

সমুদ্রের নির্মল স্বচ্ছ গভীর রং ... তার উপর ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ তিনটি পুরুষ। ভাস্বর দ্যুতিময় পাথর আর নিখুঁৎ নগ্ন মূর্তি তিনটির উপর সোনালি ছটা মিউজিয়মের শীতল নিষ্প্রভ পরিবেশে আরো বেশি করে ফুটে উঠেছে। সজীবতা আর নারীত্বের মোহনীয়তায় ভরা তরুণীটি যেন দাঁড়িয়ে আছে সাগরতীরে।

নাবিকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তার টনটনিয়ে ওঠা পিঠটা সোজা করে নিল। মেয়েটি তখনো পাথরটার দিকে তাকিয়ে। বারান্দায় শোনা গেল একদল লোকের পায়ের শব্দ আর কথাবার্তা। মিউজিয়ম দেখতেই এরা এসেছে। মেয়েটি শো-কেসের কাছ থেকে সরে গেল। সুইচের ক্লিক, ফ্রেমটা তুলে ফেলা হল, সবুজ-নীল পাথরটি জ্বলতে থাকল তার ভেলভেট আসনের উপর।

'আবার এখানে আসব, কী বল?' নাবিকটি বলল।

'নিশ্চয়,' মেয়েটি জবাব দিল।

মেয়েটির হাতটা আলতোভাবে টেনে নিল ছেলেটি, তারপর গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে দুজনে উঠে গেল শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে।

---

* লেনিনগ্রাদের হার্মিটাজ মিউজিয়মে বা অন্য কোনো মিউজিয়মে এরকম ক্যামিও আসলে কিন্তু নেই।

ভাস্করের শিষ্য

চ্যাপ্‌টা পাথরটা সমুদ্রের অনেক দূরে এসে পড়েছে। রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য সমুদ্র পাথরের পায়ের কাছে এসে পড়ছে ক্ষীণ তরঙ্গভঙ্গে। সারাদিন রোদ খেয়েছে পাথরটা, তাই পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ছুটে-আসা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলকে পাথরে বসা তরুণটির এতটুকুও অসুবিধা হল না।

দূরে যেখানে ছায়াপথের রুপোলি হারের প্রান্তটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে ছেলেটি সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। দেখছে আকাশ থেকে তারাদের ঝরে পড়া; এক ঝাঁক তারা আকাশের গায়ে তাদের আগুনকাঁটা

বিঁধিয়ে জ্বলে উঠে জলের বুকে ঝরে পড়া জ্বলন্ত তীরের মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে দিগন্তের ওপারে। আকাশের বুকে আবার জ্বলে উঠে আগুন-তীরগুলি উড়ে চলেছে অজানার দেশে, সাগর পেরিয়ে ওইকুমেনার* প্রান্তে রয়েছে যে সব উপকথার দেশ সেইখানে।

"তারারা কোথায় ঝরে পড়ে দাদুকে জিজ্ঞেস করতে হবে," ছেলেটি মনে মনে বলল। তারপর ভাবতে লাগল আকাশের বুক চিরে অজানার উদ্দেশে উড়ে যেতে পারলে কী চমৎকারই না হত।

কিন্তু তার কৈশোর ত ফুরিয়ে এসেছে, আর কয়েকদিন পরেই সে পা দেবে যোদ্ধার বয়সে। কিন্তু যোদ্ধা সে কখনো হবে না। সে হবে বিখ্যাত শিল্পী, সর্বজনপরিচিত ভাস্কর। প্রকৃতির সত্যিকার রূপ দেখার, অনুভব করার, মনে রাখার সহজাত ক্ষমতা তার আছে। সেই ক্ষমতাই অন্যদের থেকে তাকে পৃথক করে তুলেছে... তার শিক্ষক আগেনর্ তাই বলেন। আর সত্যিই তাই। অন্যেরা যে জায়গা পার হয়ে যায় কোন কিছু লক্ষ্য না করে সে সেখানে গভীর বিস্ময়ে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যায়। দুচোখ ভরে দেখে নেয় বোধ এবং ব্যাখ্যার অতীত কিছুকে। প্রকৃতির অসংখ্য রূপ তাদের নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের মোহনীয়তায় তাকে মুগ্ধ করে রাখে। পরে তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। সুন্দরকে সে আলাদা করে চিনতে শিখেছে, ধরে রাখতে শিখেছে স্মৃতিতে। সব কিছুতেই সে দেখতে পেয়েছে অধরা মাধুরী — ঢেউয়ের বাঁকা চুড়োয়, হাওয়ায় আন্দোলিত তেস্সার চুলে, পাইন গাছের কাণ্ডে, সাগরতীরে উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকা ভয়াবহ পাহাড়ে। সে ঠিক করেছে সুন্দর রূপের সৃষ্টিই হবে তার জীবনের লক্ষ্য। নিজে থেকে যারা সৌন্দর্যকে খুঁজে পায় না তাদের কাছে তার প্রকাশ সে ঘটাবে। মানুষের শরীরের চেয়ে সুন্দর আর কী আছে! সেই সৌন্দর্য গড়ে তোলাই হল কঠিনতম কাজ ...

এই কারণেই তার চারপাশে যে সব দেবতা, বীরদের মূর্তি রয়েছে, যাদের মূর্তি গড়ার কাজ তাকে শিখতে হয়েছে, তাদের মধ্যে কোথাও

---

* ওইকুমেনা — মহাসাগর পরিবেষ্টিত প্রাণিজগতের প্রাচীন গ্রীক নাম।

তার স্মৃতিতে সঞ্চিত সজীব ছাপ দেখা যায় না। এমনকি এনিয়াদা*র সবচেয়ে দক্ষ শিল্পীও পারে না সজীব মানুষের শরীরের সত্যিকার ভাল মূর্তি গড়ে তুলতে।

ছেলেটি তার সহজাত বোধ থেকে বুঝতে পারল যে, আনন্দ ইচ্ছাশক্তি রাগ বা কোমলতা প্রকাশের কয়েকটা রেখাকে এইসব মূর্তিতে রূঢ়ভাবে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখান হয়েছে। কয়েকটি বিশেষ রেখাকে এরকম কৃত্রিমভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় শিল্পী অন্য সবকিছুকে দিয়েছে বিসর্জন। সে কিন্তু শিখবে সৌন্দর্যের রূপায়ণ! তবেই সে তার দেশের সবচেয়ে বড় ভাস্কর হয়ে উঠবে, জনগণ তাকে মেনে নেবে বড় শিল্পী বলে, তারিফ করবে তার সৃষ্টির। তার শিল্পই সর্বপ্রথম জীবনের সৌন্দর্যকে ব্রোঞ্জ বা পাথরে অমর করে রাখবে!

ছেলেটি তার স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল। পাথরের গায়ে একটা মস্ত ঢেউ এসে ভেঙে পড়ল। কয়েক ফোঁটা জল তার মুখে পড়ল। চমকে জেগে উঠে সে অন্ধকারেই অপ্রস্তুতভাবে হাসল। তার স্বপ্ন লুকিয়ে রয়েছে ভবিষ্যতের অতল গর্ভে... এখন তো খালি গুরু আগেনরের কাছে কাজের স্থূলতার জন্য তাকে ধমক খেতে হচ্ছে। গুরুর কথা কী করে জানি না সব সময়ই ঠিক প্রমাণিত হয় ... তারপর দাদু? পান্দিওনের শিল্পের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ নেই। তিনি নাতিকে বিখ্যাত কুস্তিগীর করে তোলার জন্য তালিম দিচ্ছেন। শিল্পীর যেন শক্তির দরকার! তবু দাদু যে তাকে তালিম দিয়ে অসাধারণ শক্তসমর্থ করে তুলেছেন, সেটা ভালই হয়েছে। গ্রামে সান্ধ্য প্রতিযোগিতায় শক্তির প্রমাণ দিতে পান্দিওনের ভালই লাগে, গুরুর মেয়ে তেস্‌সা যে সেখানে উপস্থিত থাকে। তার চোখে প্রশংসার চমকে কতই না আনন্দ!

গালদুটো গরম হয়ে উঠেছে। ছেলেটি লাফিয়ে উঠে পড়ল। শরীরের প্রতিটি মাংসপেশী টান টান হয়ে উঠেছে। বুক ফুলিয়ে সে দাঁড়াল, যেন

---

* এনিয়াদ — উত্তর গ্রীসের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে একটি দেশ। বোঝা যায়, এ হল গ্রীক ইতিহাসের আদি পর্বের কথা, ক্লাসিকাল যুগেরও আগের।

বাতাসকেই যুদ্ধে আহ্বান করছে। আকাশের তারাদের দিকে মুখ তুলে হঠাৎ স্মিত হাসি হাসল।

পাথরের কিনারায় ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ছেলেটি নিচের অতল অন্ধকারের দিকে একবার তাকাল। তারপর জোরে চীৎকার করে উঠে লাফিয়ে পড়ল নিচে। সঙ্গে সঙ্গে সজীব হয়ে উঠল সেই শান্ত নিস্তব্ধ রাত্রি। পাথরের নিচে সমুদ্র। তার জল ছেলেটির উত্তপ্ত শরীরকে জড়িয়ে ধরল শীতল আলিঙ্গনে। তার হাত আর কাঁধের কাছে জ্বলে উঠল ছোট ছোট আগুনের ফোঁটা।

ঢেউগুলো যেন খেলায় মেতে ছেলেটিকে উপরে ছুঁড়ে পেছনে ফেলে দিতে চায়। অন্ধকারে সাঁতার কাটতে কাটতে ঢেউয়ের ওঠানামা ছেলেটি অনুভব করে সামনে হঠাৎ জেগে-ওঠা উঁচু ঢেউয়ের মাথায় শান্ত হয়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিল। মনে হল, সমুদ্রের যেন শেষ নেই, তল নেই, যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে অন্ধকার আকাশ আর সাগর।

একটা বড় ঢেউ ছেলেটিকে অনেক উঁচুতে তুলে ফেলল। পান্দিওনের চোখে পড়ল তীরের বুকে দূরের একটা লাল আলো। একটা হাল্কা ভঙ্গী আর বশমানা ঢেউ তাকে নামিয়ে দিয়ে গেল তীরের প্রায় অদৃশ্য এক বালিভূমিতে।

ঠাণ্ডায় অল্প একটু কাঁপতে কাঁপতে সে আবার সেই চ্যাপ্‌টা পাথরটার উপর উঠে গুটিয়ে নিল তার মোটা পশমী জোব্বাটা। তারপর সমুদ্রতীর ধরে দৌড়তে লাগল সেই লাল আগুনের দিকে।

পোড়া শুকনো ডালপালার সুগন্ধি ধোঁয়া অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। কাছাকাছির ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকেই যোগাড় করা হয়েছে ডালপালাগুলো।

ম্লান আলোয় দেখা যাচ্ছে রুক্ষ পাথরের তৈরী ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর, বেরিয়ে আছে তার খড়ের চালাটা। একটা একলা প্লেনগাছের বহুদূর ছড়িয়ে পড়া ডালপালা কুঁড়েঘরটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে রোদজলের হাত থেকে। গায়ে ছাইরঙা জোব্বা চাপিয়ে এক বুড়ো আগুনের ধারে বসে আপন মনে কী যেন ভাবছে। পায়ের শব্দ শুনে বুড়ো তার হাসিভরা

বলিরেখা আঁকা মুখটা সেদিকে ফেরাল। পাকা কোঁকড়া দাড়িতে রোদেপোড়া মুখটা যেন আরো বেশি পোড়া বলে মনে হচ্ছে।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলি, পান্দিওন?' বুড়ো একটু ভর্ৎসনার স্বরে জিজ্ঞেস করল। 'আমি কখন এসে বসে আছি। তোর সঙ্গে একটা কথা বলা দরকার।'

'তুমি যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে তা ভাবতে পারিনি,' পান্দিওন বলল, 'স্নান করতে গিয়েছিলাম। এখন সারারাত ধরে তোমার কথা শুনতে আমি প্রস্তুত।'

বুড়ো মাথা নেড়ে বলল:

'না, কথাটা শেষ হতে অনেক সময় লাগবে। তোকে আবার কাল খুব সকাল সকাল উঠতে হবে। কাল তোর একটা পরীক্ষা নিতে চাই। কাজেই পুরো তাগদ প্রয়োজন। কিছু তাজা হাতরুটি আছে — নতুন নিয়ে এসেছি — আর এই মধু। আজ উৎসবের ভোজ, ঠিক যোদ্ধার মতো তোর খাওয়া চাই — অল্প খাবি, লোভ করবি না।'

হাতরুটির একটা টুকরো ভেঙে নিয়ে পান্দিওন তার সাদা দিকটা মধুর ভাঁড়ে ডুবিয়ে নিল। খেতে খেতে সে স্থিরদৃষ্টে চেয়ে রইল দাদুর দিকে। বুড়োও তখন স্নেহভরে চেয়ে আছে নাতির দিকে, মুখে একটিও কথা নেই। দাদু আর নাতি দুজনের চোখই একরকম, অসাধারণ সংহত সূর্য-রশ্মির মতো উজ্জ্বল সোনালি। লোকে বলে এরকম চোখ যাদের, তাদের পূর্বপুরুষদের জন্ম উচ্চতার সন্তান সূর্যদেব হিপেরিয়নের পার্থিব প্রেমের ফলে।

'দাদু, তুমি আজ চলে যাবার পর তোমার কথাই ভাবছিলাম,' পান্দিওন বলল। 'আচ্ছা দাদু, অন্য চারণরা তাদের গান ছাড়া আর কিছুই জানে না, অথচ তবু কেমন ভাল বাড়িতে থাকে, পেট পুরে খেতে পায়! আর তুমি কত কিছু জান, কত সুন্দর সুন্দর গান বেঁধেছ তবু তোমায় সমুদ্রের বুকে ঘুরে মরতে হয়। কেন? নৌকো চালান এখন তোমার পক্ষে খুবই কষ্টের কাজ। অথচ আমি ছাড়া তোমায় সাহায্য করার আর কেউ নেই। ক্রীতদাস আমাদের একটাও নেই।'

বুড়ো হাসিমুখে তার শুকনো শিরা-ওঠা হাতটা পান্দিওনের কোঁকড়া চুলে রাখল।

'এই নিয়েও কাল তোর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আজ রাত্রে কেবল এই কথাই বলি: দেবতাদের বিষয়ে, লোকজনদের নিয়ে নানারকম গান বাঁধা যায়। নিজের প্রতি খাঁটি হলে, চোখ খোলা থাকলে তোর গান জমিদার আর যোদ্ধাসর্দারদের কানে মধুর শোনাবে না। ফলে দামী উপহার, ক্রীতদাস বা খ্যাতি কিছুই তোর কপালে জুটবে না। বড়লোকদের প্রাসাদে তোর নাম শোনা যাবে না, সম্ভব হবে না গান গেয়ে সংসার চালান ... চল, শোবার সময় হয়েছে,' বুড়ো কথাটা হঠাৎ শেষ করে দিল। 'ঐ দেখ, রাত্রির রথ* এরমধ্যেই আকাশের অন্যপ্রান্তে ঢলে পড়েছে। রথের কালো ঘোড়াগুলো খুব জোর ছোটে, অথচ শক্তিমান হতে হলে বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন। চল।' জীর্ণ কুঁড়েঘরের সরু দরজাটার দিকে বুড়ো এগিয়ে গেল।

পরদিন খুব সকালে বুড়ো পান্দিওনকে জাগিয়ে দিল।

হেমন্তের ঠাণ্ডা দিন এগিয়ে আসছে; আকাশ মেঘে ভরা, কনকনে হাওয়া সাড়া তুলেছে শুকনো নলখাগড়া আর প্লেনগাছের পাতায়।

দাদুর কড়া তত্ত্বাবধানে পান্দিওন ব্যায়াম করে নিল। সেই শিশুকাল থেকে প্রতিদিন সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় সে এই ব্যায়াম করে আসছে। আজ কিন্তু দাদু সবচেয়ে কঠিন ব্যায়ামগুলো বেছে বেছে বেশিবার করে করাল।

পান্দিওনকে ভারী বর্শা আর পাথর ছুঁড়তে হল। ঘাড়ে বালির বস্তা নিয়ে সে বেড়া ডিঙ্গল। শেষকালে দাদু তার বাঁ হাতে একটা ভারী ওয়লনাট্ কাঠ চাপিয়ে দিল, ডান হাতে ধরিয়ে দিল গাঁটওয়ালা কাঠের মুগুর, মাথায় বেঁধে দিল একটা ভাঙা পাথরের বাটি। পাছে দম ফুরিয়ে যায় সেই ভয়ে হাসি চেপে রেখে পান্দিওন উত্তরমুখে ছুটল। বেলাভূমির

---

* রাত্রির পথ — সপ্তর্ষি।

পথটা ওখানে একটা খাড়া পাথুরে ঢালুর পাশ কেটে এগিয়ে গেছে। পান্দিওন বিদ্যুৎ বেগে ছুটে পাহাড়ের প্রথম ধাপ পর্যন্ত উঠে আরো দ্রুত বেগে ফিরে এল। কুঁড়েঘরটার কাছে বুড়ো তার অপেক্ষা করছিল, তার বোঝা সে খুলে নিল। তারপর নিশ্বাসের হার অনুসারে তার শ্রান্তি পরিমাপের জন্য নিজের গালটা নাতির মুখের কাছে চেপে ধরল।

কয়েক মুহূর্ত পর পান্দিওন বলল:

'এখনো আরো অনেকবার দৌড়ে গিয়ে ফিরে আসতে পারি।'

'হ্যাঁ, তা পারিস,' বুড়ো ধীরে ধীরে উত্তর দিয়ে সগর্বে পিঠ টান করে দাঁড়াল। 'যোদ্ধার কাজে তুই এখন উপযুক্ত। অক্লান্তভাবে লড়াই করতে আর ভারী অস্ত্রশস্ত্র বইতে তুই পারবি। আমার ছেলে, তোর বাবা, তোকে স্বাস্থ্য আর শক্তি দিয়ে গেছে। তার বিকাশ ঘটিয়েছি আমি, তোকে সাহসী আর সহনশীল করে তুলেছি।' পান্দিওনের তরুণ শরীরটা বুড়ো একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। তার নিখুঁৎ ত্বকে ঢাকা শক্ত মাংসপেশী আর শক্তিশালী চওড়া বুকের দিকে বুড়োর চোখদুটো দুদণ্ড চেয়ে রইল। 'আমি ছাড়া তোর আর কোন আত্মীয়স্বজন নেই,' বুড়ো বলে চলল, 'আমিও বুড়ো হয়ে পড়েছি, দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমাদের না আছে টাকা পয়সা না চাকর বাকর। আমাদের সারা ফ্রাত্রির* সম্বল তো মাত্র পাথুরে সমুদ্রতীরে তিনটি গাঁ... বিরাট পৃথিবী, একা মানুষের বিপদ অনেক। সবচেয়ে বড় বিপদ হল স্বাধীনতা হারান, দাসত্বের সম্ভাবনা। সেই জন্যই এতদিন ধরে তোকে আমি যোদ্ধা করে তুলেছি, যাতে যুদ্ধের সব ব্যাপারে ওয়াকিবহাল সাহসী লোক হতে পারিস সেই চেষ্টাই করেছি। এখন তুই তোর জাতির সেবার কাজে এগিয়ে যেতে পারিস। চল, আমাদের অধিদেবতা হিপেরিয়নের কাছে আজ তোর সাবালকত্বের জন্য অঞ্জলি দিয়ে আসি।'

ঘাস আর নলখাগড়ার বনের ভিতর দিয়ে দাদু আর নাতি এগিয়ে

---

* ফ্রাত্রি — কয়েকটি গোষ্ঠীর সমষ্টি। জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার কালে একাধিক ফ্রাত্রি নিয়ে এক একটি উপজাতি গড়ে উঠত।

গেল সরু অন্তরীপের দিকে। জমিটা লম্বা দেয়ালের মতো সমুদ্রের অনেক ভিতরে ঢুকে গেছে।

অন্তরীপের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ডালপালা ছড়ান দুটো মোটা ওকগাছ। তাদের মাঝখানে রুক্ষ চুনাপাথরের তৈরী একটা বেদী। বেদীর পিছনে একটা কাঠের খুঁটি — স্থূলহাতে খোদাই করা মানুষের মূর্তি। এ হল প্রাচীন মন্দিরটি, স্থানীয় দেবতা — নদী আখেলাস'এর। নদীটি এইখানেই সমুদ্রে পড়েছে।

সবুজ নলখাগড়া আর অন্যান্য ঝোপঝাড়ে তার মোহানা ঢাকা। উত্তর থেকে আসা যাযাবর পাখিদের ভীড় এখানে।

সামনে ছড়িয়ে আছে কুয়াশাচ্ছন্ন সমুদ্র, ঢেউগুলো সেখান থেকে এসে সশব্দে আছড়ে পড়ছে অন্তরীপের উপর। জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে, জলের ভিতর মাথা ডুবিয়ে বসে আছে একটা বিরাটকায় জন্তু।

ঢেউয়ের গম্ভীর গর্জন, পাখির তীক্ষ্ণ চীৎকার, নলখাগড়ার বনে বাতাসের শিস আর ওকপাতার মর্মর-ধ্বনি মিলে মিশে সৃষ্টি করেছে এক অস্বস্তিকর গুরুগম্ভীর রাগিণী।

রুক্ষ বেদীর উপর আগুন জ্বালিয়ে বুড়ো একটুকরো মাংস আর একটা হাতরুটি ছুঁড়ে দিল আগুনে। অঞ্জলি দেওয়া হয়ে গেলে বুড়ো একটা শ্যাওলা-ঢাকা খাড়া পাহাড়ের কাছে পান্দিওনকে নিয়ে গেল। পাহাড়ের নিচে একটা বড় পাথর। পাথরটাকে বুড়ো একপাশে সরিয়ে দিতে বলতে পান্দিওন সহজেই সরিয়ে দিল। তারপর দাদুর নির্দেশে হাত ঢুকিয়ে দিল চুনাপাথরের মাঝখানের একটা গভীর ফাটলে। ঝনঝন আওয়াজ তুলে পান্দিওন ফাটলের ভিতর থেকে টেনে বের করল একটা তামার তলোয়ার, শিরস্ত্রাণ আর চৌকো তামার পাতের চওড়া বন্ধনী — অধোদেশের বর্ম। ভেদির্গ্রিসের প্রলেপে তাদের উজ্জ্বলতা স্তিমিত।

'এ তোর বাবার অস্ত্র। সে মারা যায় অল্প বয়সে,' মৃদুস্বরে বুড়ো বলল। 'ঢাল আর ধনুকটা তোকে নিজেই জোগাড় করতে হবে।'

পান্দিওন উত্তেজিতভাবে অস্ত্রগুলোর উপর ঝুঁকে পড়ে সযত্নে ভেদির্গ্রিসের প্রলেপ তুলতে সুরু করল।

পাথরের উপর বসে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে বুড়ো চেয়ে রইল নাতির দিকে। চেষ্টা করল নিজের দুঃখটা তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে।

বর্ম সরিয়ে দিয়ে পান্দিওন পুলকের আতিশয্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুড়োকে জড়িয়ে ধরল। বুড়োও পান্দিওনকে একহাতে জড়িয়ে ধরে তার শক্ত মাংসপেশীগুলো অনুভব করল। তার মনে হল, অনেককাল আগে মৃত পুত্র আর সে নিজে যেন আবার জন্ম নিয়েছে এই তরুণ শরীরে। এই যোদ্ধা সব বাধাবিঘ্ন দূর করতে বদ্ধপরিকর।

পান্দিওনের মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে তার সরল সোনালি চোখদুটোর দিকে বুড়ো অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। বলল:

'এখন কী করবি বল পান্দিওন: ফ্রাত্রির সর্দারের কাছে গিয়ে যোদ্ধার কাজ নিবি না আগেনরের শিক্ষানবিশিই চালিয়ে যাবি?'

'আমি আগেনরের কাছেই থাকব,' একটুও দ্বিধা না করেই পান্দিওন বলল। 'গাঁয়ের সর্দারের কাছে গেলে ওখানেই থেকে যেতে হবে পুরুষদের মধ্যে। তুমি এখানে একা পড়ে থাকবে। তোমার কাছ ছাড়া হতে চাই না। তোমার কাছে থেকে তোমায় সাহায্য করব।'

'না, পান্দিওন, ছাড়তেই হবে,' বুড়ো বহু কষ্টে কিন্তু সজোরেই বলল কথাটা।

পান্দিওন বিস্ময়ে চমকে উঠে পেছিয়ে গেল, কিন্তু বুড়ো তাকে ধরে রেখে বলে চলেছে:

'আমার ছেলে, মানে তোমার বাবার কাছে আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এতদিনে তা পূর্ণ হল। এখন তোমায় নিজেই জীবনের পথে চলতে হবে। সুরু করতে হবে স্বাধীন ভাবে, অসহায় বুড়োর ভার বইলে চলবে না। আমি এনিয়াদা ছেড়ে চলে যাব এলিদার উর্বর দেশে। মেয়েরা আমার বিয়ে থা করে সেখানেই বসবাস করছে। তুই বড় ভাস্কর হয়ে উঠলে ওখানেই আমার দেখা পাবি ...'

পান্দিওনের উত্তেজিত প্রতিবাদে বুড়ো কেবল মাথা নেড়ে চলল। অনেক পীড়াপীড়ি অনুরোধ অনুযোগের পর পান্দিওন বুঝতে পারল,

বহুকাল আগেই দাদু একথা ঠিক করে রেখেছে। আর নড়চড় হবে না। জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে করে তুলেছে অনমনীয়।

সারাদিন পান্দিওন বিষণ্ণ মনে দাদুর সঙ্গে ঘুরল, তার যাত্রার উদ্যোগে সাহায্য করল।

সন্ধ্যাবেলা দু'জনে গিয়ে বসল নতুন কালাপাতি করা উপুড় একটা নৌকোর কাছে। বুড়ো বের করল তার লায়ার। সে লায়ার অতীত দিনের অনেক কিছুই দেখেছে। বৃদ্ধ চারণের জোরাল গলা সমুদ্রতীরে ছড়িয়ে পড়ে ক্রমে মিলিয়ে গেল দূরে।

গভীর দুঃখভরা তার সেই গান শুনে মনে পড়ে সমুদ্রতীরে আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের কথা।

পান্দিওনের অনুরোধে বুড়ো গাইল তাদের জাতির জন্মগাথা, আশপাশের দেশ আর লোকজনদের কথা।

পান্দিওন জানে, এ গান সে আর কখনও শুনতে পাবে না। তাই প্রতিটি কথা সে মন দিয়ে শুনল, চেষ্টা করল সেগুলো মনে রাখতে — খুব শিশুকাল থেকে এ গানগুলোর সঙ্গে তার দাদুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। মনে মনে ছবি আঁকল প্রাচীন বীরদের, বহু উপজাতিকে যাঁরা এক করেছেন।

বুড়ো চারণ গাইল তার জন্মভূমির কঠোর সৌন্দর্যের কথা, সেখানে প্রকৃতি নিজেই দেবতার পার্থিব রূপান্তর, গাইল তাঁদের কথা জীবনকে যাঁরা ভালবাসেন, প্রকৃতির ভয়ে মন্দিরে লুকিয়ে না থেকে তাকে জয় করেন, বর্তমানের দিকে পিছন ফিরে থাকেন না।

উত্তেজনায় পান্দিওনের হৃৎস্পন্দন বেড়ে উঠল — সে এখন দাঁড়িয়ে আছে অজানা দূর দেশের পথের দোরগোড়ায়, তার প্রত্যেক মোড়েই নতুন আর অপ্রত্যাশিত দৃশ্য।

সকালবেলা মনে হল গরম গ্রীষ্ম যেন আবার ফিরে এসেছে। নীল স্বচ্ছ আকাশে গরম ভাপ, নিস্তরঙ্গ বাতাসে ফড়িং'এর গান, সাদা পাহাড় আর পাথরে সূর্যের চোখ ঝলসান প্রতিফলন। স্বচ্ছ সমুদ্র অলস

ভঙ্গীতে তীর জুড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ যেন বিরাট একপাত্রে ভরা পুরনো কম্পিত সুরা।

দাদুর নৌকো দূরে মিলিয়ে গেলে পান্দিওনের বুক দুঃখে ভেঙে পড়ল। মাটিতে সে লুটিয়ে পড়ল দুহাতের উপর মাথা রেখে। মনে হল সে যেন অনাথ হয়ে পড়েছে, আবার ছোট ছেলে হয়ে গেছে, জগতে যার কেউ নেই। আদরের দাদু চলে যাওয়ায় তার হৃদয় যেন ভেঙে গিয়েছে। পান্দিওনের দুহাত চোখের জলে ভিজে গেল। কিন্তু এ শিশুর কান্না নয়। বড় বড় ফোঁটায় ঝরে-পড়া এই কান্নায় নেই সান্ত্বনা।

মহান কীর্তির স্বপ্ন তার কোথায় মিলিয়ে গেছে। কোথাও কোন সান্ত্বনা নেই। পান্দিওন শুধু চায় তার দাদুর কাছেই থাকতে।

ক্রমশ সে বুঝতে পারল এই ক্ষতি অপূরণীয়। নিজের মনটাকে পান্দিওন সংযত করল। কান্নার লজ্জায় সে ঠোঁট কামড়ে মাথা তুলে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল দূর সমুদ্রের দিকে। অবশেষে তার জটপাকান চিন্তা আবার ধীরে ধীরে ধারাবাহিক সঙ্গত রূপ নিল। পান্দিওন উঠে পড়ল। চোখদুটো তার রোদে উষ্ণ সমুদ্রতীর পার হয়ে প্লেনগাছের ছায়ায় সেই কুঁড়েঘরটার উপর স্থির হয়ে দাঁড়াল। আবার মন চেপে বসল সেই বোবা দুঃখ। বুঝল, ভাবনাচিন্তাহীন কৈশোরের কাল ফুরিয়েছে, ছেলেমানুষী স্বপ্ন নিয়ে তা আর কখনোই ফিরবে না।

ধীরে ধীরে কুঁড়েঘরটার দিকে এগিয়ে গেল পান্দিওন। ঘরে ফিরে কোমরে তলোয়ার বেঁধে অন্যান্য জিনিসপত্র জোব্বায় মুড়ে নিল। দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিল, যাতে ঝড়ে খুলে না যায়। তারপর এগিয়ে চলল সমুদ্রের হাওয়ায় ধোয়া পাথুরে পথ বেয়ে। পায়ের তলে শক্ত শুকনো ঘাসের করুণ আওয়াজ। পথটা গিয়ে পড়েছে টিলার কাছে। সূর্য-উত্তপ্ত পাতায় পিষ্ট জলপাইয়ের তীব্র গন্ধ ছড়ান সবুজ ঝোপঝাড়ে টিলাটা ছাওয়া। সেখানে এসে পথটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে — ডানদিকের পথটা গেছে তীরবর্তী একদল জেলেদের কুঁড়েঘরের দিকে, অন্য পথটা নদী বরাবর গ্রামে। পান্দিওন বাঁহাতি পথটা ধরে টিলা পার হয়ে এগিয়ে চলল। পাদুটো ডুবে যাচ্ছে সাদা গরম ধুলোয়।

ফড়িং'এর বিচিত্র কলস্বরে চাপা পড়ে গেছে সমুদ্রের ডাক। পাহাড়ের পাথুরে ঢালু অদৃশ্য হয়ে গেছে পায়ের কাছে নদীতীরের গাছপালার ঐশ্বর্যের মধ্যে। করবীর সরু সরু লম্বা পাতা আর ফিগ-গাছের ঘনসবুজ ঢাকা পড়ে গেছে বিরাটকায় ওয়লনাটের ঘন পাতার আবরণে। সব গাছপালা একসঙ্গে মিলেমিশে চুনাপাথরের সাদা পটভূমিকায় একটা বিরাট কোঁকড়ান প্রায় কালো পদার্থে পরিণত হয়েছে। বনের ছায়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা মোড় ফিরে পথটা এসে পড়েছে একটা খোলা মাঠে। সেখানে ক্রমশ নেমে আসা আঙুরখেতের পাদদেশে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা বাড়ি।

জলপাই'এর গাঁটওয়ালা কাণ্ডের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা সাদা নিচু বাড়ি। পান্দিওন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সেই দিকেই এগিয়ে চলল। ঢুকে পড়ল একটা খোলা ছাউনির নিচে। কালো দাড়ি মধ্যবয়সী মাঝারি লম্বা একটি লোক উঠে দাঁড়ালেন। ভাস্করাচার্য আগেনর।

'শেষ পর্যন্ত এলে তবে,' ভাস্কর সানন্দে বলে উঠলেন। 'তোমায় ডেকে পাঠাব বলে ভাবছিলাম ... এ আবার কী?' পান্দিওনের অস্ত্রশস্ত্র আগেনরের চোখে পড়ল। 'এস বাবা, তোমায় আলিঙ্গন করি ... তেস্‌সা, তেস্‌সা!' আগেনর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এস আমাদের যোদ্ধাকে দেখে যাও!'

পান্দিওন তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াল। ভিতরের দরজাটা দিয়ে উঁকি মারল একটি মেয়ে। পরনে তার রংচটা ফিকে নীল কাপড়ের খিতন*, তার উপরে যেমন তেমন করে চড়ান একটা টকটকে লাল হিমাতিওন** আনন্দের হাসিতে প্রকাশ হয়ে পড়ল মেয়েটির সুন্দর দাঁতের ছটা। কিন্তু একমুহূর্ত পরেই সে হাসি গেল মিলিয়ে, ভুরু কুঁচকে মেয়েটি চেয়ে রইল পান্দিওনের দিকে।

---

* খিতন — পাৎলা কাপড়ের হাতাছাড়া লম্বা জামা। হেলিনীয় মেয়েরা তা ঘরে পরে।

** হিমাতিওন — আয়তক্ষেত্রাকারে তৈরী হেলিনীয় মেয়েদের শালের মতো বহির্বাস। সাধারণত কাঁধেই ফেলা থাকে, বৃষ্টি পড়লে মাথাও ঢাকা চলে।

'দেখ, তেস্‌সা তোমার উপর রেগে গেছে। পুরো দুটো দিন গেল, তুমি যে কাজ করবে না সেকথা একবার এখানে এসে জানিয়ে যেতে পারলে না!' ভর্ৎসনার সুরে বললেন ভাস্কর।

মাথা নিচু করে পান্দিওন চোরাচোখে একবার তেস্‌সার দিকে আরেকবার গুরুর দিকে তাকাতে লাগল।

'কী হয়েছে তোমার, বাছা? না, আর বাছা নয়, যোদ্ধা,' আগেনর বললেন, 'এমন মনমরা হয়ে আছ কেন? ঐ পোঁটলাটাই বা কিসের?'

পান্দিওন থেমে থেমে কোনরকমে জানাল তার দাদুর চলে যাওয়ার খবর। বিচ্ছেদের দুঃখে তার মন আবার ভারাক্রান্ত।

আগেনরের স্ত্রী, তেস্‌সার মা কাছে এলেন।

ভাস্কর পান্দিওনের কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন:

'পান্দিওন, তোমায় আমরা বহুদিন থেকেই ভালবাসি। তুমি যে যোদ্ধার কাজ না নিয়ে শিল্পীর জীবন বেছে নিয়েছ, এতে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। লড়াই তোমায় করতেই হবে, তার হাত থেকে রেহাই নেই। কিন্তু এখন তোমায় অনেক কিছু অর্জন করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন অনেক পরিশ্রম, অনেক সাধনা।'

গ্রীক আচার অনুসারে পান্দিওন নত হয়ে অভিবাদন জানাল আগেনরের স্ত্রীকে। তিনি তাঁর জোব্বার কোণটা দিয়ে পান্দিওনের মাথাটা ঢেকে তাকে বুকে চেপে ধরলেন।

তেস্‌সা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর লজ্জা পেয়ে ঘরে ঢুকে গেল। তার দিকে চেয়ে বাবার মুখে ফুটে উঠল স্মিত হাসি।

শান্তিতে জিরিয়ে নেবার জন্য আগেনর কাজের ঘরের দরজার মুখে বসে পড়লেন। বাড়ির ঠিক কাছেই একটি প্রাচীন জলপাই কুঞ্জ, তাদের গাঁটওয়ালা গুঁড়িগুলো অদ্ভুতভাবে উঠেছে নিজেদের মধ্যে জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি করে। শিল্পীর ধ্যান দৃষ্টিতে তারা হয়ে উঠেছে কেউ বা মানুষ কেউ বা জীবজন্তু। একটা গাছকে দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন এক দৈত্য আনত মাথার উপর দুহাত মেলে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে।

আরেকটা গাছের এবড়ো খেবড়ো বিশ্রী কাণ্ড হয়ে উঠেছে যন্ত্রণায় বিকৃত কুৎসিৎ এক নরদেহ। রুপোলি পাতায় ভরা অসংখ্য ডালপালার বিরাট ভার মাথার উপরে তুলে রাখার চেষ্টায় গাছগুলো যেন নুয়ে পড়েছে।

বাড়ির আরেক দিক থেকে বেরিয়ে এল সোনালি বুটি উজ্জ্বল নীল সুন্দর হিমাতিওনে সজ্জিত একটি মেয়ে। ঢালুর পিছনে মেয়েটি মিলিয়ে যেতে ভাস্কর তাঁর মেয়েকে চিনতে পারলেন। খালি পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে আগেনরের স্ত্রী স্বামীর পাশে বসলেন।

'তেস্‌সা আবার পাইন কুঞ্জে গেছে পান্দিওনের সঙ্গে দেখা করতে,' ভাস্কর বললেন। 'ওরা ভাবে আমরা যেন ওদের গোপন কথা জানি না!'

আগেনরের স্ত্রী আনন্দে হেসে উঠে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন:

'পান্দিওন তো আমাদের এখানে একবছরের বেশি রইল, ওকে তোমার কী রকম মনে হয়?'

আগেনর জবাব দিলেন, 'আগের চেয়ে আরো অনেক ভাল লাগে।' তাঁর স্ত্রীও মাথা নেড়ে সায় দিলেন। 'কিন্তু...' পরের কথাগুলো গুছিয়ে বলার জন্য শিল্পী একটু থামলেন।

'ওর আকাঙ্ক্ষা বড় বেশি,' তাঁর স্ত্রী কথাটা সম্পূর্ণ করে দিলেন।

'হ্যাঁ, ও অনেক চায়। দেবতাদের কাছ থেকে ও পেয়েছেও অনেক। কিন্তু ওকে শেখাবার কেউ নেই, ও যা চায় আমি তা দিতে অক্ষম।' শিল্পীর কণ্ঠস্বরে দুঃখের ছোঁয়া।

'আমার মনে হয় ও বড় বেশি অনিশ্চিত, নিজের পেশা ও এখনো খুঁজে পায়নি, ও অন্য ছেলেদের মতো নয়,' আগেনরের স্ত্রী মৃদুস্বরে বললেন। 'ও যে কী চায় আমি বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে ওর জন্য দুঃখ হয়।'

'ঠিকই বলেছ, কেউ যা কখনো পায়নি তাকেই যদি ও চায় তবে ও কখনো সুখের মুখ দেখতে পাবে না। তুমি দুশ্চিন্তায় পড়েছ... কেন, তা জানি, তেস্‌সার জন্য তোমার ভয়, তাই না?'

'না, ভয় আমি পাইনি। মেয়ে আমার দর্পিতা, সাহসী। কিন্তু তবুও মনে হয় পান্দিওনের প্রতি ভালবাসা মেয়েটাকে হয়ত অনেক দুঃখই এনে দেবে। পান্দিওনের মতো অনুসন্ধানের কামনা যাকে পেয়ে বসে তার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য — প্রেমেও তার এই অসীম কামনা তৃপ্ত হবে না...'

'আমার যেমন হয়েছিল', সপ্রেম নয়নে একবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন ভাস্কর। 'আমিও একসময়ে পান্দিওনের মতো ছিলাম...'

'না, তুমি ছিলে বেশি শক্তিশালী, বেশি স্থিরবুদ্ধি,' আগেনরের পাকা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন তাঁর স্ত্রী।

শিল্পী দূরে পাইনগাছের ওপারে চেয়ে রইলেন। সেখানে তেস্‌সা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দ্রুত পায়ে সমুদ্রের দিকে চলেছে তেস্‌সা। থেকে থেকেই পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। অবশ্য সে ভাল করেই জানে, ছুটির দিনে এত সকালে কেউ এই পবিত্র কুঞ্জে আসবে না।

নেড়া পাহাড়ের খাড়া সাদা পাথরগুলো থেকে তখনি উত্তাপের ঢেউ উঠছে। পথটা প্রথমে গেছে কাঁটাঝোপে ভরা একটা সমতল জায়গার ভিতর দিয়ে। তেস্‌সাকে অতি সাবধানে চলতে হল, সাগরপারের প্রায় স্বচ্ছ কাপড়ে তৈরী তার সবচেয়ে ভাল খিতনটা যাতে কাঁটায় ছিঁড়ে না যায়। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে পথটা উঠে গেছে টিলা বেয়ে। টিলাটা ছেয়ে গেছে টকটকে লাল ফুলে। কড়া রোদ পড়াতে মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ের গায়ে আগুন লেগেছে। এখানে আর কাঁটার ভয় নেই। মেয়েটি তার খিতন তুলে ধরে দৌড়তে সুরু করল।

কয়েকটা দলছাড়া গাছ তাড়াতাড়ি পার হয়ে তেস্‌সা কিছুক্ষণ পরেই এসে পৌঁছল সেই কুঞ্জে। পাইনগাছগুলোর ঋজু সমুন্নত কাণ্ড জ্বলছে মোমবাতির লাইলাক রং আলোর মতো। গাছের মাথায় বাতাসে কাঁপা পাতার মর্মরধ্বনি। মানুষের হাতের মতো লম্বা নরম কাঁটায় ভরা ছড়ান ডালগুলো উজ্জ্বল সূর্যের আলোকে সোনার গুঁড়োয় রূপান্তরিত করেছে।

গরম রজন আর পাইন কাঁটার গন্ধের সঙ্গে সমুদ্রের গন্ধ মিশে সারা কুঞ্জটাকে ভরে দিয়েছে।

কুঞ্জের গভীর শান্তিতে নিজের অজ্ঞাতসারেই নিজেকে ছেড়ে দিয়ে মেয়েটি তার চলার গতি কমিয়ে আনল।

তার ডাইনে গাছের মাঝখানে উঠেছে পাইনকাঁটাভরা একটা ধূসর পাহাড়ে পাথর।

একঝলক রোদ এসে পড়েছে একটা ছোট্ট ফাঁকা জায়গায়, চারপাশের গাছগুলোকে সে আলোয় দেখাচ্ছে লাল তামার স্তম্ভের মতো। সমুদ্রের চাপা গর্জন এখানে আরো পরিষ্কার শোনা যায়। এখান থেকে সমুদ্র চোখে পড়ে না, কিন্তু তবু তার রাগিণীর অনুচ্চ সুরের গম্ভীর মীড় আর গমকে তার উপস্থিতি অনুভব না করে উপায় নেই।

পাথরের আড়াল থেকে ছুটে এসে পান্দিওন তেস্‌সার প্রসারিত বাহুদুটি ধরল। কাছে টেনে তারপর একটু দূরে সরিয়ে তাকে দুচোখ ভরে দেখতে লাগল, যেন তার দেহরূপকে নিজের মনের মধ্যে গড়ে তুলছে।

তেস্‌সার মসৃণ কপালের উপর কাঁপছে তার উজ্জ্বল কৃষ্ণ অলকদল, উঁচু হয়ে আছে সরু বাঁকা ভুরু, তার ছায়ায় বড় বড় ঘন নীল চোখদুটিতে ফুটে উঠেছে বিদ্রূপ মেশান অহংকারের অধরা এক অভিব্যক্তি।

তেস্‌সা আস্তে আস্তে পান্দিওনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। পান্দিওনের দিকে স্নেহভরা চোখে তাকিয়ে থেকে বলল:

'তাড়াতাড়ি কর, এক্ষুনি লোকজন এসে পড়বে!'

'আমি প্রস্তুত,' এই বলে খাড়া সরু ফাটলওয়ালা পাথরটার দিকে এগিয়ে গেল পান্দিওন।

একটা চুনাপাথরের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ফুট তিনেক উঁচু একটা অসমাপ্ত মাটির মূর্তি। কাছে পড়ে আছে ভাস্করের কাঠের যন্ত্রপাতি — বাঁকা করাত, ছুরি আর কর্ণিক।

মেয়েটি তার হিমাতিওনটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর ধীরে ধীরে হাত ওঠাল কাঁধের ব্রোচটার দিকে। ঐ ব্রোচটাই কাঁধের কাছে কাটা তার পাৎলা খিতনের ভাঁজগুলোকে ধরে রেখেছে।

যন্ত্রপাতিগুলো বাছতে বাছতে পান্দিওন হাসিমুখে তেস্‌সাকে দেখতে লাগল। কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে মূর্তিটার দিকে নজর পড়তেই মিলিয়ে গেল তার সেই বিজয়গর্বিত হাসি। ঐ স্থূল মূর্তিটিতে সজীব তেস্‌সার অপূর্ব সৌন্দর্য কিছুই ফোটেনি। কিন্তু তবু তার শরীরের প্রমাণ তাতে ধরা পড়েছে। আজই সবকিছু নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এতদিন পর আজ সে এই জড় মৃৎপিন্ডকে প্রাণের সৌন্দর্য দেবে।

তেস্‌সার দিকে ঘুরে তাকাল পান্দিওন। তার ভ্রূভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। আড়চোখে কটাক্ষ হেনে তেস্‌সা মাথা নাড়ল। তারপর চোখ নামিয়ে মাথার পিছনে একটি হাত রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়াল পাইনগাছে। কাজে মগ্ন পান্দিওন একটি কথাও বলল না। তার তীক্ষ্ম দৃষ্টি একবার তাকাচ্ছে মডেলের শরীরের দিকে আরেকবার মূর্তির দিকে। আর সে অনবরত করে চলেছে মাপজোখ, তুলনা আর পরিবর্তন।

নিষ্প্রাণ মাটির তালের সঙ্গে শিল্পীর সৃজনশীল হাতদুটির এই লড়াই বহুদিন ধরেই চলেছে। প্রাণহীন উদাসীন মাটির তালকে সজীব মেয়ের সৌন্দর্য দিতে চেষ্টা করছে শিল্পী।

সময় চলে যায়। পান্দিওনের উৎসুক কানে থেকে থেকেই ধরা পড়ে ক্লান্ত মেয়েটির চাপা দীর্ঘশ্বাস।

কাজ থামিয়ে পান্দিওন এক পা পিছিয়ে গেল। তার তীব্র হতাশার আর্তনাদ শুনে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল তেস্‌সা। মাটির গড়নটা আরো খারাপ হয়ে গেছে। আগে প্রায় অদৃশ্য কয়েকটি রেখার ব্যঞ্জনায় মূর্তিটিতে প্রাণের প্রকাশ ঘটেছিল। কিন্তু সে রেখাগুলোকে এখন বেশি করে ফুটিয়ে তোলায় মূর্তিটি একেবারেই প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। এখন বিরাট পাইনগাছের সামনে দাঁড়ান তেস্‌সার পুরনো সোনার রঙের শরীরের কেবল স্থূলসাদৃশ্য ছাড়া মূর্তিটিতে আর কিছুই নেই।

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে পান্দিওন তেস্‌সার সঙ্গে মূর্তিটি মিলিয়ে দেখতে লাগল। ভুলটা খুঁজে বের করার জন্য সে মরীয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভুল আসলে কোথাও নেই। শুধু মূর্তিটিতে প্রাণের সোনার কাঠির

ছোঁয়া সে দিতে পারেনি। ধরতে পারেনি সজীব শরীরের রূপের বদল। ভেবেছিল প্রেমের জোরে আর তেস্‌সার সৌন্দর্যের মুগ্ধতায় শিল্প সৃষ্টির সর্বোচ্চ শিখরে সে উঠবে, এমন মূর্তি গড়ে তুলবে যা দুনিয়াতে কেউ কখনো দেখেনি ... গতকালও একথা সে ভেবেছে, এই আধঘণ্টা আগেও, কিন্তু তবু!... সে তা পারে না... সে অসমর্থ... ও কাজ তার ক্ষমতার বাইরে... তেস্‌সাকে সে এত ভালবাসে, তবুও! এর পর সে কী করবে? পান্দিওনের চোখের সামনে সবকিছু ম্লান হয়ে গেল, হাত থেকে খসে পড়ল মূর্তি করার যন্ত্র, মাথায় রক্ত চড়ে গেল। নিজের অক্ষমতার উপলব্ধিতে পান্দিওন তেস্‌সার কাছে ছুটে গিয়ে তার হাঁটু জড়িয়ে বসে পড়ল।

তেস্‌সা অপ্রস্তুত হয়ে থতমত খেয়ে পান্দিওনের উত্তোলিত উত্তপ্ত মুখের উপর রাখল তার হাতদুটি।

নারীর সহজাত বোধক্ষমতায় সে হঠাৎ বুঝতে পারল শিল্পীর মনের মধ্যে কী চলেছে। পান্দিওনের উপর ঝুঁকে পড়ে মায়ের মতো করে সে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, তার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার ছোট ছোট কোঁকড়া চুলগুলোয়।

ধীরে ধীরে কমে এল পান্দিওনের হতাশা।

দূর থেকে কাদের গলা শোনা গেল। পান্দিওন ঘুরে তাকাল; থিতিয়ে পড়েছে তার তীব্র উত্তেজনা, সেই সঙ্গে তার দৃপ্ত আশাও। পান্দিওনের মনে হল তার যৌবনের স্বপ্ন কখনোই বাস্তবে রূপ নেবে না। মূর্তির কাছে এগিয়ে গিয়ে ভাস্কর একমনে ভাবতে লাগল। তেস্‌সার ছোট্ট হাতটা এসে পড়ল তার কনুইয়ের উপর।

'ওরকম কোরো না, বোকা ছেলে,' ফিসফিস করে বলল তেস্‌সা।

'ও কাজ আমি পারব না, সে সাহস আমার নেই,' মূর্তির দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই কথাটা মেনে নিয়ে বলল পান্দিওন। 'যদি...' পান্দিওনের কথা আটকে এল, 'যদি তোমায় দেখে না গড়তাম, এই মূর্তি যদি তুমি না হতে, তবে এখুনি এটাকে ভেঙে ফেলতাম। এমন স্থূল আর কুৎসিৎ মূর্তির অস্তিত্বের কোন অধিকার নেই, অধিকার নেই তোমার

সাদৃশ্য রচনার।' এই বলে মূর্তি আর চুনাপাথরটা পাহাড়ের গায়ের ফাটলে ঢুকিয়ে দিয়ে পান্দিওন ফাটলের সরু মুখটা শুকনো পাইনকাঁটা আর পাথরখণ্ড দিয়ে বন্ধ করে দিল...

পান্দিওন আর তেস্‌সা এগিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুজনে নিঃশব্দে হেঁটে চলল। তারপর পান্দিওনই প্রথম কথা বলল, প্রিয়ার সঙ্গে সে তার নিজের দুঃখকষ্ট হতাশা ভাগ করে নিতে চায়। তেস্‌সা পান্দিওনকে অনেক বোঝাল, বার বার বলল, কিছুতেই চেষ্টা ছেড় না। পান্দিওন যে তার পরিকল্পনাকে সফলরূপ দিতে পারবে এ বিষয়ে সে সুনিশ্চিত। পান্দিওন কিন্তু অনমনীয়। এই সে প্রথম বুঝল, প্রকৃত শিল্পী হতে তার এখনো অনেক দেরী, বহুবছরের পরিশ্রমসাধ্য চর্চার ফলেই গড়ে ওঠে প্রকৃত শিল্পের পথ।

'না, তেস্‌সা, আমি বুঝতে পেরেছি তোমায় মূর্তিতে রূপ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়!' পান্দিওন অত্যন্ত আবেগে বলে উঠল। 'আমার এখানে কিছু নেই, বড়ই দরিদ্র,' নিজের বুক আর চোখদুটো ছুঁয়ে বলল সে, 'তোমার সৌন্দর্যকে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা এদের নেই...'

'আমার সবকিছুই তো তোমার পান্দিওন,' তেস্‌সা সাবেগে শিল্পীর গলা জড়িয়ে ধরল।

'তা ঠিক তেস্‌সা, কিন্তু একেক সময় তোমার রূপের জন্য কী যন্ত্রণাই না ভোগ করি! তোমার রূপের পূজা আমার কখনোই ফুরবে না অথচ দেখ... কিছুতেই তোমার মূর্তি গড়তে পারছি না... মাটিতে, কাঠে, পাথরে তোমায় রূপ দিতেই হবে। জীবনের রূপায়ণ এত কঠিন কেন তা আমায় জানতেই হবে। তা না হলে আমার সৃষ্টিতে প্রাণের প্রকাশ ঘটবে কী করে?'

গভীর মনোযোগ দিয়ে তেস্‌সা পান্দিওনের কথা শুনে চলেছে। বুঝতে পারছে পান্দিওন তার হৃদয় উজাড় করে দিচ্ছে তার কাছে। কিন্তু তাকে সাহায্য করতে পারছে না বলে সেও ব্যথা অনুভব করছে। শিল্পীর দুঃখ এখন তারও দুঃখ। তেস্‌সার মনে দেখা দিয়েছে একটা অস্পষ্ট শঙ্কা।

হঠাৎ হেসে ফেলল পান্দিওন। তেস্‌সা ব্যাপারটা বুঝতে পারার আগেই পান্দিওন বলিষ্ঠ হাতে তাকে মাটি থেকে তুলে নিল। তারপর সাগরতীরে হাল্কা পায়ে ছুটে গিয়ে তাকে বসিয়ে দিল বালির উপর, নিজে অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে।

একমুহূর্ত পরেই তেস্‌সা দেখল, একটা এগিয়ে আসা ঢেউয়ের মাথায় পান্দিওন। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরে এল। কিছু আগের দুঃখের কোন চিহ্নই আর কোথাও নেই। তেস্‌সার মনে হল পাইনকুঞ্জে কিছুই যেন ঘটেনি। সেই অভাগা মাটির মূর্তি আর তার স্রষ্টার পীড়িত চেহারাটা মনে করে সে মৃদু হাসল।

পান্দিওনও নিজেকে নিয়ে মস্করা সুরু করল। তেস্‌সার সামনে ছেলেমানুষের মতো নিজের কসরৎ আর শক্তি নিয়ে জাঁক করতে লাগল। এমনি করে তারা বাড়ির দিকে ফিরে চলল আস্তে আস্তে, থেমে থেমে। কিন্তু তেস্‌সার অন্তরের গভীরে তখনো একটা ক্ষীণ শঙ্কা উঁকি মেরে চলেছে।

আগেনর পান্দিওনের হাঁটুর উপর হাত রেখে বললেন:

'দেখ বাবা, আমাদের জাতিটা এখনো বড় গরীব, বয়সও কম। বহু শত বছর প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করার পর কয়েকশ লোক সক্ষম হবে শিল্পীর উচ্চ আদর্শে নিজেদের নিবেদিত করতে। বহু শতাব্দীর প্রাচুর্যের পরেই বহুলোক মানুষ আর এই জগতের সৌন্দর্যের চর্চায় নিজেদের নিবিষ্ট করতে পারবে। এই তো সেদিন পর্যন্ত আমরা পাথর আর গাছের গুঁড়ি কেটে দেবতাদের মূর্তি গড়েছি... তুমি সৌন্দর্যের নিয়ম আয়ত্তের চেষ্টায় রয়েছ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের জাতি সৌন্দর্যের রূপায়ণে অনেক এগিয়ে যাবে। আজ, অবশ্য, যে সব দেশ আমাদের চেয়ে প্রাচীন সমৃদ্ধ তাদের শিল্পীরা আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রসর ...'

বৃদ্ধ শিল্পী ঘরের এক কোণ থেকে একটা হলদে কাঠের বাক্স নিয়ে এসে তার ভিতর থেকে লাল কাপড়ে মোড়া কী যেন একটা বের করলেন।

মোড়কটা খুলে শিল্পী অতি সযত্নে পান্দিওনের সামনে নামিয়ে রাখলেন প্রায় এক হাত উঁচু একটা হাতির দাঁতের আর সোনার মূর্তি। হাতির দাঁতের উপর একটা হলদে প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে কাল। চকচকে গায়ে সরু সরু কালো কালো ফাটল।

মূর্তিটিতে দেখা যাচ্ছে একজন মেয়ে দুহাত বাড়িয়ে দুটো সাপকে ধরে আছে, সাপদুটো তার কনুই পর্যন্ত জড়িয়ে ফেলেছে। মেয়েটির আশ্চর্যরকম পাতলা কোমরে একটা আঁট নীবীবন্ধ, তার ধারগুলো উঁচু। আগুল্ফলম্বিত মেখলা। তাতে পাঁচটা সোনার রেখার অলংকরণ। পিঠ কাঁধ দুপাশ আর বাহুর উপরাংশ ঢেকে নেমেছে পাৎলা এক উড়নি। বুকে কোন আচ্ছাদন নেই।

ঘন ঢেউখেলান চুল গ্রীক মেয়েদের মতো ঘাড়ের কাছে খোঁপা করা নয়, মাথার উপরে চূড়া করা। সেই চূড়া খোঁপা থেকে মোটা মোটা চূর্ণ ছড়িয়ে পড়েছে মেয়েটির ঘাড়ে আর পিঠে।

এজাতীয় কাজ পান্দিওন আগে কখনো দেখেনি। সে বুঝতে পারল, মূর্তিটি গড়েছেন এক মহাশিল্পী। মেয়েটির অদ্ভুত উদাস মুখভঙ্গীর দিকে পান্দিওন চেয়ে রইল, চ্যাপ্‌টা চওড়া মুখ, গালের হাড়দুটো উঁচু, নিচের মোটা ঠোঁটটা একটুখানি সামনে বের করা।

সোজা ঘন ভুরুতে মেয়েটির উদাস মুখভাবই আরো সজোরে ফুটে উঠেছে, কিন্তু বুক যেন তার দুলছে অধৈর্যের দীর্ঘশ্বাসে।

পান্দিওনের মুখে কথা ফুটল না। এই অজানা শিল্পীর দক্ষতা সে যদি পেত! এই পুরনো হাতির দাঁতের গোলাপী-হলদে ত্বকের আবরণে যে রূপের প্রকাশ ঘটেছে, তার হাতের বাটালিও যদি অমন সুন্দর, অমন নিখুঁৎ রূপ গড়ে তুলতে পারত!

পান্দিওনের মনে মূর্তিটির এমন গভীর রেখাপাতে আগেনর খুসি হলেন। গালে আঙুল বোলাতে বোলাতে তিনি পান্দিওনকে ভাল করে লক্ষ্য করে চললেন।

পান্দিওনের নীরব ধ্যান ভাঙল। সে একটু দূরে নামিয়ে রাখল মূর্তিটা। প্রাচীন শিল্পাচার্যের এই স্বল্পোদ্ভাসিত খোদাই কাজ থেকে

সে আর কিছুতেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। মৃদু বিষণ্ণ স্বরে গুরুকে সে জিজ্ঞেস করল:

'এটা কি কোন পূবদেশী প্রাচীন সহর* থেকে আনা হয়েছে।'

'না, না,' আগেনর বল্লেন। 'স্বর্ণপুরী মীকেনায়ে, তিরিন্থুস্, ওর্কোমেনুসের চেয়ে এমূর্তিটি অনেক বেশি পুরনো। তোমায় দেখাবার জন্য খিত্রজাওরের কাছ থেকে এনেছি। ওর বাবা জোয়ান বয়সে একটা দলের সঙ্গে ক্রীটে গিয়েছিলেন। সমুদ্ররাজাদের নগর, ক্নস্সসের ধ্বংসাবশেষের কুড়ি স্টেডিয়া** দূরে একটা ভাঙা প্রাচীন মন্দির আছে, সেখানেই তিনি এই মূর্তিটা পান। ক্নস্সস সহরটা ভূমিকম্পে শেষ হয়ে যায়।'

'বাবা,' পান্দিওনের কথায় চাপা উত্তেজনা ফুটে উঠল। অনুরোধের চিহ্ন হিসেবে গুরুর দাড়ি ছুঁয়ে সে বলল, 'তুমি কত জান। ইচ্ছা করলে তুমি প্রাচীন শিল্পাচার্যদের সৃষ্টি নকল করে আমাদের শেখাতে পার, যেসব জায়গায় এইসব অদ্ভুত শিল্পসম্ভার এখনো মজুত রয়েছে সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে পার, তাই না? উপকথায় আমরা যাদের কথা শুনি তুমি সে সব দেশ দেখনি, সেটা কি সম্ভব? দাদুর গান শুনতে শুনতে আমার প্রায়ই ঐসব দেশের কথা মনে পড়ত।'

আগেনর চোখ নামালেন। তাঁর শান্ত প্রসন্ন মুখের উপর নেমে এল কালো ছায়া।

একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে তিনি বলতে সুরু করলেন, 'তোমায় ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু শীগ্‌গীরি তুমি নিজেই বুঝতে পারবে — যা মৃত অতীত তাকে আর কিছুতেই ফিরিয়ে আনা যায় না। আমাদের

---

* পান্দিওন পূর্ব গ্রীসের (হেলাস) সহরগুলোর কথাই বলছে, যেখানে খৃঃ পূঃ ১৬০০ — ১২০০য় মীকেনীয় সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। মীকেনীয় সভ্যতা হচ্ছে ঈজীয় বা ক্রীটসভ্যতার খোদ বংশধর। প্রাক-হেলিনীয় শেষোক্ত সভ্যতার বিষয়ে এখনো বিশেষ কিছু জানা যায়নি। মীকেনীয় পর্বে মীকেনায়ে, তিরিন্থুস্ আর ওর্কোমেনুস ছিল সংস্কৃতির কেন্দ্র।

** স্টেডিয়া — দূরত্বের পরিমাপ, আনুমানিক ১৮০ মিটার।

জগৎ, আমাদের হৃদয়মনে তার স্থান নেই ... তা সুন্দর কিন্তু আশারিক্ত ... তা মুগ্ধ করে কিন্তু বেঁচে ওঠে না।'

'বুঝতে পেরেছি বাবা!' পান্দিওন সাবেগে বল্ল। 'প্রাচীনকে হাজার নিখুঁৎভাবে নকল করলেও আমরা কেবল মৃত জ্ঞানের দাস হয়েই থাকব। প্রাচীন আচার্যদের সমকক্ষ হতে হবে আমাদের, এমনকি তাদের ছাড়িয়ে যেতে হবে। তবেই ... তবেই ...' মনের কথাটাকে প্রকাশ করার মতো কথা খুঁজে না পেয়ে পান্দিওন থেমে গেল।

ছাত্রের দিকে তাকিয়ে আগেনরের চোখে আলো জ্বলে উঠল। শক্ত ছোট হাতে পান্দিওনের কনুইয়ে চাপ দিয়ে তিনি তাঁর সম্মতি প্রকাশ করলেন।

'খুব সুন্দর করে বলেছ পান্দিওন্, আমি ওভাবে বলতে পারতাম না। প্রাচীন শিল্প হবে আমাদের মাপকাঠি, নিদর্শন। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। আমাদের চলতে হবে নিজেদের পথে। সে পথকে সংক্ষেপ করার জন্য পূর্বসূরীদের কাছে আমাদের পাঠ নিতে হবে। পান্দিওন, তুমি বুদ্ধিমান ...'

পান্দিওন হঠাৎ মাটির মেঝেতে পিছলে পড়ে শিল্পীর হাঁটুদুটো জড়িয়ে ধরল।

'তুমি আমার পিতা, আমার গুরু, আমায় ঐ সব প্রাচীন সহর দেখে আসার অনুমতি দাও ... আমায় যেতেই হবে ... নিজের চোখে আমায় দেখে আসতে হবে। নিজের মধ্যে আমি মহৎ সৃষ্টিশক্তি অনুভব করি ... আমাদের লোকেদের কাছে যে সব দুর্লভ সৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায়, যা দেখে তারা অবাক হয়ে যায় তাদের জন্মভূমির পরিচয় আমি পেতে চাই। হয়ত আমি ...' পান্দিওন থেমে গেল। কান পর্যন্ত তখন তার লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু তার দ্বিধামুক্ত দৃষ্টি আগেনরের চোখের দিকে চেয়ে।

আগেনর ভুরু কুঁচকে অন্য দিকে চেয়ে একমনে কী যেন ভাবতে লাগলেন, একটি কথাও বললেন না।

'ওঠ পান্দিওন,' বৃদ্ধ শিল্পী শেষ পর্যন্ত বলে উঠলেন। 'অনেকদিন থেকে আমি এরই অপেক্ষা করছিলাম। তুমি আর ছোট ছেলে নেই। ইচ্ছা

থাকলেও তোমায় আমি আটকে রাখতে পারব না। তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি যেতে পার। কিন্তু পুত্র হিসেবে, ছাত্র হিসেবে তোমায় একটা কথা বলছি — না তার চেয়েও বেশি, আমার সমকক্ষ আর বন্ধু হিসেবে তোমাকে বলছি — তুমি যা চাইছ তা মারাত্মক। এর ফল হচ্ছে সাংঘাতিক বিপদ, আর কিছু নয়।'

'বাবা, আমি কিছুকেই ভয় করি না!' মাথাটা পিছনে তুলে ধরে পান্দিওন বল্‌ল, তার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত।

'আমার তবে ভুল হয়েছিল — তুমি এখনো দেখছি ছেলেমানুষই আছ,' আগেনর শান্তভাবে বাধা দিয়ে বল্‌লেন। 'আমায় যদি তুমি সত্যিই ভালবাস, তবে খোলা মন নিয়ে শোন।'

আগেনর তাঁর কাহিনী বলতে সুরু করলেন: 'পূর্বদেশের সহরগুলোয় প্রাচীন আচার ব্যবহার এখনো চলতি আছে, প্রাচীন শিল্পকার্যও অনেক রয়েছে। ক্রীটে এখনো মেয়েরা সেই হাজার বছরের পুরনো কায়দার সাজ পোষাক পরে — লম্বা শক্ত বিচিত্র মেখলা, বুক খোলা, কাঁধ আর পিঠ ঢাকা। পুরুষরা পরে ছোট হাতাছাড়া জামা। মাথায় তাদের বড় বড় চুল, হাতে ব্রোঞ্জের বেঁটে তলোয়ার।

'তিরিন্‌থুস সহরটা পঞ্চাশ হাত উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ব্রোঞ্জ আর স্বর্ণ ফুলে সজ্জিত বিরাট ঘষা পাথর দিয়ে সে দেয়াল তৈরী। রোদ পড়লে দূর থেকে মনে হয় প্রাচীরটা যেন আগুনের ফোঁটায় ভরে গেছে।

'মীকেনায়ে সহরটা আরো জমকালো। সহরটা একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায়, বিরাট বিরাট পাথর দিয়ে তৈরী তোরণ তামার জালিকাজ দিয়ে আঁটা। চারদিকের সমতলভূমির বহুদূর থেকেই সহরটার অট্টালিকা দেখা যায়।

'মীকেনায়ে, তিরিন্‌থুস আর ওর্কোমেনুসের প্রাসাদভবনের দেয়ালচিত্রগুলোর রং এখনো উজ্জ্বল রয়েছে, ধনী জমিদাররা এখনো মাঝে মাঝে মস্ত সাদা পাথরের মসৃণ রাস্তা দিয়ে রথ চালিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু রাস্তায়, খালি বাড়ির উঠোনে, এমনকি মস্ত প্রাচীরের গায়ের ঘাসের রেখায় কালের পদক্ষেপ ক্রমেই বেড়ে উঠছে।

'অসীম ঐশ্বর্যের দিন আজ গত, সমৃদ্ধ আইগিপ্তসে* দীর্ঘ যাত্রা ফুরিয়ে গেছে। এইসব সহরের চারপাশে এখন রয়েছে বিভিন্ন শক্তিশালী ফ্রাত্রি, প্রত্যেকটি ফ্রাত্রিতে রয়েছে বিপুলসংখ্যক যোদ্ধা। তাদের প্রধানরা অনেক জায়গা দখল করে বসে আছে। সহরগুলোও তাদের অধিকারের ছায়ায়। দুর্বল গোষ্ঠীগুলোকে বশবর্তী করে নিজেদের রাজ্য ও প্রজার শাসক বলে ঘোষণা করেছে তারা।

'এখানে এনিয়াদায় না আছে সেখানকার মতো শক্তিশালী কোন সর্দার না কোন সহর বা সুন্দর মন্দির। কিন্তু পূর্বদেশে তেমনি আবার ক্রীতদাসের সংখ্যাও বেশি — হতভাগ্য নারীপুরুষরা তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছে। বিদেশী বন্দী ছাড়াও স্বদেশের দরিদ্র গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের মধ্যে রয়েছে।

'ওদেশে বিদেশীদের কপালে কী লেখা আছে তা একবার ভেবে দেখ! অত্যন্ত শক্তিশালী সর্দারও যাকে ভয় করে এরকম কোন ফ্রাত্রির সহায়তা বা নিজেদের শক্তিশালী সশস্ত্র রক্ষীদল না থাকলে বিদেশীদের ওখানে হয় মরতে হবে নয়ত হতে হবে ক্রীতদাস।'

শিল্পী পান্দিওনের দুহাত ধরে বললেন:

'মনে রেখ পান্দিওন, আমাদের এই কালটা নানা বিঘ্নবিপদে ভরা। গোষ্ঠী আর ফ্রাত্রিগুলোর মধ্যে চলেছে শত্রুতা, কোথাও কোন বাঁধাধরা আইনকানুন নেই, বিদেশী মাত্রেরই মাথার উপর ঝুলছে দাসত্বের খাঁড়া। এই সুন্দর দেশ ভ্রমণের জন্য নয়। মনে রেখ, আমাদের ছেড়ে গেলে তোমার না থাকবে মাথা গুঁজবার আশ্রয়, না কোন অধিকার। যে কেউ তোমায় অপমান এমন কি খুন করতে পারবে, প্রতিশোধের লড়াই বা রক্তের মূল্যের জন্য তাকে ভাবতে হবে না। নিজে তুমি সহায় সম্বলহীন। আমিও তোমায় কোনদিক দিয়েই সাহায্য করতে পারব না, তাই একটা

---

* আইগিপ্তস্ — এই প্রাচীন গ্রীক নাম থেকেই আধুনিক ইজিপ্ট নামটির জন্ম। সাদা প্রাচীরের নগরী মেম্ফিসের মিশরী নাম হেৎ-কা-প্তা'র (প্তার আত্মার প্রাসাদ) বিকৃত গ্রীক রূপ।

ছোট্ট যোদ্ধাদলও তুমি গড়ে তুলতে পারবে না! দেবতারা যদি তোমায় অদৃশ্য করে না রাখেন তবে তোমার কপালে দুর্ভোগ আছে। আপাতদৃষ্টিতে সব কিছু খুব সহজ — আমাদের আখেলই অন্তরীপ থেকে উপসাগর পার হয়ে হাজার স্টেডিয়া গেলেই পেঁছিবে করিন্থে, সেখান থেকে মীকেনায়ে মাত্র আধ দিনের পথ, তিরিন্থুস্ একদিনের, ওর্কোমেনুস্ তিনদিনের। ব্যাপারটা ওইকুমেনার সীমানা পেরনরই সামিল!' আগেনর উঠে দরজার দিকে এগোলেন, পান্দিওনকেও সঙ্গে নিয়ে চল্লেন। বললেন, 'আমি আর আমার স্ত্রী তোমায় ছেলের মতো দেখি। আমি কিন্তু আমাদের কথা ভাবছি না ... তুমি বিদেশে দাসত্বে পড়লে আমার তেস্সা কী ভীষণ দুঃখ পাবে সেটা ভেবে দেখ!'

পান্দিওন লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

আগেনর বুঝলেন পান্দিওনকে তিনি বোঝাতে পারেননি। অথচ পান্দিওন দুই প্রবল আকর্ষণের মধ্যে দোল খাচ্ছে: একদিকে রয়েছে ঘরের বাঁধন, আরেকটি দিকে নিশ্চিত বিপদ সত্ত্বেও দূরের হাতছানি।

তেস্সা নিজেও কী করবে ভেবে পায় না। একবার যেতে বারণ করে, আবার মহৎ গর্বের প্রেরণায় যেতে বলে।

কেটে গেল কয়েকটা মাস। করিন্থ্ উপসাগর পার হয়ে আসা বসন্তের বাতাসের সঙ্গে ভেসে এল পেলোপনেসাসের প্রস্ফুটিত পাহাড়ে মৃদু গন্ধ। পান্দিওনও চূড়ান্তভাবে বেছে নিল তার জীবনের পথ।

সে ঠিক করেছে অজানা দূর দেশে সে একাই পাড়ি দেবে। ছমাস থাকবে বিদেশে। ঐ ছমাসই তার কাছে অনন্তকাল বলে মনে হতে লাগল। একেক সময় তার ভয় হত নিজের দেশ সে বোধ হয় চিরতরেই ছেড়ে যাচ্ছে... আগেনর তথা গ্রামের অন্যান্য জ্ঞানীগুণীরা তাকে প্রথমে ক্রীটে যাবার পরামর্শ দিলেন। সমুদ্রজাতির বংশধরদের দেশ ক্রীট্ প্রাচীন সভ্যতার আবাস। এই বিরাট দ্বীপটি প্রাচীন সহর বয়েতিয়া আর

আর্গলিস থেকে অনেক দূরে, কিন্তু তবু একা যাত্রীর পক্ষে এ পথই অধিক নিরাপদ।

দ্বীপটা নানা সমুদ্রপথের সংযোগস্থান। নানাজাতের লোকের সেখানে বাস। বিদেশীরা — বণিক নাবিক কুলি — হরদম তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্রীটের বহুভাষী বাসিন্দারা ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত; হেলাসের লোকের চেয়ে তারা অনেক শান্তিপ্রিয়, বিদেশীদের প্রতি সাধারণত সদয়। দ্বীপের ভিতরে, পাহাড়ের গিরিদ্বারের অপর দিকে অবশ্য এখনো প্রাচীন উপজাতিদের বাস। তারা কোন বিদেশীকেই সইতে পারে না।

কালিদন উপসাগর পার হয়ে পান্দিওনকে যেতে হবে নিম্ন আখাইয়া'র অপর পারের সূচীমুখ অন্তরীপে। সেখানে গিয়ে সে চেষ্টা করবে শীতের ঝড়ের পর যে সব পশমের জাহাজ ক্রীটে যায় তাতে দাঁড়ীর কাজ নিতে: গ্রীকরা শীতকালে পল্কা জাহাজ নিয়ে দূরপাল্লার যাত্রায় যেতে চায় না।

পূর্ণিমার দিন রাত্রে অঞ্চলের তরুণ তরুণীরা সবাই এসে জুটল পবিত্র কুঞ্জের বড় মাঠটায়। নাচ হবে।

আগেনরের বাড়ির ছোট্ট উঠোনটায় চিন্তামগ্ন পান্দিওন তার দুঃখের ভারে চুপ করে বসে আছে। যা অবশ্যম্ভাবী তা ঘটবে কাল — যা কিছু কাছের, যা কিছু প্রিয় সবকিছু ঝেড়ে ফেলে মুখোমুখি হতে হবে অজানা ভাগ্যের। ছেড়ে যেতে হবে তার প্রিয়াকে। সামনে রইবে কেবল বিচ্ছেদের দুঃখ, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর নিঃসঙ্গতা।

নিস্তব্ধ বাড়ির ভিতর তেস্সার কাপড়ের খসখস। কাঁধের উপর ফেলা উড়নিটার ভাঁজ ঠিক করতে করতে তেস্সা এল দরজার হাঁ-করা অন্ধকারে। তার মৃদু ডাকে পান্দিওন লাফিয়ে উঠে তার দিকে এগিয়ে গেল। তেস্সার কালো চুলগুলো ঘাড়ের কাছে খোঁপা করে বাঁধা। মাথার উপর থেকে খোঁপার নিচে নেমে এসেছে তিনটে ফিতে।

'আজ দেখছি অ্যাটিকার মেয়েদের মতো চুল বেঁধেছ,' পান্দিওন বল্ল। 'ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

তেস্‌সা স্মিত হেসে কিছুটা দুঃখের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল:

'আজ শেষবারের মতো নাচবে না পান্দিওন?'

'তুমি চাও?'

'হ্যাঁ,' দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল তেস্‌সা। 'নাচব আফ্রোদিতের উদ্দেশে, তারপর বক নৃত্যও।'

'ও অ্যাটিকার বক নৃত্য নাচবে বলেই বুঝি আজ এরকম করে চুল বাঁধা হয়েছে! বক নৃত্য আমরা আগে কখনো নেচেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'আজ সকলেই নাচবে — তোমার জন্য।'

পান্দিওন সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল:

'আমার জন্য কেন?'

'বাঃ, অ্যাটিকায় যে ওরা ক্রীট থেকে থিসিউসের* বিজয় গৌরবে ফিরে আসার স্মরণে বক নৃত্য নাচে, সেকথা বুঝি ভুলে গেলে...' তেস্‌সার গলা একটু কেঁপে উঠল। 'এস,' পান্দিওনের দিকে সে দুহাত বাড়িয়ে দিল। তারপর দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে লোকবসতি পেরিয়ে পবিত্র কুঞ্জে মিলিয়ে গেল ...

... সমুদ্র তার অসীম অপার জলরাশি মেলে দিয়ে, সগর্জনে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ভোরের প্রথম আলোয় ফুটে উঠে সমুদ্রের দূর অঞ্চল বাঁকা রেখায় যেন বিরাট সেতু গড়ে তুলেছে।

ধীর মন্থর তরঙ্গমালা ভোরের সূর্যের গোলাপী আভা মেখে কোন দূরদেশের তীর থেকে বয়ে নিয়ে আসছে সোনালি ফেনার টুকরো — হয়ত সেই উপকথার আইগিপ্‌তস্‌ থেকেই। অক্লান্ত, সদা আন্দোলিত

---

* থিসিউস — গ্রীক উপকথার বীর। ক্রীটে গিয়ে দৈত্য মিনতরের ভূগর্ভের গোলকধাঁধায় ঢুকে সে তাকে পরাস্ত করেছিল। এই দৈত্যের কাছে প্রতি বছর অ্যাটিকার সবচেয়ে সুন্দর তরুণ তরুণীদের অঞ্জলি দিতে হত। ক্রীটের শাসকের প্রতি এই ভীষণ করের হাত থেকে থিসিউস তার দেশকে রক্ষা করে।

জলরাশির বুকে দুলে দুলে নেচে উঠে ভেঙে পড়ছে সূর্যরশ্মি, বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে ক্ষীণ কম্পিত ছটা।

পথটা অদৃশ্য হয়ে গেছে টিলার আড়ালে। ঢাকা পড়ে গেছে গ্রামের সব বাড়িঘর আর হাত নেড়ে শেষ বিদায় জানান আগেনর পরিবার।

জনশূন্য সমতল তীর। আকাশ আর সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু পান্দিওন আর তেস্‌সা। সামনেই বালির বুকে ছোট্ট একটা নৌকোর কালো ছায়া — ঐ নৌকোতে চড়েই আখেলইয়ের মুখে অন্তরীপ পেরিয়ে যাবে পান্দিওন। তারপর পার হবে কালিদন উপসাগর।

পান্দিওন আর তেস্‌সা হেঁটে চলেছে। কারো মুখে একটিও কথা নেই। তাদের মন্থর পদক্ষেপে দৃঢ়তার অভাব: তেস্‌সা তাকিয়ে আছে পান্দিওনের মুখে, পান্দিওন তার চোখদুটো সরাতে পারে না প্রিয়ার মুখ থেকে।

দেখতে দেখতে, বড় বেশি তাড়াতাড়িই যেন, তারা পেঁাছে গেল নৌকোটার কাছে। পিঠ টান করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে পান্দিওন তার খিঁচধরা বুকটা ফুলিয়ে ঠিক করে নিল। বহুদিন বহুরাত্রি ধরে যে মুহূর্তটি তার মনের উপর ভারের মতো চেপে আছে সে মুহূর্ত আজ এসে পেঁাছেছে। এই শেষ মুহূর্তটিতে সে কত কথাই তেস্‌সাকে বলতে চায় অথচ ভাষা নেই।

পান্দিওন অপ্রস্তুতভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মাথায় তখন তার ঘুরছে যত অসম্পূর্ণ ভাবনা আর খাপছাড়া কথা।

হঠাৎ দুহাতে পান্দিওনের গলা সজোরে ধরল তেস্‌সা। তারপর পাছে কেউ শুনে ফেলে সেই ভয়েই যেন ফিসফিস করে বলতে লাগল:

'পান্দিওন প্রতিজ্ঞা কর, প্রতিজ্ঞা কর হিপেরিয়নের নামে, চাঁদ আর ডাইনীদের দেবী ভীষণা হেকেটির নামে ... না, প্রতিজ্ঞা কর তোমার আর আমার প্রেমের নামে যে, ক্রীট পেরিয়ে দূর আইগিপ্‌তসে যাবে না ... সেখানে গেলে তোমায় ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে, তবে চিরকালের মতো তোমায় হারাব ... কথা দাও শীগ্‌গীরি ফিরবে ...' তেস্‌সার কথা চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

তেস্‌সাকে বুকে চেপে ধরে পান্দিওন প্রতিজ্ঞা করল, তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল সমুদ্রের উদার বিস্তার, পাহাড়, কুঞ্জবন, অজানা সহরের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি সবকিছু, যা দীর্ঘ ছমাস তেস্‌সার কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখবে। সেই ছমাস সে তার প্রিয়াকে দেখতে পাবে না, সেও তার কোন খবর পাবে না।

পান্দিওন চোখ বুজল। তেস্‌সার হৃৎস্পন্দন সে অনুভব করতে পারছে।

সময় বয়ে চলেছে। ক্রমশই এগিয়ে আসছে অনিবার্য বিদায়কাল। অসহ্য হয়ে উঠছে বিচ্ছেদের প্রত্যাশা।

'যাও পান্দিওন, শীগ্‌গীরি... বিদায়...' ফিসফিস করে বলে উঠল তেস্‌সা।

শিউরে উঠে পান্দিওন তেস্‌সাকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল নৌকোর দিকে।

নৌকোটা বালির মধ্যে ঢুকে গেছে। পান্দিওন শক্ত দুই বাহুতে সেটাকে টেনে তুলল। বালির উপর দাগ কেটে এগিয়ে গেল নৌকোটা। হাঁটু জলে নেমে পান্দিওন একবার পিছন ফিরে তাকাল। ঢেউয়ের বুকে আন্দোলিত নৌকোটার ধার লাগল তার পায়ে।

মূর্তির মতো নিস্পন্দ নিশ্চল তেস্‌সা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অন্তরীপের দিকে, পান্দিওনের নৌকো কিছুক্ষণ পরেই তার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

পান্দিওনের বুকটা হঠাৎ ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। বালিতীর থেকে নৌকোটাকে জলে ঠেলে দিয়ে সে তার উপর লাফিয়ে উঠে দাঁড় ধরে বসল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফেরাল তেস্‌সা। পশ্চিমের বাতাস এসে লাগল তার চুলে। দুঃখের চিহ্ন হিসেবে চুলগুলো সে আজ খুলেই রেখেছে।

জোর দাঁড় বওয়ার ফলে নৌকো তীর ছেড়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চল্‌ল, কিন্তু পান্দিওন তখনো তেস্‌সার দিকে স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে। নগ্নকাঁধের উপর তেস্‌সার মুখ উঁচুতে তুলে ধরা।

বাতাস এসে তার কালো চুলের গোছাগুলোকে ছড়িয়ে দিচ্ছে মুখের উপর। তেস্‌সা কিন্তু তাদের ঠিক করে না। চুলের ভিতর দিয়ে তার চকচকে চোখদুটি, বাঁশির মতো নাকের স্ফুরিত নাসারন্ধ্র আর স্বল্পখোলা মুখের উজ্জ্বল লাল ঠোঁট পান্দিওন দেখতে পাচ্ছে। তেস্‌সার চুল বাতাসে উড়ে গোছা গোছা হয়ে তার গলায় জড়িয়ে গেছে, প্রান্তগুলোর অজস্র চূর্ণ বিছিয়ে গেছে তার গালে, কপালে আর উঁচু বুকের উপর। যতক্ষণ না নৌকোটা তীর ছেড়ে বহুদূরে চলে গিয়ে পূবদক্ষিণে তার হাল বেঁকাল ততক্ষণ তেস্‌সা তীরে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল।

তার মনে হল নৌকোটা তো অন্তরীপের কাছ ঘেষে যাচ্ছে না, সূর্যের পড়ন্ত আলোয় অন্ধকার আর ভয়াল উদ্গত অন্তরীপটাই সমুদ্রের দিকে সরে গিয়ে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে নৌকোটার দিকে। এখন তা চকচকে সমুদ্রের বুকে একটা কালো ফোঁটার কাছে পেঁাছেছে, ফোঁটাটা মিলিয়ে গেছে তার আড়ালে ...

বাহ্যজ্ঞানরহিত তেস্‌সা ধীরে ধীরে বসে পড়ল শক্ত ভেজা বালির উপর।

অসংখ্য ঢেউয়ের মধ্যে পান্দিওনের নৌকো গেল মিলিয়ে। আখেলই অন্তরীপ অনেকক্ষণ হল অদৃশ্য হয়ে গেছে, পান্দিওন কিন্তু তখনো সজোরে দাঁড় বেয়ে চলেছে। সে যেন ভয় পেয়েছে পাছে দুঃখের টানে আবার ফিরে যায়। আর কিছুই ভাবছে না। কড়া রোদে কঠোর পরিশ্রমে নিজেকে ক্লান্ত করে তোলাই তখন তার একমাত্র চেষ্টা ...

সূর্য নৌকোর পিছনে হেলে পড়ল। ধীর মন্থর ঢেউগুলোর গায়ে ফুটে উঠেছে ঘন মধুর রং। দাঁড়গুলো নৌকোর খোলে নামিয়ে রাখল পান্দিওন। তারপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে নৌকোর টাল সামলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে। জলে চাঙা হয়ে উঠে নৌকোটাকে সামনে ঠেলে রেখে সে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটল। তারপর নৌকায় আবার উঠে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়াল।

সামনেই দেখা যাচ্ছে একটা তীক্ষ্ণপ্রান্ত অন্তরীপ, বাঁয়ে পান্দিওনের নজরে পড়ল একটা লম্বা দ্বীপ। তার গন্তব্য কালিদন বন্দরটাকে দ্বীপটা দক্ষিণ দিক থেকে আড়াল করে রেখেছে। আবার সে দাঁড় ধরে বসল। দ্বীপটা ক্রমশ সমুদ্র থেকে উঠে এসে বড় হয়ে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই তার শীর্ষ রেখা বিভক্ত হয়ে গেল ছুঁচলো গাছের ডগায়। গাছগুলোও আবার পরিণত হল সমুন্নত সাইপ্রেসের সারিতে, যেন বিরাট বিরাট সব কালো বর্শা। শৈলান্তরীপের দক্ষিণে বাঁকা পাথুরে প্রান্ত হাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে সাইপ্রেস গাছগুলোকে, তারা অবাধে মাথা তুলে চলেছে স্বচ্ছ নীল আকাশে। লালচে জলজ আগাছায় ভরা পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে পান্দিওন সযত্নে নৌকো বেয়ে এগিয়ে গেল। সোনালি সবুজ জলের ভিতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মসৃণ তলের বালি। তীরে নেমে পান্দিওন দেখতে পেল শ্যাওলাঢাকা একটা প্রাচীন বেদীর কাছে কচি ঘাসে ভরা একটা ছোট্ট ফাঁকা জায়গা। সেখানে বসেই সে সঙ্গে আনা খাবার জলের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সবটা শেষ করে দিল। খাবার ইচ্ছে তার একটুও নেই। দ্বীপের অপর প্রান্তের বন্দরটা ওখান থেকে কুড়ি স্টেডিয়ার বেশি হবে না।

জাহাজের মালিকের কাছে ধুঁকতে ধুঁকতে যাওয়াটা উচিত হবে না, চাঙা হয়ে নেওয়াই ভাল। তাই সে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল।

চোখের সামনে পরিষ্কার ফুটে উঠল গতদিনের উৎসবনৃত্যের ছবি ...

পান্দিওন আর অন্যান্য তরুণরা ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছে কখন শেষ হয় আফ্রোদিতের প্রতি মেয়েদের নৃত্যারাধনা। মেয়েরা তখন পিঠে পিঠ দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় নেচে চলেছে। পরনে তাদের কোমরে নানা রঙের ফিতেয় বাঁধা হাল্কা মেখলা। হাতে হাত দিয়ে তারা ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাচ্ছে, যেন সঙ্গিনীর সৌন্দর্যের তারিফ করছে।

সাদা মেখলার বড় বড় ভাঁজগুলো চাঁদের আলোয় রুপোলি স্রোতের মতো উঠছে পড়ছে। নাচিয়েদের সূর্যস্নাত সোনালি শরীর বেতের মতো নুয়ে.পড়ছে বাঁশির মৃদু বিষণ্ণ তীক্ষ্ণ অথচ আনন্দভরা সুরে সুরে।

তারপর ছেলেরাও মেয়েদের সঙ্গে যোগ দিল বক নৃত্যে। আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে উঠে হাতদুটো তারা ছড়িয়ে দিল ডানার মতো। পান্দিওন নাচল তেস্‌সার পাশে পাশে, মেয়েটির ব্যথাভরা দুই চোখ সারাক্ষণ পান্দিওনের দিকেই তাকিয়ে।

ছেলেমেয়েদের সবার নজর সেদিন পান্দিওনের প্রতি। কেবল এভ্‌রিমাখ্‌, সেও তেস্‌সার প্রেমে পড়েছে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিদেশ যাত্রায় খুসি। অন্যেরা আজ পান্দিওনকে নিয়ে বরাবরকার মতো হাসি ঠাট্টা করছে না, ব্যঙ্গ বিদ্রূপও আজ কম — মনে হচ্ছে যে, যারা থাকছে তাদের সঙ্গে এরমধ্যেই তার একটা ফারাক হয়ে গেছে।

চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের আড়ালে অস্ত গেল। প্রান্তর জুড়ে নামল রাত্রির কালো পর্দা।

শেষ হল নাচের আসর। তেস্‌সা আর তার বান্ধবীরা মিলে গাইল সোয়ালো পাখি আর বসন্তের গান 'হিরেসিওনা' — গানটি পান্দিওনের বিশেষ প্রিয়। অবশেষে সবাই জোড়ায় জোড়ায় গ্রামের দিকে রওনা হল। পান্দিওন আর তেস্‌সা রইল সবার শেষে। ইচ্ছা করেই ধীরে ধীরে তারা হাঁটছিল। পাহাড়টার মাথায় এসে — নিচেই দেখা যাচ্ছে তাদের গ্রাম — তেস্‌সা শিউরে উঠে পান্দিওনকে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল।

আঙুরবাগানের পিছনে সাদা চুনাপাথরের দেয়ালগুলোর গায়ে তখন আয়নার মতো ফুটে উঠেছে চাঁদের আলো। মনে হল রুপোলি আলোর স্বচ্ছ পর্দায় ছেয়ে গেছে বাড়িঘর উপকূল আর অন্ধকার সমুদ্র। সে আলোয় ফুটে উঠেছে ভীষণ মোহনীয়তা আর নীরব দুঃখ।

'আমার ভীষণ ভয় করছে পান্দিওন,' তেস্‌সা ফিস্‌ফিস করে বলল। 'চাঁদের আলোর দেবী হেকেটির কী অসীম ক্ষমতা, তুমি যে দেশে যাচ্ছ সে দেশে আবার তাঁরই আধিপত্য ...'

পান্দিওনের মনেও সঞ্চারিত হল তেস্‌সার উত্তেজনা।

'না, না, তেস্‌সা, হেকেটি হচ্ছেন কারিয়ার কর্ত্রী। আমি তো ওদিকে যাচ্ছি না। আমি যাব ক্রীটে,' তেস্‌সাকে বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে যেতে পান্দিওন বল্‌ল ...'

পান্দিওনের স্বপ্ন ভাঙল। সময় হয়েছে খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে যাত্রা সুরু করার। সমুদ্রদেবতাকে পূজার নৈবেদ্য দিয়ে সে তীরে ফিরে গেল। সময় জানার জন্য নিজের ছায়ার দৈর্ঘ্য মেপে দেখল উনিশ ফুট লম্বা। বুঝল সন্ধ্যার আগে জাহাজে পৌঁছতে হলে তাড়াতাড়ি করতে হবে।

দ্বীপটাকে নৌকো করে বেড় দিয়ে পান্দিওন দেখতে পেল সমুদ্রের বুকে একটা সাদা খুঁটি দাঁড়িয়ে। বন্দরটার চিহ্ন। পান্দিওন দ্বিগুণ বেগে দাঁড় বাইতে লাগল।

ফেনার রাজ্য

শুকনো ঝোপঝাড়ে বিষণ্ণ আর্তনাদ তুলে বাতাস রুক্ষ বালির মেঘে চারদিক ঢেকে দিয়েছে। অজানা দৈত্যের তৈরী রাস্তার মতো পাহাড়শ্রেণী একটা বড় সবুজ উপত্যকাকে বেড় দিয়ে এগিয়ে চলেছে পুবমুখো। সমুদ্রের দিকে পাহাড়টা হলদে ফুলে ঢাকা ঢালু বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে

4 1757

এসেছে জলের কাছে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কম্পিত নীল সমুদ্রের বুকে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক সোনার তাল।

পান্দিওন গতি বাড়িয়ে দিল। এনিয়াদার জন্য আজ তার অন্যদিনের চেয়ে বেশি খারাপ লাগছে। সবাই তাকে ক্রীটের ঐ দূর পাহাড়ে অঞ্চলে যেতে বারণ করেছে — সেখানে থাকে সমুদ্র জাতির বংশধররা, বিদেশীদের তারা দুচোখে দেখতে পারে না।

পান্দিওনকে তাড়াতাড়ি করতেই হবে। সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মালার মতো বিছন এই দ্বীপের নানা অংশে সে পাঁচ মাস কাটিয়েছে। ফাঁকা মন্দির আর প্রায় জনমানবহীন সহরগুলোয় প্রাচীনেরা যেসব অত্যাশ্চর্য জিনিস রেখে গেছে তরুণ ভাস্কর সে সব ঘুরে ঘুরে দেখেছে।

ক্লস্সসের বিরাট প্রাসাদে সে বহুদিন কাটিয়েছে। প্রাসাদটির পুরনো অংশটির যেকালে জন্ম, মানুষের স্মৃতি সেখানে পৌঁছয় না। প্রাসাদের অসংখ্য সিঁড়ি বেয়ে ঘুরতে ঘুরতে পান্দিওন জীবনে প্রথম দেখতে পেয়েছে গোড়ার কাছে সরু হয়ে আসা লাল পাথরের স্তম্ভ। চমৎকৃত হয়েছে রঙিন কার্ণিসের বুকে আঁকা সাদা কালো আয়তক্ষেত্র বা পাকখাওয়া ঢেউয়ের ভঙ্গীতে আঁকা কালো আর ফিকে নীল রঙের ঘূর্ণিছোপ দেখে।

দেয়াল জোড়া চমৎকার রঙিন সব ছবি। পান্দিওন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে দেখেছে তাদের — ষাঁড়ের সঙ্গে পবিত্র খেলা; হাতে পাত্র নিয়ে মেয়েদের শোভাযাত্রা; একটা ঘেরা জায়গায় তরুণী মেয়েদের নাচ, পুরুষরা সব বাইরে ভীড় করে দাঁড়িয়ে; পাহাড় আর অদ্ভুত গাছপালার মাঝখানে অজানা সব সর্পিল জন্তু। মূর্তিগুলোর ঘেরগুলি পান্দিওনের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকেছে, গাছগুলোর কাণ্ডগুলোও বড় বেশি লম্বা আর পাতা প্রায় নেই বললেই চলে। অবশ্য একথা সে বুঝল, প্রাচীন কালের শিল্পীরা বিশেষ কোন চিন্তা প্রকাশের জন্য ইচ্ছা করেই স্বাভাবিক গড়নের বিকৃতি ঘটিয়েছে। কিন্তু পান্দিওনের কাছে সেই চিন্তাটা দুর্বোধ্যই রয়ে গেছে — কঠোর সুন্দর প্রকৃতির কোলে স্বাধীনভাবে সে বড় হয়ে উঠেছে।

ক্নস্সস, তিলিস্সোস, আয়লিরা আর বহুকাল আগেই বিস্মৃতনাম 'স্লেট নগরীর' প্রাচীন বন্দরটার রহস্যময় ভগ্নাবশেষের প্রতিটি বাড়ি তৈরী মসৃণ ধূসর স্তরিত পাথর দিয়ে। সাধারণ চলতি পাথর কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। পান্দিওন দেখেছে হাতির দাঁত আর চীনামাটির তৈরী নানারকম ছোট ছোট নারীমূর্তি আর সোনা রুপোর খাদ মিশিয়ে তৈরী চমৎকার সব বাসনকোসন, গায়ে তাদের আবার সূক্ষ্ম হাতে খোদাই করা ছবি।

এই সব শিল্পসম্ভার দেখে অবাক হয়ে গেছে এই তরুণ গ্রীক। কিন্তু ভগ্নাবশেষের বহু জায়গায় অতীতকালের মৃত ভাষার প্রতীকচিহ্নে লেখা রহস্যময় শিলালেখের মতো এই সব শিল্পসম্ভারও তার কাছে মনে হয়েছে বোঝার অতীত। এই সব শিল্পসম্ভারের ক্ষুদ্রতম অংশেও যে অপূর্ব কলাকৌশল প্রকাশ পেয়েছে পান্দিওন তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সে চায় আরো বেশি কিছু — মানব শরীরের সজীব সৌন্দর্যকেই সে রূপ দিতে চায়।

অপ্রত্যাশিতভাবে সে দেখেছে দূর আইগিপ্‌তস্‌ থেকে আনা শিল্পসম্ভারে মানুষ ও জীবজন্তুর বাস্তবানুগ রূপগঠন।

ক্নস্সস, তিলিস্সোস আর আয়লিরার বাসিন্দারা যারা পান্দিওনকে এইসব শিল্পসম্ভার দেখিয়েছে তারা জানিয়েছে, ফায়েস্তসে এই জাতীয় শিল্পসম্ভার আরো অনেক পাওয়া যাবে। সেখানে এখনো সমুদ্র জাতির বংশধরদের বাস। নানা বিপদের ভয় সত্ত্বেও পান্দিওন তাই ঠিক করেছে, ক্রীটের দক্ষিণ তীরের পর্বতমালা ভেদ করে এগিয়ে যাবে।

কয়েকদিন পরেই যতদূর সম্ভব সব কিছু দেখে সে ফিরে যাবে তেস্‌সার কাছে। পান্দিওন এখন নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। আইগিপ্‌তসের শিল্পীদের কাছে কাজ শেখার তার যত ইচ্ছাই থাক, তেস্‌সা আর স্বদেশের প্রতি তার ভালবাসার জোর অনেক বেশি। তেস্‌সার কাছে তার প্রতিজ্ঞা তাকে সজোরে বেঁধে রেখেছে।

হেমন্তের শেষ জাহাজে উঠে বাড়ি ফেরায় সত্যিই কী গভীর আনন্দ। প্রিয়ার উজ্জ্বল নীল চোখদুটি সে আবার দেখতে পাবে,

দেখতে পাবে গুরু আগেনরের মৌন আনন্দ। তিনিই এখন তার বাবা আর ঠাকুর্দার স্থান গ্রহণ করেছেন।

চোখ কুঁচকে পান্দিওন সমুদ্রের অসীম বিস্তৃতির দিকে চেয়ে দেখল। না, ঐ বিস্তৃতি তার জন্য নয় — ঐখানে, ঐ সামনে রয়েছে দূরদেশ অজানা আইগিপ্‌তস্, পিছনে রয়েছে তার জন্মভূমি, ঐ পর্বতমালার পিছনে। কিন্তু তবু সে সামনেই এগিয়ে চলেছে, নিজের দেশ থেকে দূরে। উপকূলে সে ফায়েস্তসের প্রাচীন মন্দিরের কথা এত শুনেছে, তাদের না দেখে সে কিছুতেই ফিরতে পারবে না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে গতি বাড়িয়ে দিয়ে প্রায় দৌড়তেই সুরু করল। পর্বতমালার ঢালুতে ঘাসের চাঙড়ের মতো পাথর বিক্ষিপ্ত। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঝোপঝাড়। ঢালুর পায়ের কাছে গাছের ফাঁকে একটা বিরাট দালানের আবছায়া ভগ্নাবশেষ। দেয়ালগুলো অর্ধেক ভেঙে পড়েছে, খিলান আর দরজার অবশিষ্ট তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো সাদা স্তম্ভের ফ্রেমের মাঝখানে।

ভগ্নাবশেষের বুক জুড়ে নৈঃশব্দ্য, ভাঙা দেয়ালের বাঁকা অংশগুলো শিকার ধরতে উদ্যত দৈত্যের হাতের মতো এগিয়ে এসেছে পান্দিওনের দিকে। দেয়ালগুলোর গায়ে নতুন ফাটল — সদ্যগত ভূমিকম্পের চিহ্ন।

তরুণ ভাস্কর নীরবে ঘুরে ঘুরে দেখছে সেই ভগ্নাবশেষ। চারদিকের নিস্তব্ধতা সে ব্যাহত করতে চায় না।

একটা বেরিয়ে-আসা কোণ ঘুরতে পান্দিওন এসে পড়ল একটা ছাদহীন আয়ত ঘরে, দেয়ালগুলো সুপরিচিত উজ্জ্বলরঙের চিত্রে ভরা। দেখতে পেল কালো আর খয়েরী রঙের মানুষেরা একের পর এক এগিয়ে চলেছে। তাদের হাতে ঢাল তলোয়ার, তীর ধনুক, চারপাশে রয়েছে অদ্ভুত সব জীবজন্তু আর জাহাজ। দাদুর গল্পগুলো পান্দিওনের মনে পড়ল। বুঝতে পারল, ঐ সৈন্যদল চলেছে কালোদের দেশ আক্রমণ করতে। প্রাচীন উপকথা অনুযায়ী সে দেশ হচ্ছে ওইকুমেনার প্রান্তে।

প্রাচীন কালের লোকদের সাংঘাতিক যাত্রার নিদর্শনে অবাক পান্দিওন অনেকক্ষণ ধরে ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঘুরে তাকিয়ে

দেখতে পেল ঘরের মাঝখানে দাঁড়-করান একটা শ্বেতপাথরের ঘনক। গায়ে তার নীল কুণ্ডলী আর কাচের পাতার অলংকরণ। পায়ের কাছে জমা করা সদ্য তোলা ফুল।

কেউ তবে এখানে এসেছিল। এই ভগ্নাবশেষে নিশ্চয়ই তবে লোকজন বাস করে! রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পান্দিওন ছুটে গেল বড় বড় ঘাসে ভরা একটা বারান্দায়।

দুটো সাদা রঙের চৌকো আর দুটো লাল রঙের গোল স্তম্ভ সম্বলিত বারান্দাটা একটা গভীর খাদের উপর দাঁড়িয়ে। ঢালুর মাথাটা নানাগাছের ঘন পাতার আবরণ ভেদ করে একটু উপরে উঠেছে। ঢালুর গা বেয়ে নেমেছে একটা ধুলো ভরা পায়ে চলা পথ। উপত্যকায় নেমে পান্দিওন এসে পড়ল একটা পাকা বাঁধান রাস্তায়। উত্তপ্ত পাথরের উপরে নিঃশব্দে পা ফেলে পান্দিওন এগিয়ে চলল পুবমুখে। রাস্তার ডান ধারে প্লেনগাছের বড় বড় পাতার একসারি ছায়া পড়েছে, উত্তপ্ত বাতাসে পাতাগুলো প্রায় নড়ছেই না। প্রচণ্ড সূর্যের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পান্দিওন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অনেকক্ষণ থেকেই তার তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু দেশে জলকষ্ট বলে তাকে তেষ্টা সহ্য করতে শিখতে হয়েছে। প্রায় দুস্টেডিয়া হাঁটার পর এক ছোট্ট পাহাড়ের পাদদেশে একটা লম্বা নিচু বাড়ি পান্দিওনের চোখে পড়ল। রাস্তাটা ঐখানেই উত্তরমুখে বাঁক নিয়েছে। রাস্তার দিকে মুখ-করা একধাঁচের বাক্সের মতো একসার ঘর। একেবারেই ফাঁকা। পান্দিওন বুঝতে পারল, বাড়িটা হল প্রাচীন কালের পান্থশালা — দ্বীপের উত্তরাংশে সে এরকম অনেক বাড়ি দেখেছে, তাই সে তাড়াতাড়ি প্রধান প্রবেশদ্বারের দিকে এগিয়ে গেল। উজ্জ্বল রং লাগান প্রবেশদ্বারটাকে দুভাগে ভাগ করেছে একটা স্তম্ভ। পান্দিওনের কানে পৌঁছল জলের স্রোতের মৃদু কলধ্বনি, — দীর্ঘযাত্রার পরিশ্রম আর গরমে সে তখন ভেঙে পড়েছে। সে স্নানাগারে ঢুকল। একটা ঝর্ণা থেকে জল ঝরে পড়ছে, চারপাশের মেঝেটায় ভারী বড় বড় পাথরের টুকরো বসান। একটা চওড়া নল এবং তারপর পরপর বসান তিনটে বড় বড় চৌবাচ্চার কানাতের

উপর দিয়ে ঝর্ণার জল এসে পড়েছে দেয়ালের ভিতরে বসান একটা বিরাট ফানেলে।

জামাকাপড় আর জুতো খুলে ফেলে পান্দিওন পরিষ্কার ঠান্ডা জলে স্নান করে পেট ভরে জল খেয়ে নিল। তারপর একটা পাথরের বেঞ্চিতে শুয়ে জিরতে লাগল। জলের কুল্‌কুল্‌ শব্দ আর পাতার মৃদু মর্মরে তার দেহমন জুড়িয়ে গেল। প্রচণ্ড রোদ আর গিরিদ্বারের বাতাসে উত্তপ্ত তার চোখদুটো বুজে এল। পান্দিওন ঘুমিয়ে পড়ল।

বেশিক্ষণ সে ঘুমোয়নি, চোখ মেলে দেখল, রোদে আলোকিত মেঝের উপর স্তম্ভের ছায়া তখনো প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। পান্দিওন লাফিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি তার অতি সাধারণ বেশবাস পরে নিল। শরীরটা তখন বেশ চাঙা হয়ে উঠেছে। কিছু শুকনো পনীর আর জল খেয়ে নিয়ে দরজার কাছে এগোতেই সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল — দূর থেকে ভেসে আসছে কণ্ঠস্বর। রাস্তায় বেরিয়ে সে চারপাশটা একবার চেয়ে দেখল। রাস্তার একধারের ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে ভেসে আসছে হাসির শব্দ, অজানা ভাষার টুকরো টুকরো কথা আর তারের যন্ত্রের টুংটাং।

পান্দিওনের মনে একই সঙ্গে দেখা দিল আনন্দ আর ভয়। মাংস-পেশীগুলো টান টান হয়ে উঠল, আপনা থেকেই হাতটা এসে পড়ল তার বাবার তলোয়ারের বাঁটের উপর। অস্ফুটস্বরে তার রক্ষাকর্তা আর পূর্বপুরুষ হিপেরিয়নকে স্মরণ করে নিয়ে সে ঝোপঝাড় ভেদ করে সোজা এগিয়ে চলল সেই শব্দের দিকে। গাছপালার ঝোপে গরমে আর কড়া গন্ধে দম বন্ধ হবার জোগাড়।

খুব সতর্কভাবে বড় বড় কাঁটাওয়ালা লম্বা ঝোপগুলোকে বেড় দিয়ে পাতলা মসৃণ ফিকে ছাই রং'এর বাকলওয়ালা স্ট্রবেরিগাছের গোড়া ঘেঁষে গলে এগিয়ে গিয়ে সে দেখল সামনে মার্টল্‌কুঞ্জের দুর্ভেদ্য দেয়াল।

ঘন পাতার আচ্ছাদন থেকে ঝুলে আছে সাদা ফুলের গোছা। মুহূর্তের জন্য পান্দিওনের মনে পড়ল তেস্‌সার কথা — তার দেশে মার্টল্‌গাছ তরুণী কুমারীদের পূজ্যবস্তু। লোকের গলার স্বর এখন খুব কাছেই শোনা যাচ্ছে — কী কারণে যেন লোকগুলো চাপাস্বরে কথা বলছে।

পান্দিওন বুঝতে পারল, দূরত্বটা আঁচ করতে তার ভুল হয়েছিল। এবার এল চরম মুহূর্ত। নিচু হয়ে পান্দিওন দুহাতে সাবধানে নিচের ডাল সরিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। দেখতে পেল কচি ঘাসে ঢাকা ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটায় এক অসাধারণ দৃশ্য।

ফাঁকা জায়গাটার ঠিক মাঝখানটিতে শুয়ে লম্বা শিংওয়ালা একটা ধবধবে সাদা ষাঁড়। তার চিক্কণ গায়ে আর মুখে ছোট ছোট কালো ফোঁটা।

একটু দূরে ছায়ায় একদল তরুণ তরুণী আর বয়স্ক লোক। ঢেউখেলান দাড়ি, লম্বা, ঋজুদেহ একটি লোক, মাথায় তার সোনার পাত, পরনে ব্রোঞ্জের কোমরবন্ধ লাগান ছোট জামা, দলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে কী যেন একটা ইশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে দল থেকে একটি অল্পবয়সী মেয়ে এগিয়ে এল, পরনে তার লম্বা মোটাকাপড়ের জোব্বা। হাতদুটি মাথার উপরে তুলতে মেয়েটির পরনের জোব্বা খুলে পড়ে গেল, শুধু একটা কৌপীন গায়ে, কালো পশমী দড়িতে অলংকৃত চওড়া সাদা নীবীবন্ধ দিয়ে সেটি বেঁধে রাখা। মেয়েটির খোলা কালো চুল পড়েছে ঘাড়ের উপর, দুই বাহুতে ঠিক কনুইয়ের উপর সরু চুড়ির চমক।

হাল্কা দ্রুত পায়ে প্রায় নাচতে নাচতেই মেয়েটি ষাঁড়টির কাছে এগিয়ে এল। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে গলা দিয়ে ঘড়ঘড় করে অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে উঠল। ষাঁড়টার ঘুম ঘুম চোখদুটো খুলে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে গেল। সামনের পাদুটো মুড়ে সে তার মস্ত মাথাটা তুলতে সুরু করল। মেয়েটি তীরবেগে এগিয়ে এসে ষাঁড়ের গায়ে নিজেকে চেপে ধরল। দুয়েক সেকেণ্ড মেয়েটি আর ষাঁড়টা নিশ্চল। পান্দিওনের সারা শরীর শিউরে উঠল।

সামনের পাদুটো সোজা করে ষাঁড়টা তার মাথাটা তুলে ধরল। পিছনের পাদুটো তখনো পূর্ববৎ মাটিতে। দেখে মনে হল, মারাত্মক মাংসপেশীর যেন এক বিরাট পিরামিড। ষাঁড়ের সাদা পিঠের খাড়া ঢালুর গায়ে মেয়েটির সোনালি রঙের শরীর পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। একহাতে ষাঁড়ের শিং ধরে মেয়েটি অন্যহাতে জড়িয়ে আছে ষাঁড়ের বিশাল গলা। তার শক্তসমর্থ পাদুটির একটি বিরাট জন্তুটার পিছন বরাবর ছড়ান,

শরীরটা জ্যাবদ্ধ ধনুকের মতো সামনে উঠে আছে। ষাঁড়টা যেমন সুন্দর তেমনি ভীষণ, প্রচণ্ড তার শক্তি। তার শরীরের সঙ্গে মানুষের সর্পিল শরীরের বৈষম্যে পান্দিওন মুগ্ধ হয়ে গেল।

ক্ষণেকের জন্য পান্দিওনের চোখে পড়ল মেয়েটির কঠোর মুখটির জোর করে চাপা ঠোঁট। একটা গম্ভীর গর্জনের সঙ্গে বিরাট শরীর সত্ত্বেও অত্যন্ত সহজভাবে লাফিয়ে উঠল ষাঁড়টা। শূন্যে উঠে গিয়ে মেয়েটি ষাঁড়টার মস্ত ঘাড় দুহাতে ধরে রেখে আকাশে পা তুলে বিরাট দুই শিঙের মাঝখান দিয়ে ডিগবাজী খেয়ে ষাঁড়টার মাথার ঠিক তিনপা সামনে নেমে পড়ল। দুহাত সামনে ছড়িয়ে হাততালি দিয়ে মেয়েটি আবার তীক্ষ্ণ চীৎকার করে উঠল। ক্ষ্যাপা ষাঁড়টা তেড়ে এল শিং বাগিয়ে। পান্দিওন ভীষণ ভয় পেয়ে গেল: অমন সুন্দর আর সাহসী মেয়েটি এবার নিশ্চয়ই মারা পড়বে। সব সতর্কতা ভুলে গিয়ে পান্দিওন তলোয়ার নিয়ে মেয়েটির দিকে ছুটে যাবে এমন সময় আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মেয়েটি আবার ষাঁড়টার দিকে লাফ মেরে মারাত্মক শিংদুটো পার হয়ে উঠে পড়ল একেবারে ষাঁড়ের উপর। রাগের চোটে সারা মাঠ ছুটে বেড়িয়ে ক্ষুর দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল ষাঁড়টা, ভয়াবহরকম গর্জন করতে থাকল। বিজয়ী তরুণীটি তখন নিশ্চিন্ত মনে দুপায়ে ষাঁড়ের পিঠ চেপে রেখে দিব্যি বসে আছে। ষাঁড়টা দ্রুতবেগে জোর জোর নিঃশ্বাস নিচ্ছে। পর মুহূর্তে ষাঁড়টা ছুটে গেল দর্শকদের দিকে, তারা চীৎকার করে তার প্রশংসা করল। মেয়েটি হাততালি দিয়ে ডিগবাজী খেয়ে ষাঁড়ের পিছন দিকে মাটিতে নেমে পড়ল। আনন্দের উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে সে দর্শকদের দলে যোগ দিল।

ষাঁড়টা মাঠের একধারে সোজা ছুটে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দর্শকদের দিকে তেড়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে দল ছেড়ে এগিয়ে এল পাঁচ জন — দুটি মেয়ে আর তিনটি ছেলে। তারপর আবার খেলা সুরু হল, এবার আরো দ্রুত গতিতে। ষাঁড়টা হাঁপাতে হাঁপাতে তেড়ে গেল খেলোয়াড়দের। খেলোয়াড়রা চেঁচিয়ে আর হাততালি দিয়ে ষাঁড়টাকে ডেকে আশ্চর্য কৌশলে সাংঘাতিক শিংদুটো এড়িয়ে গিয়ে লাফ মেরে তার পিঠে উঠে বসল, মুহূর্তের

জন্য পাশে ঘেঁষে রইল। একটি মেয়ে তো একেবারে সরাসরি ষাঁড়ের ঘাড়ের উপরেই ঠিক কুঁজ আর শিঙের মাঝখানে চেপে বসল। ষাঁড়টার চোখদুটো তো কোটর থেকে বেরিয়ে আসার জোগাড়, মুখ দিয়ে ফেনা বেরচ্ছে। মাথা নামিয়ে প্রায় মাটিতে নাক ঠেকিয়ে সেই সাহসী মেয়েটিকে ঝেড়ে ফেলার তার প্রাণপণ চেষ্টা। মেয়েটি পিছনে ঝুঁকে দুহাতে ষাঁড়ের কুঁজটা চেপে ধরে পাদুটো কানের কাছে জোরে চেপে ধরে রইল। কয়েক মুহূর্ত পর সে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

তারপর পাঁচজনে নিজেদের মধ্যে কিছুটা ফাঁক রেখে এক সারিতে দাঁড়িয়ে একের পর এক ষাঁড়ের পিঠের উপর দিয়ে ব্যাংবাজী খেলতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে চলল এ খেলা — ষাঁড়টা ভীষণ চেঁচাতে চেঁচাতে সামনে পিছনে তাড়া করে বেড়াতে লাগল মারাত্মক ভঙ্গীতে কিন্তু সর্পিল ভঙ্গীর সেই মানব শরীরগুলো নির্ভয়ে তার চারপাশে ছুটে বেড়াল।

ষাঁড়ের গর্জন পরিণত হল কর্কশ আর্তনাদে, গায়ের চামড়া তখন ঘামে কালো। নিঃশ্বাস হয়ে উঠল খাপছাড়া, মুখ দিয়ে বেরতে লাগল ফেনা। কয়েক মুহূর্ত পরেই ষাঁড়টা দাঁড়িয়ে গিয়ে মাথা নামিয়ে এপাশ ওপাশ তাকাতে লাগল। দর্শকদের চিৎকারে তখন আকাশ বাতাস মুখরিত। মাথায় সোনার পাত বাঁধা লোকটি ইঙ্গিত করতেই খেলোয়াড়রা যাঁড়টাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। দর্শক, যারা ঘাসের উপর বসে বা দাঁড়িয়ে ছিল, সবাই একত্র হল। তারপর পান্দিওন বুঝতে পারার আগেই সবাই অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

ষাঁড়টা সেই মাঠে একা পড়ে রইল। তার খাপছাড়া হাঁপানি আর ক্ষতবিক্ষত ঘাস ছাড়া একটু আগের লড়াইয়ের কোন চিহ্নই কোথাও রইল না।

উত্তেজিত পান্দিওন কেবল তখনই বুঝতে পারল তার বিরাট সৌভাগ্যের কথা। ক্রীট, মীকেনায়ে আর অন্যান্য প্রাচীন গ্রীক সহরে শত শত বছর আগে যে ষাঁড়ের খেলা প্রচলিত ছিল সেই খেলাই আজ সে দেখতে পেয়েছে।

ক্ষিপ্র দক্ষ সাহসী মানুষ রক্তপাতহীন যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে প্রাচীনদের পূজ্য প্রাণীকে। তাকে তারা যুদ্ধক্ষমতা আর দুর্ধর্ষ শক্তির মূর্তি বলে মনে করত। ষাঁড়ের বিদ্যুদ্গতিকে বাগ মানাবার জন্য রয়েছে আরো প্রচণ্ড গতিশক্তি। নিখুঁৎ শরীরসঞ্চালন ক্ষমতা হচ্ছে খেলোয়াড়দের আত্মরক্ষার উপায়। পান্দিওন ছোটবেলা থেকে শরীর আর শক্তিচর্চার তালিম নিয়েছে, তাই এই জাতীয় বিপজ্জনক খেলার জন্য শরীরকে যে কত কষ্ট করে তৈরী করতে হয় তা সে ভালভাবেই বুঝতে পারল।

খেলোয়াড়দের পিছন পিছন না গিয়ে পান্দিওন রাস্তার দিকেই ফিরল। মনে করল, কোন লোকের বাড়িতেই আতিথ্য চাওয়া উচিত।

বেশ কয়েক স্টেডিয়া রাস্তাটা একেবারে সোজা গেছে, তারপর হঠাৎ দক্ষিণমুখে বাঁক নিয়েছে সমুদ্রের দিকে। দুপাশের গাছগুলোর জায়গায় দেখা দিয়েছে ধুলোয় ভরা ঝোপঝাড়। রাস্তার মোড়ে পান্দিওন যখন পেঁাছল তখন তার ছায়া বেশ দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। ঝোপের ভিতর খড়মড় আওয়াজ শুনে সে থেমে গেল। একটা পাখি লাফিয়ে উঠে আবার ঝোপের ভিতরেই ঢুকে পড়ল। চোখে রোদ পড়ায় পাখিটাকে পান্দিওন চিনতে পারল না। অকারণ ভয় কেটে যাওয়ায় পান্দিওন আবার এগোতে লাগল, ঝোপের সেই আওয়াজ নিয়ে সে আর মাথা ঘামাল না। দূর থেকে ভেসে এল বুনো ঘুঘুর নরম মিষ্টি ডাক। আরো দুটো পাখি সে ডাকে সাড়া দিল, তারপর আবার সব চুপচাপ। মোড়টা পার হতে ঘুঘুর ডাক কাছ থেকেই শোনা গেল। ঘুঘুটাকে দেখার জন্য পান্দিওন দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ ঠিক তার পিছনেই শোনা গেল ডানা ঝাপটানর আওয়াজ। একজোড়া পাখি আকাশে উড়ে গেল। পান্দিওন ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল হাতে মোটা লাঠি নিয়ে তিনজন লোক।

কানফাটান চীৎকার করে নবাগত তিনজন পান্দিওনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে পান্দিওন তার তলোয়ার টেনে বের করল, কিন্তু তার আগেই মাথায় তার চোট লেগেছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়া আরো কয়েকজনের চাপে পান্দিওন টলে উঠল — পিছনের ঝোপ থেকে আরো চারজন লোক এসে জুটেছে।

পান্দিওন তখন প্রায় অজ্ঞান, তবু এটুকু সে বুঝতে পারল, রক্ষা পাবার কোন উপায়ই নেই। মরীয়া হয়ে সে আত্মরক্ষা করে চলল, কিন্তু হাতের উপর একটা জোর ঘা পড়তেই তার তলোয়ার গেল খসে। পান্দিওন হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। যে লোকটা তার পিঠে উঠেছিল তাকে মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল, আরেকজন তার এক ঘুষি খেয়েই চিৎপটাং, তৃতীয় জন লাথির চোটে গোঙাতে গোঙাতে একপাশে গিয়ে পড়ল।

বিদেশীকে প্রাণে মারার কোন ইচ্ছা আক্রমণকারীদের সম্ভবত ছিল না। হাতের লাঠি ফেলে দিয়ে তারা আবার পান্দিওনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাঁচজনের চাপে সে বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে যেতে মুখে চোখে নাকে বালি ঢুকে গেল। অসম্ভব বুঝেও হাঁসফাঁস করতে করতে পান্দিওন হামাগুড়ি দিয়ে উঠে লোকগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করল। শত্রুরা তার পায়ের নিচে পড়ে গেল, ঘাড়টা চেপে ধরল। আবার সবাই মাটির উপর জড়াজড়ি সুরু করে দিল। রোদে লাল ধুলোর ঝড় উঠল। আক্রমণকারীরা পান্দিওনের অসাধারণ গায়ের জোর আর সহ্যশক্তির পরিচয় পেয়ে চেঁচামেচি থামিয়ে দিল — নির্জন রাস্তার নৈঃশব্দ্য ব্যাহত হল কেবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঝুটোপুটি, হাঁসফাঁস আর গোঙানিতে।

জামাকাপড় সবার ছিঁড়েখুঁড়ে একসা, গাময় ধুলোবালি, কিন্তু তবু লড়াইয়ের শেষ নেই।

পান্দিওন কয়েকবার শত্রুদের ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু প্রতিবারই প্রতিপক্ষ তার ঠ্যাং ধরে তাকে আবার মাটিতে পেড়ে ফেলল। হঠাৎ শোনা গেল আকাশ বাতাস ভরে জয়ধ্বনি: আরো চারজন লোক এসে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। মোটা চামড়ার দড়ি দিয়ে পান্দিওনের হাতপা বেঁধে ফেলা হল। ক্লান্তি আর হতাশায় অর্ধমৃত পান্দিওন চোখ বুজে ফেলল। বিজয়ী শত্রুপক্ষ জোর লড়াইয়ের পর তার পাশে ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম করতে করতে অজানা ভাষায় সোৎসাহে নিজেদের মধ্যে কথা বলে চলল।

কিছুটা জিরিয়ে নিয়ে লোকগুলো উঠে পড়ে পান্দিওনকে ইশারায় তাদের সঙ্গে আসতে বলল। প্রতিবাদের যে আর কোন মানে হয় না, তা বুঝতে পেরে পান্দিওন ঠিক করল, পরের কোন সুযোগের জন্য

তাগদ বাঁচিয়ে রাখবে। তাই মাথা নেড়ে ওদের কথায় সম্মতি জানাল। তার পা খুলে দেওয়া হল। শত্রুপরিবেষ্টিত পান্দিওন ধুঁকতে ধুঁকতে এগোল পথ ধরে।

কিছুক্ষণ পরেই তারা এবড়োখেবড়ো পাথরের কয়েকটা জীর্ণ বাড়িতে এসে পেঁছল। বাসিন্দারা সব বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল — মাথায় ব্রোঞ্জের পাত বসান এক বুড়ো, কয়েক জন মেয়ে আর কয়েকটা বাচ্চা। বুড়ো পান্দিওনের কাছে এগিয়ে এসে সপ্রশংস চোখে তাকে একবার দেখে নিয়ে তার মাংশপেশীগুলো টিপে টুপে পরখ করে খুশমেজাজে তার সঙ্গীদের কী যেন বলল। পান্দিওনকে তখন একটা ছোট বাড়ির কাছে নিয়ে যাওয়া হল।

তীব্র আওয়াজ করে দরজাটা খুলে গেল — ভিতরে একটা ছোট্ট চুল্লি, একটা নেহাই, তার চারপাশে নানারকম যন্ত্র আর একগাদা কাঠকয়লা। দেয়ালে ঝুলছে দুটো পাতলা বড়ো চাকা। একটা হিংস্র মুখ বেঁটে বুড়ো, হাতদুটো লম্বা, পান্দিওনের সঙ্গীদের একজনকে চুল্লির আগুনটা উস্কে দিতে বলে দেয়ালের পেরেক থেকে একটা ব্রোঞ্জের পাত তুলে নিল। তারপর বন্দীর কাছে এগিয়ে এসে তার থুৎনিতে এক ঘা কসিয়ে দিয়ে পাতটার জন্য গলার মাপ নিতে লাগল। বিরক্তির সঙ্গে কী সব বিড়বিড় করে সে কামারশালার এক কোণে গিয়ে প্রচণ্ড আওয়াজ করে একটা লোহার শিকল টেনে বার করল। শিকলের শেষ গ্রন্থিটা আগুনে দিয়ে বুড়ো ব্রোঞ্জের পাতটা নেহাইয়ের উপর ধরে হাতুড়ি মেরে সেটাকে মাপমত বানাতে লাগল।

এতক্ষণে পান্দিওন তার বিপদটা পুরোমাত্রায় বুঝতে পারল। জগতে যা কিছু তার প্রিয় একের পর এক ভেসে উঠল চোখের সামনে। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে তেস্সা ... পান্দিওন আর তার ভালবাসায় তার গভীর বিশ্বাস ... সে যে ফিরে আসবে সে বিষয়েও তেস্সা নিশ্চিত। কিছুক্ষণ পরেই পান্দিওনের গলায় ক্রীতদাসদের ব্রোঞ্জের আংটা পরান হবে, মোটা শিকলে তাকে বেঁধে দেবে। শীগগীর ছাড়া পাবার কোন আশাই থাকবে না। এদিকে ক্রীটে তার শেষ কটা দিন সে আগেই গুণে রেখে দিয়েছিল ...

ভেবেছিল শীগ্‌গীরি কালিদন বন্দরে সে পাল গুটতে পারবে, সেখান থেকেই তো তার ভয়ানক যাত্রার সুরু।

'হে হিপেরিয়ন, আমার পূর্বপুরুষ, হে আফ্রোদিতে, আমায় হয় মৃত্যু দাও নয়ত মুক্তি,' পান্দিওন ফিসফিস করে বলল।

কামার তখন ধীরে সুস্থে যথাযথভাবে তার কাজ করে চলেছে। আংটাটা দ্বিতীয়বার মেপে নিয়ে ধারগুলো পিটে চেপটা করল। তারপর সেটা বেঁকিয়ে তার গায়ে ফুটো করে দিল। এখন কেবল শিকলটা গলায় লাগান বাকি। বুড়ো খ্যাঁক খ্যাঁক করে কী একটা বলল। অন্যেরা পান্দিওনকে চেপে ধরে ইশারায় নেহাইয়ের পাশে শুয়ে পড়তে বলল। ছাড়া পাবার শেষ চেষ্টায় পান্দিওন সর্বশক্তি প্রয়োগ করল। কনুইয়ের কাছে বাঁধা চামড়ার দড়ি গায়ে কেটে বসে রক্ত ঝরতে লাগল। কিন্তু বাঁধন আলগা হয়ে আসতে দেখে পান্দিওন সব ব্যথাযন্ত্রণা ভুলে গেল। এক সেকেন্ড পরেই বাঁধন ছিঁড়ে গেল। যে লোকটা তাকে শোয়াবার চেষ্টা করছিল মাথা দিয়ে তার থুৎনিতে ভীষণ এক গোঁতা দিয়ে পান্দিওন তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। তারপর আরো দুজনকে কুপোকাৎ করে দৌড় মারল রাস্তা দিয়ে। শত্রুরা গর্জন করতে করতে তার পিছনে ছুটল। তাদের চীৎকার শুনে আরো অনেকে বল্লম ছুরি আর তলোয়ার নিয়ে ছুটে এল; পিছুধাওয়াদের দল ক্রমশই বেড়ে উঠল।

রাস্তা ছেড়ে ঝোপঝাড় লাফিয়ে পার হয়ে পান্দিওন দৌড়ল সমুদ্রের দিকে। শত্রুপক্ষ রাগে গজরাতে গজরাতে এগোতে থাকল তার পিছু পিছু।

ঝোপঝাড় কমে এল, মাঠটা ক্রমশ উপরে উঠেছে। ঢালু বেয়ে উপরে উঠে পান্দিওন দাঁড়িয়ে পড়ল — অনেক নিচে খাড়া পাহাড়ের দেয়ালের তল ঘেঁষে রোদ মেখে ঝলমল করছে সমুদ্র। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তীর থেকে প্রায় দশ স্টেডিয়া দূরে পাল তুলে ধীরে ধীরে চলেছে একটা লাল জাহাজ।

পাহাড়ের ধার দিয়ে পান্দিওন ছুটতে লাগল, নিচে নামার পথ খোঁজার চেষ্টায়। কিন্তু দুদিকেই খাড়া পাহাড়। পালাবার কোন উপায়

নেই। ওদিকে শত্রুপক্ষ ঝোপঝাড় পার হয়ে এগিয়ে আসছে। তাকে তিনদিক থেকে ধরে ফেলার জন্য তারা ছুটছে অর্ধচন্দ্রাকারে।

শত্রুপক্ষের দিকে একবার তাকিয়ে পান্দিওন পাহাড়ের খাদের দিকে তাকাল। "সামনে মৃত্যু, পিছনে দাসত্ব," মনে মনে বলল পান্দিওন। "তেস্‌সা, আমায় নিশ্চয় ক্ষমা করবে যদি কখনো জানতে পার ..." কিন্তু আর দেরী করার সময় নেই।

পান্দিওন যে পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে, সেটা পাহাড় থেকে একটু এগিয়ে গেছে। তার প্রায় কুড়ি হাত নিচে পাহাড়ের আর একটা পাথর তাকের মতো বেরিয়ে এসেছে, তাতে একটা বেঁটে পাইনগাছ।

আদরের সমুদ্রকে শেষবারের মতো দেখে নিয়ে পান্দিওন সেই নিঃসঙ্গ গাছটার মোটা ডালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্য কানে পৌঁছল শত্রুপক্ষের ক্রুদ্ধ গর্জন। গাছের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডালপালা ভেঙে নিজের দেহ ক্ষতবিক্ষত করে পান্দিওন পাহাড়ের ধার পেরিয়ে পড়ল গিয়ে নিচের ঢালুর নরম মাটিতে। তারপর আরো কুড়ি হাত গড়িয়ে গিয়ে থামল জোয়ারের জলে ভেজা একটা পাথরের ধারে। তখনো তার মুহ্যমান অবস্থা। শত্রুর হাত যে এড়িয়েছে একথাও বুঝতে না পেরে পান্দিওন হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে পড়ল। উপর থেকে শত্রুপক্ষ পাথর আর বর্শা ছুঁড়ছে। পায়ের কাছে সমুদ্র।

জাহাজটা এগিয়ে এল, তীরের ঘটনায় জাহাজের লোকরাও যেন উৎসুক।

পান্দিওনের মাথা তখন ভোঁ ভোঁ করছে। সারা গায়ে সাংঘাতিক ব্যথা। যন্ত্রণায় চোখে জল এসে যাওয়ার অবস্থা। আবছাভাবে মনে হল, শত্রুপক্ষ তীর ধনুক নিয়ে এসে পড়লে মৃত্যু তার অনিবার্য। সমুদ্র ওদিকে তাকে ডাকছে। জাহাজটা মনে হয় যেন ভগবানের প্রেরিত মুক্তির আশ্বাস। পান্দিওনের খেয়াল হল না ওটা বিদেশী জাহাজও হতে পারে, এমন কি শত্রুপক্ষের হওয়াও সম্ভব। কেবল মনে হল, তার আপন সমুদ্র তাকে কক্ষনো ঠকাবে না।

দাঁড়িয়ে উঠে পান্দিওন দেখল হাতদুটো ঠিকই আছে। তারপর সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল। মাথার উপর ঝাপটা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঢেউগুলো, ক্ষতবিক্ষত শরীর তবু নতিস্বীকার করতে চায় না তার ইচ্ছাশক্তি, ক্ষতের জায়গাগুলো ভীষণ জ্বলছে, গলা শুকিয়ে কাঠ।

জাহাজটা পান্দিওনের দিকে এগিয়ে এল। জাহাজের লোকেরা তখন পান্দিওনকে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে। দাঁড়ের ক্যাঁচ্‌কোঁচ শব্দ তার কানে পেঁছচ্ছে, জাহাজের খোলটা একেবারে তার মাথার উপর। কয়েকজোড়া শক্তসমর্থ হাত তাকে টেনে পাটাতনে তুলে নিল ... জ্ঞানহীন মৃতপ্রায় পান্দিওন লুটিয়ে পড়ল জাহাজের উত্তপ্ত পাটার উপর। জ্ঞান ফিরে এলে লোকেরা তাকে জল দিতে পান্দিওন অনেকক্ষণ ধরে অত্যন্ত তৃষার্তভাবে জল খেল। তারপর তার মনে হল তাকে একধারে বয়ে নিয়ে গিয়ে কী একটা দিয়ে যেন ঢেকে দেওয়া হল। তরুণ ভাস্কর গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ল।

দিগন্তে ক্রীটের পর্বতমালার অস্পষ্ট আভাস। পান্দিওন একটু নড়ে নিজের অজান্তেই আর্তনাদ করে উঠে চোখ খুলল। যে জাহাজে সে উঠেছে দেশের জাহাজের সঙ্গে তার কোনই মিল নেই। বেতের কঞ্চি দিয়ে দুপাশ মোড়া কিনার আর খোলের উপর দাঁড়গুলো সবই অন্যরকম। জাহাজটার পাশগুলো উঁচু। খোলের গর্ভে চওড়া হয়ে গেছে একটা গ্যাংওয়ে। তারই দুপাশের ডেকের নিচে বসেছে দাঁড়িরা। জাহাজের মাঝখানের মাস্তুলটার পালটা গ্রীসের জাহাজের চেয়ে যেমন উঁচু তেমনি সরু।

জাহাজের পাটাতনে গাদা করা চামড়ার বিশ্রী গন্ধ। পান্দিওন শুয়েছিল সামনের দিকের সরু তেকোণা জায়গায়। মোটা উলের পোষাক পরা টিয়াপাখিনাক এক দাড়িওয়ালা লোক এগিয়ে এসে গরম জল আর মদ মেশান একটা পাত্র পান্দিওনকে দিয়ে খ্যান্‌খ্যানে গলায় দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব বলতে লাগল, পান্দিওন মাথা নাড়ল। তখন লোকটা তার কাঁধ ছুঁয়ে হুকুমের ভঙ্গীতে তাকে জাহাজের পিছন দিকটা দেখিয়ে

দিল। পান্দিওন তার রক্তমাখা ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়গুলো গায়ে জড়িয়ে নিয়ে জাহাজের ধার দিয়ে পিছন দিকের চাঁদোয়ার দিকে এগিয়ে গেল।

সঙ্গের লোকটির মতো টিয়াপাখিনাক একটি রোগা লোক সেখানে বসেছিল। শক্ত খাড়া খাড়া দাড়িতে ঘেরা তার ঠোঁটদুটোয় ফুটে উঠেছে হাসি। রোদেজলে পোড়া তার লোভী আর ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো মুখটায় নিষ্ঠুরতার ছাপ।

পান্দিওন বুঝতে পারল এটা ফিনিশীয় সওদাগরী জাহাজ আর সামনের লোকটি হচ্ছে জাহাজের ক্যাপ্টেন বা মালিক।

লোকটির প্রথম দুটি প্রশ্ন পান্দিওন বুঝতে পারল না। তারপর লোকটি পান্দিওনের পরিচিত ভাঙা আইয়োনীয় উপভাষায় কারিয়ান আর এত্রাস্কান শব্দ মিশিয়ে কথা বলতে লাগল। লোকটি জিজ্ঞেস করল পান্দিওনের অভিযাত্রার কথা, কোথা থেকে সে এসেছে, কী তার পরিচয়। নিষ্পলক চোখ আর ঈগলের মতো নাকটা পান্দিওনের মুখের কাছে এনে সে বলল:

'তোমার পালানর ব্যাপারটা আমি দেখেছি — এমন সাহস আর বীরত্ব প্রাচীন কালের বীরেরই উপযুক্ত। তোমার মতো নির্ভীক শক্তিশালী যোদ্ধার আমার প্রয়োজন — জলে আর উপকূলে আমাদের ব্যবসার সামগ্রী লুঠ করার জন্য ওত পেতে রয়েছে অজস্র দস্যু। তুমি যদি বিশ্বস্তভাবে আমার কাজ কর তবে তোমার ভালই হবে, তোমায় আমি পুরস্কৃতও করব।'

পান্দিওন মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে ছাড়া ছাড়া ভাবে বলল, তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে যেতেই হবে, সবচেয়ে কাছের দ্বীপে নামিয়ে দেবার জন্য সে লোকটিকে অনুরোধ করল।

সওদাগরের চোখে ফুটে উঠল ক্রূর দীপ্তি।

'আমার জাহাজ সোজা টায়ারের* দিকে চলেছে, পথে জল ছাড়া আর কিছুই নেই। এই জাহাজে আমিই রাজা, তুমি আমার অধীন। ইচ্ছা

---

* টায়ার — ফিনিশীয় দেশের আদিম রাজধানী, বর্তমান সিরিয়ার দক্ষিণে।

করলে এখনি তোমায় মেরে ফেলার হুকুম দিতে পারি। কী করবে ভেবে দেখ, ঐখানে,' — আঙুল দিয়ে সওদাগর দেখিয়ে দিল পাটাতনের নিচে, তালে তালে দাঁড় বাওয়া বিষণ্ণ গান গাওয়া মাঝিদের দিকে, — 'দাঁড়ের সঙ্গে শিকলে বাঁধা ক্রীতদাস হয়ে থাকবে, না ওদের দলে যোগ দেবে,' সওদাগরের আঙুলটা ঘুরে গিয়ে দেখিয়ে দিল চাঁদোয়ার নিচে বসে থাকা পাঁচজন অর্ধউলঙ্গ বোকা বোকা হিংস্রমুখ ষণ্ডাগুণ্ডা লোককে। 'আমায় বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখ না।'

পান্দিওন অসহায়ভাবে চারদিকে তাকাল। জাহাজ দ্রুত গতিতে ক্রীট ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের সঙ্গে তার দূরত্ব দ্রুত বেড়ে উঠছে। কোন দিক থেকেই কোন সাহায্য পাবার উপায় নেই।

পান্দিওন ভেবে দেখল, সৈন্যের কাজ নিলে পর পালাবার সুযোগ বেশি পাওয়া যাবে। ফিনিশীয় সওদাগরটি অবশ্য গ্রীকদের স্বভাব চরিত্র ভাল করেই জানত। তাই পান্দিওনকে দিয়ে সে তিনটি ভীষণ শপথ করিয়ে নিল।

তারপর সে পান্দিওনের ক্ষতে মলম লাগিয়ে দিল। পান্দিওনকে সৈন্যদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে খাবার দাবার দিতে বলল।

'এর উপর নজর রেখ,' সওদাগর অন্যদের সাবধান করে বলল। 'মনে রেখ, সবার কাজের জন্য তোমাদের প্রত্যেককেই আমি দায়ী করব।'

সৈন্যদের সর্দার সম্মতির হাসি হেসে পান্দিওনের কাঁধ চাপড়ে তার মাংসপেশীগুলো টিপে দেখে অন্যদের কী যেন বলল। সৈন্যরা অট্টহাস্য করে উঠল। পান্দিওন অবাক হয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইল। নিজের গভীর দুঃখের জন্য সে অন্যদের মতো হয়ে উঠতে পারেনি।

চারদিনের মধ্যে পান্দিওন তার নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিল। কাটাছেঁড়া এমন কিছু হয়নি, কয়েকদিনের মধ্যেই সব গেল শুকিয়ে। আরো দুদিন কাটলে পর তবে তারা পৌঁছবে টায়ারে।

জাহাজের মালিক পান্দিওনের মনীষা আর বহুমুখী জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তার উপর ভারী খুসি। পান্দিওনের সঙ্গে তার কয়েকবার কথাবার্তাও হল। পান্দিওন তার কাছে শুনল, দক্ষিণে কালোদের দেশে যাবার যে পথ প্রাচীন কালে ক্রীটের লোকেরা ব্যবহার করত সেই পথ ধরেই তারা চলেছে। শত্রুভাবাপন্ন শক্তিশালী আইগিপ্তসের তীর বরাবর পথটা এগিয়ে গেছে বিরাট মরুভূমির ধার দিয়ে সেই কুয়াশাদ্বার* পর্যন্ত।

কুয়াশাদ্বারের পরেই উত্তর আর দক্ষিণের পাহাড়গুলো কাছাকাছি এসে সৃষ্টি করেছে এক সরু প্রণালী। সেইখানেই বিরাট কুয়াশাসাগরে** পৃথিবীর শেষ। ঐখানে এসে জাহাজগুলো দক্ষিণে মোড় নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই কালোদের গরম দেশের তীরে গিয়ে পেঁছয়। সে দেশ হাতির দাঁত সোনা তেল আর চামড়ায় সমৃদ্ধ। প্রাচীন ক্রীটের লোকেরা যে এপথে যাতায়াত করত পান্দিওন তা জানত, সেই অশুভ দিনটাতেই সে এই যাত্রার ছবি দেখেছে। সমুদ্রজাতির লোকেরা সুদূর দক্ষিণে এমন সব দেশে গেছে যেখানে আইগিপ্তসের লোকেরাও পেঁছতে পারেনি।

পান্দিওনের কালে অবশ্য ফিনিশীয় জাহাজ উত্তর আর দক্ষিণের উপকূলাঞ্চল ঘুরে সস্তা মাল আর শক্তিশালী ক্রীতদাস জোগাড় করে বেড়াত, কুচিৎ কখনো কুয়াশাদ্বারের ওপারে যেত।

ফিনিশীয় সওদাগর পান্দিওনের অসাধারণ প্রতিভা দেখে তাকে নিজের কাছে রাখতে চাইল। দূর দেশ ভ্রমণের লোভ দেখিয়ে ভবিষ্যতে অনেক উন্নতির আশা দিল। এমনকি একথাও জানাল যে, দশ পনের বছর ভালভাবে কাজ করলে পান্দিওন নিজেই একদিন সওদাগর বা জাহাজের মালিক হয়ে উঠবে।

সওদাগরের কথা পান্দিওন খুব মন দিয়েই শুনত, কিন্তু একথা সে ভাল করেই জানে, সওদাগরের জীবন তার জন্য নয়, — বিদেশে

---

* কুয়াশাদ্বার — জিব্রাল্টার প্রণালী।

** কুয়াশাসাগর — আট্লাণ্টিক মহাসাগর।

ধনদৌলতের লোভে সে কখনো জন্মভূমি, তেস্সা আর তার স্বাধীন শিল্পীজীবন ত্যাগ করতে পারবে না।

যতই দিন যায় তেস্সাকে মুহূর্তের জন্যও দেখার ইচ্ছা ততই বেড়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় সেই পবিত্র পাইনকুঞ্জের প্রবল শব্দ শোনে যেখানে কেটেছে তার অনেক আনন্দক্ষণ। সঙ্গীরা পাশে শুয়ে নাক ডাকায়, পান্দিওনের চোখে কিন্তু ঘুম আসে না। তার হতাশার আর্তনাদ সে কত কষ্টেই না চেপে রাখে।

জাহাজের মালিক তাকে কর্ণধারের কাজ শেখার আদেশ দিয়েছে। হাল ধরে পান্দিওন দাঁড়িয়ে থাকে, সূর্যের অবস্থান কিম্বা অভিজ্ঞ কর্ণধারের নির্দেশ অনুসারে রাত্রে তারা দেখে জাহাজের দিকনির্ণয় করে অথচ কালের চাকা যেন আর চলেই না।

সেদিন রাত্রেও পান্দিওন জাহাজের কিনারায় শরীরের একপাশ চেপে দুরন্ত হাওয়ার মুখে শক্ত করে হাল ধরে আছে। জাহাজের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আরেকজন কর্ণধার আর যোদ্ধা*। আকাশের ভয়ানক চেহারা। মেঘের ফাঁক দিয়ে ঝিকমিক করে তারাগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে বিষণ্ণ অন্ধকারে। বাতাসের করুণ স্বর ক্রমশই বেড়ে উঠে পরিণত হয়েছে অলক্ষুণে গর্জনে।

ঢেউয়ের মাথায় দুরন্ত ভঙ্গীতে দোল খাচ্ছে জাহাজ। দাঁড়গুলো বিরস স্বরে পড়ে চলেছে জলের উপর। থেকে থেকেই শোনা যাচ্ছে আরো জোরে দাঁড় টানার জন্য ক্রীতদাসদের প্রতি সর্দারের গালমন্দ আর চাবুকের আওয়াজ।

চাঁদোয়ার নিচের বিছানা ছেড়ে মালিক উঠে এল উপরে। সমুদ্রের অবস্থাটা ভাল করে দেখে নিয়ে সে উৎকণ্ঠিত হয়ে এগিয়ে এল প্রধান কর্ণধারের কাছে। অনেকক্ষণ ধরে দুজনের কথা হল। সৈন্যদের ঘুম থেকে তুলে হালের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে মালিক নিজেও এসে দাঁড়াল পান্দিওনের পাশে।

---

* সে কালের জাহাজে দুদিকেই হাল থাকত।

বাতাসের মুখ হঠাৎ ঘুরে গিয়ে জাহাজের গায়ে ভীষণ ঘা দিতে লাগল। ঢেউ ক্রমশই উত্তাল হয়ে উঠে পড়ছে পাটাতনের উপর। মাস্তুল নামিয়ে নেওয়া হল। চামড়ার গাদার উপর পড়ে সেটা বেরিয়ে রইল জাহাজের গলুইয়ের গায়ে শব্দ তুলে।

বাতাস আর ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই ক্রমেই মরীয়া হয়ে উঠছে। মালিক বিড়বিড় করে ভগবানের নাম না কী সব গালমন্দ করে কর্ণধারদের দক্ষিণে জাহাজ ফেরাতে বলল। পিছন থেকে বাতাসের ঠেলায় জাহাজ তরতর করে ছুটে চলল সমুদ্রের কালো অজানা দিকে। জাহাজের দিক ঠিক রাখার কঠিন কাজে দেখতে দেখতে রাত পুইয়ে গেল। ঊষার ধূসর আলোয় বিরাট বিরাট ঢেউগুলো হয়ে উঠল আরো ভয়ানক। ঝড় থামেনি, দুরন্ত বাতাস জাহাজের গায়ে অবিরাম আঘাত হেনে চলেছে।

জাহাজের ডেকজুড়ে হঠাৎ আর্তনাদ শোনা গেল — সবাই মালিককে দেখিয়ে দিল জাহাজের সামনে ডানদিকটা। ঊষার অল্প আলোয় সমুদ্র ফেনার দীর্ঘ রেখায় বিভক্ত। সেই ধূসরনীল রেখার কাছে এগিয়ে গিয়ে ঢেউগুলোর পাগলামিও কিছু শান্ত হয়ে এসেছে।

জাহাজের মাঝিমাল্লারা সবাই মালিককে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এমনকি কর্ণধারও একজন যোদ্ধার হাতে হাল ধরিয়ে দিয়েছে। ভয়ের চীৎকার ক্রমে পরিণত হল দ্রুত উত্তেজিত আলাপে। পান্দিওন দেখল, সবার চোখ তার দিকেই স্থিরবদ্ধ: তাকেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সবাই ঘুষি পাকাচ্ছে। ব্যাপারটা সে কিছু বুঝতে পারল না, কেবল দেখল জাহাজের মালিক রেগেমেগে হাত নেড়ে অন্যদের কথার প্রতিবাদ করছে। বুড়ো কর্ণধার মালিকের হাত ধরে তার কানে কানে অনেকক্ষণ ধরে কী যেন বলল। মালিক তার উত্তরে মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে ছাড়া ছাড়া ভাবে দুএকটা কথা চেঁচিয়ে বলে উঠল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকে হার মানতেই হল। মুহূর্তের মধ্যে অন্যেরা হতভম্ব পান্দিওনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

'ওদের মতে তুমি নাকি অমঙ্গল ডেকে এনেছ', মাঝিমাল্লাদের দিকে অবজ্ঞাভরে হাত নেড়ে মালিক বলল পান্দিওনকে। 'তুমি হচ্ছ দুর্যোগের

বাহন, তোমার উপস্থিতির ফলেই আমাদের জাহাজ তা-কেম*, তোমাদের ভাষায় আইগিপ্‌তসের দিকে ভেসে এসেছে। দেবতাদের খুসি করার জন্য তোমায় মেরে জলে ফেলে দিতে হবে, জাহাজের লোকেদের এইটেই দাবী, আমি তোমায় রক্ষা করতে অসমর্থ।'

পান্দিওন তখনও কিছুই বুঝতে না পেরে সওদাগরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'তা-কেমের উপকূলে নামা মানে আমাদের সকলেরই হয় মৃত্যু নয় দাসত্ব,' মালিক বিষণ্নভাবে বিড়বিড় করে বলল। 'অনেক কাল আগে তা-কেম আর সমুদ্র জাতির মধ্যে লড়াই হয়েছিল। তারপর থেকে বিদেশীদের জন্য মুক্ত তিনটি বন্দর ছাড়া দেশের অন্য যে কোন জায়গায় যে কেউ নামুক না কেন তাকে হয় মরতে হবে নয়ত হতে হবে ক্রীতদাস। তার সম্পত্তি সব যাবে তা-কেমের রাজকোষে... বুঝতে পারলে?' হঠাৎ থেমে গিয়ে পান্দিওনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সওদাগর চেয়ে রইল দ্রুত এগিয়ে আসা ফেনার রেখার দিকে।

পান্দিওন বুঝতে পারল আবার তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মৃত্যু। কিন্তু তার এই প্রিয় জীবনটার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে লড়তে প্রস্তুত। জাহাজের হন্যে হয়ে-ওঠা মাঝিমাল্লাদের দিকে সে তাকাল অসহায় ঘৃণার দৃষ্টিতে।

এই হতাশার অবস্থায় তাকে মনস্থির করতে হল তাড়াতাড়ি।

'মনিবমশাই!' সে বলে উঠল, 'তোমার লোকদের বল আমায় ছেড়ে দিতে — আমি নিজেই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব!'

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' তার দিকে ঘুরে বলল সওদাগর। 'কাপুরুষগুলো তোমায় দেখে শিখুক!'

মালিকের আদেশসূচক ইশারায় যোদ্ধারা পান্দিওনকে ছেড়ে দিল। কারো দিকে না তাকিয়ে পান্দিওন সোজা চলে গেল জাহাজের একপাশে। সবাই তাকে নীরবে পথ ছেড়ে দিল, মৃত্যুপথযাত্রীকে লোকে যেমন পথ

* তা-কেম — কালো দেশ, বা শুধু কেম অর্থাৎ কালো। প্রাচীন মিশরীরা তাদের দেশের এই নামকরণ করেছিল।

ছেড়ে দেয়। ফেনার রেখার দিকে স্থিরদৃষ্টে চেয়ে রইল পান্দিওন। ঐ ফেনার নিচে লুকিয়ে আছে নিচু সমতল উপকূল। মারাত্মক ঢেউয়ের জোরের সঙ্গে নিজের শারীরিক ক্ষমতা সে আপনা থেকেই একবার যাচাই করে নিল। ভেসে এল নানা রকম টুকরো চিন্তা: ফেনার রেখার ওপারের দেশ — ফেনার রাজ্য ... আফ্রিকা ...*

এই তবে সেই ভয়াবহ আইগিপ্‌তস্‌!.. তেস্‌সার কাছে দেব-দেবীদের নাম করে, তাদের প্রেমের কথা স্মরণ করে সে প্রতিজ্ঞা করেছে, অতদূরে যাবার চিন্তা পর্যন্ত সে কক্ষনো মনে আনবে না!.. হায়!.. ভাগ্যের এ কী কৌতুক!.. কিন্তু খুব সম্ভব তাকে মরতেই হবে, সেটাই সবচেয়ে ভাল ...

মাথা নিচু করে পান্দিওন ঝাঁপ দিল সেই গর্জনক্ষুব্ধ অতলে। তারপর দুই সমর্থ বাহুতে সাঁতার কেটে দূরে চলে যেতে লাগল জাহাজ ছেড়ে। ঢেউগুলি সঙ্গে সঙ্গে তাকে টেনে নিল। মানুষের মৃত্যুতে তারা যেন ভারী খুসি। এই তাকে মাথায় তোলে, এই আবার নামিয়ে দেয় অতল গহ্বরে, তাকে দলে পিষে আছড়ে ফেলে, জলে ভরে দেয় নাক মুখ, ফেনা ছিটিয়ে চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। পান্দিওন তখন কিছুই ভাবছে না — সে প্রাণপণে সংগ্রাম করে চলেছে প্রাণটার জন্য, লড়াই করে চলেছে প্রতিটি নিঃশ্বাসের আশায়। হাত আর পা দুটো তার কাজ করে চলেছে ভীষণ বেগে। সে গ্রীক, সমুদ্রেই তার জন্ম, সাঁতারে তাই সে খুবই দক্ষ।

সময় বয়ে চলে। ঢেউগুলো তাকে ক্রমেই ঠেলে নিয়ে চলে পাড়ের দিকে। জাহাজের দিকে সে আর ফিরে তাকায় না, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে তার অস্তিত্বের কথা সে ভুলেই গেছে। ঢেউয়ের লাফঝাঁপ ক্রমে কমে আসছে। আগের থেকে আরো ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় নিয়ে ছুটে এসে তারা গর্জে ভেঙে পড়ছে বিক্ষুব্ধ চঞ্চল ফেনা ছিটিয়ে। প্রত্যেকটা ঢেউ পান্দিওনকে নিয়ে যায় একশ হাত এগিয়ে। কখনো কখনো সে ডুবে যায়

* আফ্রিকা — গ্রীক 'আফ্রোস' থেকে উৎপত্তি, কথাটির মানে ফেনা। এই কথা থেকেই আফ্রোদিতে নামটি এসেছে — অর্থ হল ফেনায় যার জন্ম।

ঢেউয়ের গহ্বরে, তখন মারাত্মক ঢেউয়ের চাপে সে তলিয়ে যায় নিচের অন্ধকূপে, জলের চাপে হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবার জোগাড়।

এইভাবে অনেকটা সে সাঁতরে গেল। ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধে পার হয়ে গেল অনেক সময়। অবশেষে তার জোর ফুরিয়ে এল। সে বুঝতে পারল, তাকে জড়িয়ে ধরতে এগিয়ে আসা এই বিরাট দৈত্যকায় ঢেউগুলোর সঙ্গে লড়াই করার শক্তি তার আর নেই। যতই সে দুর্বল হয়ে পড়ে ততই তার বাঁচার ইচ্ছা কমে যায়। যন্ত্রণাকাতর হাতপাগুলোকে আরো খাটান অসম্ভব হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে সাঁতার কেটে সংগ্রাম চালানর ইচ্ছাও ঝিমিয়ে আসে। নিজের প্রায় অবাধ্য হাতের ছাড়া ছাড়া আন্দোলনে একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে দূরের মাতৃভূমির দিকে মুখ ফিরিয়ে সে প্রাণপণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল:

'তেস্‌সা, তেস্‌সা!..'

দুর্ভাগ্যের মুখে, সমুদ্রের উদাসীন ভীষণ শক্তির সামনে দুবার উচ্চারিত তার প্রিয় নাম হারিয়ে গেল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের গর্জনে। একটা বিরাট ঢেউ এসে পড়ল পান্দিওনের নিশ্চল শরীরের উপর। পান্দিওন ডুবে গেল। ঠেকল এসে সমুদ্রতলের মন্থিত বালির ঘূর্ণিতে।

বিরাট সবুজ সাগর* উপকূলের পাহারা ঘাঁটি। সবুজ রঙের খাট অধোবাস পরা দুজন সৈনিক লম্বা বর্শায় ভর দিয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে।

'ক্যাপ্‌টেন সেনেব আমাদের শুধু শুধুই এখানে পাঠিয়েছেন,' অলসভাবে বলল একজন। দুজনের মধ্যে সেই বয়সে বড়।

'কিন্তু ফিনিশীয় জাহাজটা তীরের খুব কাছেই এসেছিল,' অন্যজন প্রতিবাদ করে উঠল। 'ঝড় মরে না এলে অত্যন্ত সস্তায় শিকার পাওয়া যেত, একেবারে দুর্গের কাছেই।'

---

* বিরাট সবুজ সাগর — ভূমধ্যসাগর। মিশরীদের দেওয়া নাম।

'দেখ, দেখ, ঐ দেখ,' তীরের বালির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল জ্যেষ্ঠ জন, 'ঐ জাহাজেরই লোক যদি না হয় তবে মরার পর গোরস্থানে আমার যেন ঠাঁই না মেলে!'

অনেকক্ষণ ধরে যোদ্ধা দুজন তীরের বালির উপর একটা কালো ফোঁটার দিকে চেয়ে রইল।

'চল ফিরে যাই,' বলল তরুণ যোদ্ধাটি, 'বালির মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে যথেষ্ট হাঁটাহাঁটি হয়েছে। ধনদৌলতের বদলে জলে ফেলে দেওয়া পরদেশীর দেহ নিয়ে কী লাভ — মালপত্তর আর ক্রীতদাসরা সব জাহাজেই রয়েছে...'

'বড় না ভেবেচিন্তে কথা বল,' বয়স্ক লোকটি আবার বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'মাঝে মাঝে ঐ সব ব্যবসায়ীদের পরনে থাকে দামী পোষাক আসাক, গয়নাগাটিও। একটা সোনার আংটি যদি পাওয়া যায় তাতে ক্ষতি কী। প্রতিটি জলে ডোবা লোকের কথা সেনেবকে জানাবার কোনই দরকার নেই...'

ঝড়ে বিপর্যস্ত তীরের ভেজা চাপা বালি মাড়িয়ে সৈন্যরা এগিয়ে গেল।

'কোথায় তোমার গয়নাগাটি?' তরুণ সৈনিকটি বিদ্রূপের স্বরে বলে উঠল। 'এ যে একেবারে নেংটা।'

বয়স্ক লোকটি বিরক্ত হয়ে গালাগাল দিয়ে উঠল।

সত্যিই বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা লোকটার গায়ে একটুকরো কাপড়ও নেই। হাতদুটো তার অসহায়ভাবে শরীরের নিচে মোড়া। ছোট ছোট কোঁকড়ান চুলগুলি ভরে গেছে সমুদ্রের বালিতে।

'দেখেছ,' বয়স্ক যোদ্ধাটি বলে উঠল, 'লোকটা ফিনিশীয় নয়। কী বলিষ্ঠ সুন্দর শরীর। মারা গেল, বড়ই দুঃখের কথা, নইলে চমৎকার গোলাম হতে পারত আর সেনেবও আমাদের তাহলে অনেক পুরস্কার দিতেন।'

'কোন দেশের লোক?' জিজ্ঞেস করল তরুণটি।

'তা তো জানি না। তুরুশা* বা কেফ্‌তি** হবে হয়ত। হানেবু*** সমুদ্র জাতিদের কেউও হতে পারে। আমাদের এই পবিত্র দেশে হানেবু খুবই দুর্লভ। সহ্যশক্তি, গায়ের জোর আর বুদ্ধির জন্য আমাদের এখানে এদের দামও খুব। তিন বছর আগে... দাঁড়াও, দাঁড়াও, লোকটা বেঁচে আছে, জয় হক আমোনের!'

বালিতে শুয়ে থাকা দেহটা অল্প নড়ল, সে নড়া প্রায় চোখেই পড়ে না।

হাতের বর্শা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যোদ্ধা দুজন অজ্ঞান লোকটাকে চিৎ করে তার পা আর পেট মালিশ করতে লেগে গেল। তাদের চেষ্টা সফল হল, অল্প সময়ের মধ্যে অজ্ঞান লোকটি — তার মানে পান্দিওন — চোখ খুলে যন্ত্রণায় কেশে উঠল।

তার বলিষ্ঠ শরীর ভীষণ পরীক্ষা পার হয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যোদ্ধা দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে সে এগল দুর্গের দিকে।

পথে কয়েকবার থামতে হল, তবুও সবচেয়ে গরম পড়ার আগেই তারা এসে পেঁছল একটা ছোট্ট দুর্গে। বড় হ্রদটার পশ্চিমে নীলের বদ্বীপে অজস্র নদীনালার একটার পাশে দুর্গটা দাঁড়িয়ে।

পান্দিওনকে যোদ্ধারা জল আর বীয়রে ভেজান কিছু রুটি দিল, তারপর একটা ছোট্ট মাটির চালার নিচে তাকে শুইয়ে রাখল।

ভীষণ ধকল গেছে শরীরের উপর দিয়ে। তার ছাপ পান্দিওনের উপর পড়েছে। বুকে অসম্ভব ব্যথা, হৃৎস্পন্দনও অত্যন্ত দুর্বল। বন্ধ চোখের সামনে দিয়ে ছুটে চলেছে ঢেউয়ের পর ঢেউ। সেই ঘোরের মধ্যেই পান্দিওন শুনতে পেল কে যেন জাহাজের কাঠ দিয়ে তৈরী পলকা দরজাটা খুলল। পাহারাঘাঁটির ক্যাপ্‌টেন — অল্পবয়সী ছোকরা, মুখটা রুগ্ন অপ্রীতিকর, তার উপর ঝুঁকে পড়ল। পান্দিওনের পায়ের উপর চাপান জোব্বাটা সরিয়ে তার বন্দীকে ভালভাবে দেখে নিল সে। পান্দিওন

---

* তুরুশা — এত্রাস্‌কান।

** কেফ্‌তি বা কেফ্‌তিউ — ক্রীট ও তার অধিবাসীদের মিশরী নাম।

*** হানেবু — উত্তরের লোক।

ঘ‌ুণাক্ষরে বুঝতে পারেনি, ক্যাপ্‌টেন যা ফন্দী কষছে তাতে তার আরো বিপদ।

সন্তুষ্ট হয়ে ক্যাপ্‌টেন পান্দিওনকে আবার ঢেকে দিয়ে বেরিয়ে গেল চালা ছেড়ে।

‘প্রত্যেকের জন্য তামার দুটো আংটি আর এক বোতল বীয়র,’ ছাড়া ছাড়া ভাবে ক্যাপ্‌টেন বলল।

ক্যাপ্‌টেনের সামনে যোদ্ধা দুজন সবিনয়ে মাথা নিচু করেই রইল। কিন্তু পিছন থেকে এমন ভাবে চাইল যেন ভস্ম করে দেবে।

‘হে সর্বশক্তিমান শেখ্‌মেৎ, চেয়ে দেখ, এমন একটা গোলামের জন্য কী দাম পেলাম...’ ক্যাপ্‌টেন চলে যেতেই ছোকরা যোদ্ধাটি ফিসফিস করে বলে উঠল। ‘দেখে নিও সহরে পাঠিয়ে অন্তত দশটা সোনার আংটির বদলে ওকে বেচবে...’

ক্যাপ্‌টেন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ‘এই, সেন্নি!’

বয়স্ক যোদ্ধাটি জো হুজুর গোছের ভাব করে ছুটে এগিয়ে গেল।

‘লোকটার উপর নজর রেখ। ওর জন্য তুমি জিম্মাদার রইলে। রাঁধুনেকে বল ওকে ভাল খাবার দিতে। কিন্তু হুঁশিয়ার — লোকটা মস্ত যোদ্ধা। ছোট্ট নৌকোটা কাল তৈরী রেখ — বন্দীকে উপহার হিসেবে বড়বাড়িতে* পাঠিয়ে দেব। ওর বীয়রের সঙ্গে ঘুমের ঔষুধ মিশিয়ে দিতে হবে, যাতে আর কোন হাঙ্গামা না হয়।’

...ধীরে ধীরে পান্দিওন তার ভারী চোখের পাতাদুটো খুলল। এত ঘুমিয়েছে যে কোথায় আছে, কটা বাজে কিছুই তার খেয়াল নেই। আবছা আবছা কেবল মনে আছে ঝড়ের সমুদ্রে তাকে ভীষণ যুঝতে হয়েছে, তারপর কে যেন তাকে কোথায় নিয়ে গেল, শেষকালে একটা অন্ধকার চুপচাপ জায়গায় সে শুয়ে ছিল। নড়তে চেষ্টা করল, তার সর্বাঙ্গ দড়ি দিয়ে বাঁধা। বহু কষ্টে মাথা ঘুরিয়ে সে দেখতে পেল সবুজ

---

* বড়বাড়ি — মিশরের রাজা, রাজার নাম মুখে আনা বারণ। (মিশরী ভাষায় পের-ও, এর থেকেই প্রাচীন হিব্রুতে ফারাও শব্দটি এসেছে।)

নলখাগড়ার একটা দেয়াল, মাথায় তাদের তারার আকারের গুচ্ছ। উপরে আলোয় ভরা আকাশ, খুব কাছেই কোথায় যেন জলের স্রোতের আওয়াজ। ক্রমে পান্দিওনের খেয়াল হল, সে হাত পা বাঁধা অবস্থায় একটা সরু লম্বা নৌকোয় পড়ে আছে। মাথা তুলে সে দেখতে পেল লগিঠেলা মাঝিদের নগ্ন পা। লোকগুলোর সুন্দর শক্তসমর্থ শরীর। গায়ের রং তামাটে। পরনে সাদা নেংটি।

'কে তোমরা? আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ?' গলুই'এ দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে একনজর দেখার চেষ্টা করে পান্দিওন চেঁচিয়ে উঠল।

ভাল করে দাড়ি-কামান একটা লোক ঝুঁকে পড়ে তড়বড় করে কী যেন সব বকে গেল। সেই সুরেলা টান আর সোচ্চারিত স্বরবর্ণের বিদেশী ভাষা একবিন্দুও পান্দিওন বুঝতে পারল না। একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে করতে পান্দিওন প্রাণপণে বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করতে লাগল। বন্দী বেচারী ক্রমশ বুঝতে পারল, তার কথা লোকগুলোর মাথায় ঢুকবে না। কোনরকমে নৌকোটা একবার সে দুলিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই রক্ষিদলের একটা লোক তার চোখের কাছে খুলে ধরল ব্রোঞ্জের ছোরা। লোকগুলোর প্রতি, নিজের প্রতি, সারা জগতের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পান্দিওন তার প্রতিরক্ষার চেষ্টা ছেড়ে দিল। নৌকো চলতে লাগল গোলকধাঁধার মতো খালবিল জলা জায়গা পার হয়ে। নৌকো যখন একটা পাথরে বাঁধান চওড়া ঘাটে পেঁছিল সূর্য তখন দিগন্ত পার হয়ে গেছে, আকাশে চাঁদ।

পান্দিওনের পাদুটো খুলে দিয়ে রক্তচলাচলের জন্য তাড়াতাড়ি খুব দক্ষ হাতে মালিশ করে দেওয়া হল। যোদ্ধা দুটো মশাল জেবলে নিয়ে ভারী ব্রোঞ্জের দরজা লাগান একটা উঁচু মাটির দেয়ালের দিকে এগল।

পাহারাদারদের সঙ্গে যোদ্ধাদের অনেকক্ষণ তকরারের পর হঠাৎ কোথা থেকে এক ঘুমঘুম চোখ দাড়িওয়ালা লোক এসে হাজির হল। পান্দিওনের সঙ্গীদের কাছ থেকে একটা ছোট্ট পাকান জিনিস নিয়ে সে একটুকরো কালো চামড়া ফিরিয়ে দিল।

ভারী দরজাটার আংটাগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। হাতদুটো খুলে পান্দিওনকে পুরে দেওয়া হল জেলখানায়। বর্শা আর তীরধনুকে সজ্জিত পাহারাদাররা একটা বিরাট কাঠের গুঁড়ি আবার ঠেলে লাগিয়ে দিতেই পান্দিওন দেখতে পেল, সে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট্ট চৌকো ঘরে, মেঝেয় যত্রতত্র আরো সব লোকজন শুয়ে। লোকগুলো জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, থেকেই থেকেই অশান্ত ঘুমের মধ্যে গুঙিয়ে উঠছে। চারদিকে উৎকট গন্ধ। সে গন্ধ যেন দেয়াল ছুঁয়ে বেরচ্ছে। পান্দিওনের দম বন্ধ হবার জোগাড়। কোনরকমে একটা ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে সে মেঝেয় বসে পড়ল। কিছুতেই ঘুমতে পারল না। শুয়ে শুয়ে গত কয়েকদিনের কথাই ভাবতে লাগল। মন ভারী হয়ে উঠল। তার সেই নিঃসঙ্গ নিশীথ চিন্তার প্রহরগুলো এগোতে থাকল অত্যন্ত ধীর পায়ে।

পান্দিওনের মনে কেবল মুক্তির চিন্তা, কিন্তু বাঁধন কাটবার কোন উপায়ই তার মাথায় এল না। এক সম্পূর্ণ অজানা দেশের কোন গহনে সে রয়েছে, নিঃসঙ্গ নিরস্ত্র বন্দী, আশেপাশের বিরুদ্ধ লোকগুলোর ভাষা কিছুই জানা নেই। তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। এটুকু সে বুঝল, লোকগুলো তাকে মেরে ফেলতে চায় না, তাই সে অপেক্ষা করাই সাব্যস্ত করল। পরে যখন এদেশটা কিছু পরিমাণে চেনা জানা হয়ে যাবে... কিন্তু তখন কী, সেই 'পরে' তার জন্য কী আছে? ভীষণ নিঃসঙ্গতাকে জয় করার জন্য একজন সঙ্গীর অভাব সে বড়ই অনুভব করতে লাগল, আগে কখনো এমন হয়নি। অজানা দুর্জ্ঞেয় রাজ্যে অপরিচিত মারমুখো লোকদের মাঝখানে দাসত্বগ্রহণ, তার ফলে সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া — এর চেয়ে বড় দুরবস্থা মানুষের আর হতে পারে না। সে যদি একা প্রকৃতির মাঝখানে থাকত তাহলে এই নিঃসঙ্গতা অনেক সহনীয় হত — সে নিঃসঙ্গতায় মন দুর্বল না হয়ে আরো জোর পেত।

ভাগ্যের হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে পান্দিওন ডুবে গেল এক অদ্ভুত নিষ্প্রাণতা আর আলস্যে। ভোরের অপেক্ষা করতে করতে সে

উদাসীনভাবে তার দুর্ভাগ্যের সঙ্গীদের দেখতে লাগল। নানা অজানা এশীয় জাতির বন্দী সব। তার চেয়ে তাদের অবস্থা ভাল, কারণ তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে পারে, একে অন্যের দুঃখ ভাগ করে নিতে পারে, আলোচনা করতে পারে অতীত আর ভবিষ্যৎ নিয়ে। বন্দীরা সকলেই বিস্ময়ের সঙ্গে নির্বাক গ্রীকটির দিকে তাকিয়ে।

নেংটি করে পরার জন্য একটুকরো খসখসে মোটা কাপড় পাহারদাররা পান্দিওনকে ছুঁড়ে দিল। তারপর চারজন কালো লোক বড় মাটির পাত্র ভরে জল, যবের রুটি আর একজাতের কাঁচা ডাঁটা দিয়ে গেল।

কুচকুচে কালো মুখ, তাতে জ্বলছে দাঁতগুলো, চোখের সাদা আর খয়েরী লাল ঠোঁট — পান্দিওন অবাক হয়ে দেখতে লাগল। আঁচ করল এরাও ক্রীতদাস। তাদের আমুদে স্বভাব আর সদয় চেহারা দেখে সে বিস্মিত না হয়ে পারল না। সাদা দাঁত বের করে নিগ্রোরা হেসে উঠে বন্দী আর নিজেদের নিয়ে মস্করা সুরু করে দিল। কিছু কাল পর সেও কি এরকম মজা খুঁজে পাবে, স্বাধীনতা-হারান মানুষের দুঃখ যাবে ভুলে? যে ব্যথা সারাক্ষণ তার হৃদয় কুরে খাচ্ছে তা কি ক্রমে দূর হয়ে যাবে? আর তেস্‌সা? হায় ভগবান, তেস্‌সা যদি জানতে পেত সে এখন কোথায়!.. না, তেস্‌সা তা যেন কিছুতেই জানতে না পারে — সে হয় তার কাছে ফিরে যাবে, নয়ত মরবে, এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই...

একটা বিলম্বিত চীৎকারে পান্দিওনের চিন্তার জাল গেল ছিঁড়ে। সামনে চমকে উঠল চওড়া এক নদী। তার বন্দীবাস জলের একেবারে ধারেই। বড়ো এক দল বর্শাধারী যোদ্ধা বন্দীদের ঘিরে তাড়িয়ে নিয়ে গেল একটা বড় জাহাজের খোলে। জাহাজ উজান বেয়ে চলতে সুরু করল। চারপাশে কোন কিছু দেখবার সুযোগ বন্দীদের দেওয়া হল না। খোলে প্রচণ্ড গুমট। রোদে পোড়া পাটাতনের নিচে বন্দীদের শ্বাস প্রশ্বাসে আবহাওয়া দুর্গন্ধে ভরে আছে।

সন্ধ্যার দিকে ঠাণ্ডা হয়ে এল, শ্রান্ত বন্দীরা একটু চাঙা হয়ে উঠে কথাবার্তা বলতে সুরু করল। জাহাজ চলল সারারাত ধরে। সকালবেলা

বন্দীদের খাবার দেবার জন্য একবার একটুখানি জাহাজ থামান হল। তারপর আবার সেই একটানা ক্লান্তিকর যাত্রা। এই ভাবে কয়েক দিন পার হয়ে গেল। পান্দিওন তখন বিভ্রান্ত, কোন বিষয়েই তার এতটুকু আগ্রহ নেই, তাই দিনের হিসাব সে আর রাখেনি।

শেষ পর্যন্ত নৌকোর মাঝি আর যোদ্ধাদের মধ্যে প্রাণের সাড়া পাওয়া গেল, জাহাজের ডেকে শোনা গেল হাঁকডাক — দীর্ঘ যাত্রা ফুরল। বন্দীরা সারা রাত জাহাজের খোলে পড়ে রইল। সকাল বেলা পান্দিওনের কানে পেঁছিল কে যেন চীৎকার করে টেনে টেনে হুকুমজারী করছে।

সঙ্গের সৈন্যরা সামনে বর্শা উঁচিয়ে ধরে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে পড়ল ধুলোয় ভরা রোদে পোড়া চকে। বন্দীরা এক এক করে নামতেই দুজন দৈত্যের মতো যোদ্ধা তাদের পাকড়াও করল। যোদ্ধা দুজনের পাশে গাদা করা রয়েছে দড়ি। বন্দীদের হাত এমন জোরেই মুড়ে দেওয়া হল যে, তাদের কাঁধ পিছনে ঝুঁকে পড়ল, কনুই দুটো পিছনে লেগে রইল একসঙ্গে। বন্দীদের আর্তনাদ আর চীৎকারে ষণ্ডা দুটোর কোনই ভ্রূক্ষেপ নেই। অসহায় শিকারের উপর নিজেদের গায়ের জোর খাটানয় তাদের কী জাঁক।

পান্দিওনের পালা এল। সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। মাটিতে সে পা দেওয়া মাত্রই একজন যোদ্ধা তাকে চেপে ধরল। যন্ত্রণায় মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে গেল পান্দিওনের নির্জীব অসাড়তা। মুষ্টিযুদ্ধে দক্ষ পান্দিওন সঙ্গে সঙ্গেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যোদ্ধার কানের উপর বসিয়ে দিল এক মারাত্মক ঘুষি। দশাসই লোকটা বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে গেল। অন্য যোদ্ধাটি ক্ষণেকের জন্য হতভম্ব হয়ে লাফিয়ে দূরে সরে গেল।

ত্রিশজন যোদ্ধা বর্শা উঁচিয়ে ঘিরে ফেলল পান্দিওনকে।

পান্দিওনের কাছে তখন মৃত্যুই মুক্তির সামিল। লড়াই করতে করতে মৃত্যু বরণ করার আশায় সে সক্রোধে ঝাঁপ দিল সামনে... কিন্তু মিশরীদের সে চেনে না। অবাধ্য ক্রীতদাসদের বাগ মানানর কাজে তারা হাজার হাজার বছর ধরে হাত পাকিয়েছে। যোদ্ধারা সঙ্গে সঙ্গে

পান্দিওনকে পথ ছেড়ে দিয়ে তার পিছনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পড়ল। পান্দিওন পড়ে গেল বৃত্তের বাইরে। তারপর পায়ে বাড়ি মেরে পান্দিওনকে ফেলে দিয়ে অনেকে মিলে তার উপর চেপে বসল। পাঁজরার কাছে পান্দিওন অনুভব করল বর্শার ভোঁতা দিকের তীব্র আঘাত। সঙ্গে সঙ্গে তার দম বন্ধ হয়ে এল। চোখের সামনে নেচে উঠল একটা আগুনবরণ পর্দা। মুহূর্তের মধ্যে মিশরীরা তার হাতদুটো মাথার উপরে তুলে ধরে ছোট্ট খেলার নৌকোর মতো একটা কাঠের যন্ত্র পরিয়ে দিয়ে তাকে ছেড়ে দিল।

বন্দীদের তাড়াতাড়ি বেঁধে ফেলে নদী আর মাঠের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সরু পথ ধরে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল। তরুণ ভাস্কর তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছে: হাতদুটো তার পুরোপুরি মাথার উপর খাড়া করে তোলা, কব্জিদুটো কাঠের যন্ত্রে আটকান, হাড়গুলো ভেঙে যাবার জোগাড়। এই যন্ত্রটার ফলে পান্দিওন না পারে কনুই নাড়তে, না পারে হাতদুটোকে মাথার উপরে নামাতে।

পাশের এক পথ থেকে আরেক দল ক্রীতদাস এসে পান্দিওনের দলে যোগ দিল। তারপর আরো একদল। দলে এখন মোটামুটি দুশ ক্রীতদাস।

প্রত্যেকেই নিষ্ঠুরভাবে বাঁধা। অনেকের হাতে আবার পান্দিওনের মতো যন্ত্র লাগান। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ পাণ্ডুর বন্দীরা সবাই ঘামে নেয়ে উঠেছে। পান্দিওন হেঁটে চলেছে আচ্ছন্নের মতো, কোনদিকে তার কোন খেয়াল নেই।

দেশটা কিন্তু খুবই সমৃদ্ধ। ঠাণ্ডা তাজা হাওয়া। সরু রাস্তাগুলো একেবারে চুপচাপ। বিরাট সবুজ সাগরের দিকে জলের ভার মন্থর স্রোতে বয়ে নিয়ে চলেছে বিশাল নদী। তাল গাছগুলো উত্তরের মন্দ বাতাসে অল্প অল্প মাথা নাড়ছে, পাকা গমের সবুজ ক্ষেতের এখানে ওখানে আঙুর আর ফলের বাগান।

সারা দেশটাই যেন এক বিরাট বাগান, সে বাগান সযত্নে সাজিয়ে তোলা হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে।

পান্দিওনের অবশ্য তখন এদিক ওদিক তাকাবার অবস্থা নেই। যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে বড়লোকদের বাড়ির প্রাচীরের পাশ দিয়ে সে ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে। ছিমছাম হালকা দোতলা বাড়ি, স্তম্ভ বসান প্রবেশপথের উপরে সরু উঁচু জানলা। চোখধাঁধান রোদে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে ধবধবে সাদা দেয়াল। গায়ে তাদের উজ্জ্বল রঙের নানা রকম জটিল সূক্ষ্ম কারুকাজ।

হঠাৎ সামনে একটা বিরাট পাথরের গাঁথনি দেখা গেল। প্রকাণ্ড চওড়া দেয়ালগুলো তাকের মতো করে বিরাট বিরাট পাথর লাগিয়ে অদ্ভুত কৌশলে তৈরী। অন্ধকার রহস্যময় গাঁথনিটা যেন বসে আছে প্রচণ্ড ভারে পৃথিবীটাকে চেপে দিয়ে। উজ্জ্বল সবুজ বাগানের গায়ে ফুটে ওঠা বিষণ্ণ ধূসর মোটা মোটা স্তম্ভ পার হয়ে পান্দিওন হেঁটে চলল। তাল ফিগ আর অন্যান্য ফলের গাছের অন্তহীন সারি। টিলাগুলো ঘন আঙুর লতায় ঢাকা।

নদীতীরের বাগানে সহরের অন্যান্য বাড়ির মতো উজ্জ্বল রঙের নক্সা আঁকা ছিম্‌ছাম উঁচু বাড়ি। বাড়িগুলোর মুখ নদীর দিকে। তার সামনে আর চওড়া প্রবেশদ্বারের ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাস্তুলের মতো লম্বা খুঁটি, মাথায় তাদের বাঁধা ঢেউখেলান ফিতের গুচ্ছ। বিরাট প্রবেশপথের উপরে রয়েছে ধবধবে সাদা ঝুলবারান্দা। তার দুটি স্তম্ভ ধরে রেখেছে একটা নিখুঁৎ সমান ছাদ। ছাদের কার্ণিসের অলংকারে পর পর আঁকা হয়েছে উজ্জ্বল নীল আর সোনালি নক্সা। সাদা স্তম্ভের মাথায়ও রয়েছে উজ্জ্বল নীল আর সোনালি রঙের আঁকাবাঁকা রেখা।

বারান্দার পিছনটায় গালিচা আর পর্দার ছায়ায় লোকজন দেখা যাচ্ছে। পরনে তাদের দামী সূক্ষ্ম কুঁচি ফেলা কাপড়ের লম্বা ধবধবে সাদা পোষাক। ঠিক মাঝখানে রেলিং'এর উপর ঝুঁকে পড়ে একজন লোক বসে। মাথায় তার লাল আর সাদা দুটো মুকুটের বোঝা — উত্তর আর দক্ষিণ মিশর, এই দুই দেশের রাজার মুকুট।

যোদ্ধারা আর তাদের সর্দার — লোকটা এতক্ষণ খুব একটা কেউকেটা ভাব করে সবায়ের আগে হাঁটছিল — সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে

মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মূর্ত দেবতা, তা-কেমের সর্বোচ্চ শাসক ফারাও'র হাতের ইশারায় বন্দীদের এক এক করে ধীরে ধীরে মার্চ করিয়ে আনা হল বারান্দার সামনে। বারান্দায় ভীড় করে দাঁড়ান সভাসদরা নিচু স্বরে কথাবার্তা হাসাহাসি সুরু করল। প্রাসাদের সৌন্দর্য, ফারাও আর তাঁর সভাসদদের চেহারা, দামী পোষাক আর অহঙ্কারী স্বাধীন সহজ স্বাভাবিক হাবভাবের সঙ্গে যন্ত্রণাক্লিষ্ট বন্দীদের পার্থক্যটা এতই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যে পান্দিওনের ভীষণ রাগ হল। হাতের ব্যথায় পান্দিওনের তখন আর কোন খেয়াল নেই, সারা শরীর তার কাঁপছে যেন পালাজ্বর হয়েছে, নিজের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত কাটা ঠোঁটটায় লেগে আছে শুকনো রক্ত, কিন্তু তবু সে মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর মুখ ঘুরিয়ে ঝুলবারান্দার দিকে হানল একটা ঘৃণার দৃষ্টি।

ফারাও সভাসদদের দিকে ফিরে কী যেন বললেন, তারাও সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিল। বন্দীদের শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে এগোতে থাকল। কিছুক্ষণ পরেই পান্দিওন দেখল, বাড়ির পিছনে একটা উঁচু প্রাচীরের ছায়ায় সে এসে পড়েছে। একে একে বন্দীরা সবাই সেখানে এসে জুটল। মুখ-বুজে থাকা যোদ্ধারা তখনো তাদের ঘিরে আছে। হঠাৎ একটা কোন থেকে একজন মোটা টিয়াপাখিনাক লোক এগিয়ে এল। হাতে তার লম্বা আব্লুস কাঠের দণ্ড, তাতে সোনার কাজ। লোকটির সঙ্গে কাঠের ফলক আর পাকান প্যাপিরাসের তাড়া নিয়ে একজন কেরাণী।

লোকটা যোদ্ধাদের সর্দারকে ভারিক্কি চালে কী যেন বলল। সর্দার সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিচু হয়ে মাথা নুইয়ে আদেশটা জানিয়ে দিল যোদ্ধাদের। সেই অভিজাতসুলভ অঙ্গুলিহেলনোর সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধারা বন্দীদের কাছে গিয়ে নিয়ে এল নির্দিষ্ট বন্দীদের। পান্দিওন ছিল সেই প্রথম দলে। সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও সাহসী চেহারার ত্রিশ জনকে বাছাই করে নিয়ে যাওয়া হল বাগানের প্রান্তে সেই সরু পথটা দিয়ে, তারপর একটা নিচু প্রাচীরের পাশ দিয়ে। পথটা ক্রমশ খাড়া হয়ে গম খেতের

মাঝখানে একটা জানলাহীন দেয়ালে ঘেরা চকে এসে পড়েছে। প্রায় দশ হাত উঁচু কাঁচা ইঁটের দেয়ালের উপর দিয়ে যোদ্ধারা তীরধনুক নিয়ে চলা ফেরা করছে। কোণে মাদুরের ছাউনি।

ঢোকার দরজাটা নদীর দিকে। তাছাড়া আর কোথাও কোন দরজা জানলা নেই। ফাঁকা ধূসর-সবুজ দেয়ালগুলো আগুনের মতো তেতে উঠেছে।

বন্দীদের ভিতরে ঢুকিয়ে যোদ্ধারা তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। দুটো দেয়ালের মাঝখানে একটা সরু উঠোনে পান্দিওন এসে পড়ল। ভিতরের দেয়ালটা বাইরেরটার তুলনায় বেঁটে। একটিমাত্র দরজা ডান দিকে। উঠোনের ফাঁকা অংশে যেমন তেমন করে তৈরী বেঞ্চি। এক ভাগ জুড়ে একটা নিচু দালান। প্রবেশপথটা কালো গর্তের মতো। বন্দীদের পাহারার জন্য এবার যে যোদ্ধারা দেখা দিল তারা আগের দলের মতো অত কালো নয়। সবাই ছিপছিপে লম্বা, সুগঠিত দেহ। অনেকেরই আবার নীল চোখ, লালচে চুল। আইগিপ্তসের প্রকৃত অধিবাসীদের মতো এদেরও পান্দিওন আগে কখনো দেখেনি। সে জানত না, এরা লিবিয়ার অধিবাসী।

দুজন লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। একজনের হাতে পালিশ করা কাঠের তৈরী একটা কিছু, অন্য জনের হাতে একটা ছাইরঙা চীনামাটির পাত্র। যোদ্ধারা পান্দিওনকে ধরে তাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দিল। বাঁ কাঁধের কাছে পান্দিওন সামান্য কাঁটার খোঁচা অনুভব করল — ছোট ছোট কাঁটা লাগান একটা পালিশ করা কাঠের পাটা তার পিঠে বসান হয়েছে তারপর একজন লোক হঠাৎ পাটার উপরে এক ঘুঁষি কসিয়ে দিল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরল সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল পান্দিওন। রক্তটা মুছে ফেলে মাটির পাত্রের জলীয় পদার্থে একটা নেকড়া ডুবিয়ে যোদ্ধাটি ক্ষতস্থানে লাগাল। রক্তপাত থেমে গেল, তবু লোকটি আরো কয়েকবার নেকড়া ভিজিয়ে আহত জায়গায় ঘষে দিল। পান্দিওনের তখন খেয়াল হল, যে যোদ্ধারা তাকে ঘিরে রয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই বাঁ কাঁধে একটা চকচকে লাল মার্কা — ডিমের আকারের বেড় দেওয়া একটা জায়গায় কতগুলো ছোট ছোট মূর্তি।*

* ফারাওয়ের নামের চিত্রলিপি ডিম্বাকার বেড়ের মধ্যে লেখা থাকত।

পান্দিওনের কব্জি থেকে কাঠের পাটাটা খুলে নেওয়া হল। গাঁটের ব্যথায় চীৎকার না করে সে পারল না। বহুকষ্টে হাতদুটো নামাল। তারপর মাথা নুয়ে ভিতরের দেয়ালের দরজা দিয়ে একটা ধুলো ভরা উঠোনে ঢুকে ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ল।

দরজার কাছের বিরাট জালাটা থেকে কিছুটা পানসে জল খেয়ে পান্দিওন চারদিকটা পরীক্ষা করে দেখল। কর্তাদের মতানুযায়ী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে এইখানেই থাকতে হবে।

প্রত্যেক দিকে আনুমানিক দুস্টেডিয়া লম্বা বিরাট চকটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের উপরে পাহারাদার। ডানদিকের সমস্তটা জুড়ে গায়ে গায়ে লাগান ছোট ছোট মাটির কুঠরি। ঘরের সারির মাঝে মাঝে সরু লম্বা পথ। বাঁদিকের কোণেও একই ধরনের ছোট কুঠরি। নিচু দেয়ালে ঘেরা সামনের বাঁ কোণ থেকে ভেসে আসছে এমোনিয়ার তীব্র গন্ধ। দরজার কাছেই জলের পাত্র। এখানে লম্বা কিছুটা জায়গা মাটি লেপে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। পরে পান্দিওন জেনেছিল এটাই খাবার জায়গা।

চকের সমস্ত ফাঁকা জায়গাটা ভাল করে পিটে সমান করা। তার ধূসর বুকে এক টুকরো ঘাসও দেখা যায় না। ভীষণ গুমট, এতটুকু বাতাস নেই। মনে হচ্ছে দেয়াল দিয়ে ঘেরা, খোলা আকাশের নিচের ঐ নিচু চকেই দিনের যত উত্তাপ ঢেলে দেওয়া হয়েছে। এই হল 'শেনে,' শ্রমিকদের বাড়ি। তা-কেমের রাজত্বে নানাখানে এরকম শত শত শেনে ছড়িয়ে আছে। সব জাতের ক্রীতদাসের ভীড় শেনেতে। আইগিপ্তসের ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্যের ভিত্তি গড়ে তুলেছে এদের শ্রমশক্তি। চত্বরটা তখন শান্ত, জনশূন্য — ক্রীতদাসরা সবাই কাজে বেরিয়ে গেছে, কেবল কয়েক জন অসুস্থ লোক প্রাচীরের ছায়ায় উদাসীনভাবে শুয়ে আছে। এই বিশেষ শেনেটি নবাগত যে সব বন্দী সদ্য সদ্য দাসত্বের শিকল পরেছে তাদের জন্যই। কালো রাজ্যের মেহনতীজনদের সংখ্যা বাড়ানর জন্য এরা এখনো বিয়ে থাওয়া করে বসবাস সুরু করেনি।

পান্দিওন এখন 'মেরে', অর্থাৎ বংশপরম্পরায় ফারাওয়ের ক্রীতদাস। বাগান, খাল আর প্রাসাদ প্রভৃতি দালানের কাজে যে আট হাজার ক্রীতদাস নিযুক্ত আছে তাদেরই একজন।

পান্দিওনের সঙ্গে অন্য যাদের রাজদরবারে ডাক পড়েছিল 'সাহু' হিসেবে তাদের সবাইকে বড় বড় রাজকর্মচারীদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়েছে। প্রভুর মৃত্যুর পর তারা ফারাওয়ের শেনে চালু হবে।

গুমট শেনের ভিতরে এক অস্বস্তিকর নীরবতা। মাঝে মাঝে কেবল শোনা যাচ্ছে পান্দিওনের সঙ্গে আসা নতুন ক্রীতদাসদের দীর্ঘনিঃশ্বাস আর গোঙানি। পিঠের সেই মার্কামারার ক্ষতটা জ্বলন্ত কয়লার মতো জ্বলছে। পান্দিওন নিজের জন্য কোন জায়গা খুঁজে পেল না। দেশের খোলামেলা সমুদ্র আর ঢেউয়ে ধোয়া তীরের ছায়াঢাকা কুঞ্জের বদলে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ধুলোয় ভরা এক ফালি মাটি। প্রিয়ার সঙ্গে স্বাধীন জীবনের বদলে যা কিছু তার আপন আর প্রিয় সে সব ছাড়া বহুদূরের এই বিদেশে দাসত্ব।

তবু মনে এখনো স্বাধীনতার আশা আছে বলেই তরুণ পান্দিওন বাইরের সুন্দর বিরাট জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা এই দেয়ালে মাথা ঠুকে মরেনি।

ফারাওর ক্রীতদাস

এনিয়াদার উপকূলে আবার বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতি বছরের মতো পাহাড়ে ঢালুর গায়ের ঝোপঝাড় ফুলে ফেটে পড়ল। পাহাড়ের গা ঢাকা পড়ল আগুনবরণ গালিচায়। ধনুর* উজ্জ্বল তারাগুলো আবার তাড়াতাড়ি অস্ত যেতে সুরু করেছে, নিয়মিত পশ্চিমী বাতাস ডেকে

* ধনু আগে ডুবতে সুরু করা মানে শীতের ঝড়ের সমাপ্তি, এই ছিল সেকালে বিশ্বাস।

আনছে সমুদ্রযাত্রার কাল। বসন্তের গোড়াতেই ক্রীটের পথে রওনা হয়ে পাঁচটা জাহাজ এসে পেঁৗছেছে কালিদনে। তাদের পরে দুটো ক্রীটের জাহাজও। কিন্তু তার একটাতেও পান্দিওন নেই।

আগেনর থেকে থেকেই গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবতে থাকেন। কিন্তু তবু মনের ভয়টা তেস্‌সা আর তার মায়ের কাছে প্রকাশ না করার চেষ্টা করেন।

ক্রীটের বিরাট দ্বীপে পাহাড়ের কোথায় হারিয়ে গেছে নিঃসঙ্গ পথিক। ক্রীটের অত লোকজন, তাদের ভাষাও পান্দিওনের জানা নেই।

বৃদ্ধ শিল্পী ঠিক করলেন, কালিদনে গিয়ে দেখবেন যদি ক্রীটে যাবার কোন সুযোগ মেলে। পান্দিওনের কী হল সেটা একবার নিজে গিয়ে দেখে আসা তাঁর ইচ্ছে।

তেস্‌সা আজকাল একা একা ঘুরে বেড়ায়। বাবামার নীরব সহানুভূতিও তার কাছে ঠেকে বোঝার মতো।

গভীর দুঃখে তেস্‌সা দাঁড়িয়ে থাকে শান্ত সদা আন্দোলিত সমুদ্র তীরে। মাঝে মাঝে সেখানে ছুটে যায় এই আশায় যে, পান্দিওন নিশ্চয় ফিরে আসবে তাদের বিদায়ের জায়গায়।

কিন্তু সেই আশাভরা প্রতীক্ষার দিন ফুরিয়েছে অনেক আগে। তেস্‌সা বুঝতে পারল, সমুদ্র আর আকাশ যেখানে আলাদা হয়েছে তার অনেক ওপারের দেশে কিছু একটা বিপদ ঘটেছে। হয় মৃত্যু নয়ত দাসত্বের ফলেই পান্দিওন ফিরছে না।

ছুটে আসা ঢেউগুলোকে তেস্‌সা অনুনয়বিনয় করে বলে — বল, পান্দিওনের কী হয়েছে। হয়ত পান্দিওনের দেশ থেকেই তারা ছুটে আসছে। মনে হয় একটুখানি দাঁড়ালেই ঢেউরা ইঙ্গিতে জানিয়ে দেবে পান্দিওনের কথা।

কিন্তু সমুদ্র তার পায়ের কাছে যে ঢেউগুলো ছুঁড়ে দেয় তারা সবাই সমান। তাদের ছন্দে-বাঁধা শব্দ তাদের নীরবতার মতোই মূক।

ভালবাসার জনের খবর কী করে জানা যায়? তেস্‌সা মেয়েমানুষ, আপনজনের সঙ্গে ঘর বাঁধাই তো তার জীবনের লক্ষ্য, স্বামীর ঘরের গৃহিণী আর রক্ষাকর্ত্রী তো তাকেই হতে হবে। সেই তো স্বামীর পথের

সঙ্গী, তার ব্যথার দরদী। পান্দিওন আর তার মাঝখানের এই দূরত্ব সে কী করে পার হবে? পুরুষের অবাধ্য হয় যে মেয়ে — সে পুরুষ বাবা, স্বামী বা ভাই যাই হোক না কেন — তার সহরে বা বন্দরে গিয়ে গিটেরা হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তেস্‌সা মেয়েমানুষ — তার পক্ষে বিদেশে যাওয়া সম্ভব নয়, পান্দিওনের অনুসন্ধানের চেষ্টাও তার ক্ষমতার বাইরে।

বিরাট সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়ান ছাড়া তেস্‌সার আর কিছুই করার নেই। সে একেবারেই অসহায়, নিরুপায়!

পান্দিওন যদি মারাও যায় তাহলেও সে কিছুই জানতে পারবে না।

রুপোলি-নীল চাঁদের আলোর বন্যায় সারা উপত্যকা প্লাবিত। গভীর খাড়া খাদের কালো ছায়ায় বেষ্টিত সে আলো ছুটে যায় নদীর বুকে, তার ধারা অনুযায়ী — দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

আইগিপ্‌তসের রাজধানী নুৎ-আমোন বা উয়াসেতের কাছাকাছি ক্রীতদাসদের শেনের দেয়ালঘেরা চত্বরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন।

আলোয় উজ্জ্বল দেয়ালটার রুক্ষ গায়ে একটা নিষ্প্রভ প্রতিফলন।

ছোট্ট কুঠরিতে কয়েক আঁটি কুটকুটে ঘাসের উপর পান্দিওন শুয়ে ছিল। ইঁদুরের গর্তের মতো ছোট্ট দরজাটা দিয়ে সে সাবধানে মাথা বের করল। পাহারাওয়ালা দেখে ফেলতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে অন্ধকার দেয়ালের উপরে আকাশের উঁচুতে ভাসমান ম্লান চাঁদটা দুচোখ ভরে দেখল। দূর এনিয়াদায়ও এখন এই একই চাঁদের জ্যোৎস্না — পান্দিওনের মন আরো খারাপ হয়ে গেল এই চিন্তায়। হয়ত তেস্‌সা, তার তেস্‌সা এখন হেকেটিকে জিজ্ঞেস করছে তার কথা। সে ভাবতেও পারছে না, পান্দিওনের চোখদুটোও তার পায়রার খোপ থেকে আকাশের ঐ রুপোলি থালাটার দিকেই তাকিয়ে। উত্তপ্ত মাটির ধুলোর গন্ধে ভরা তার কুঠরিতে ফের মাথাটা ঢুকিয়ে পান্দিওন মুখ ফিরিয়ে থাকে দেওয়ালে।

প্রথম দিনের বিক্ষুব্ধ হতাশা, ভীষণ দুঃখ অনেক দিন হল পার হয়ে গেছে। পান্দিওনের অনেক বদল হয়েছে। তার ঘন টানা ভুরু সব সময় কুঁচকেই আছে। হিপেরিয়নের বংশধরের সোনালি চোখ ভিতরের চাপা রাগের আগুনে ঘোলাটে হয়ে উঠেছে, ঠোঁটদুটো সব সময়েই চাপা।

তার বলিষ্ঠ শরীরে অবশ্য তখনো অফুরন্ত শক্তি, উজ্জ্বল বুদ্ধিরও এতটুকু বিচ্যুতি ঘটেনি। পান্দিওন তখনো একেবারে নিরুদ্যম হতাশ হয়নি, হারায়নি স্বাধীনতার স্বপ্ন।

তরুণ ভাস্কর ক্রমশ বীর যোদ্ধা হয়ে উঠছে। শত্রুর কাছে সে এখন যে ভয়াবহ তার কারণ শুধু তার সাহস শক্তি আর অসীম দৃঢ়তাই নয়। সবরকম দুঃখ কষ্টের মধ্যে, এই নরকতুল্য পরিবেশে তার মনটাকে বাঁচিয়ে রাখার উৎসাহ, তার স্বপ্ন আর প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসও তার একটা কারণ। ভাষা আর দেশের সঙ্গে অপরিচিত একলা মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব, বিরাট রাষ্ট্রের হাজার হাজার বৎসরে স্থাপিত অত্যাচারের প্রতিকার করা, তাও এখন সম্ভব হয়েছে — পান্দিওন সঙ্গী পেয়েছে। সঙ্গী! দূর বিদেশে দুর্ধর্ষ দুর্জয় শক্তির সামনে যাকে একা দাঁড়াতে হয়েছে সেই কেবল ঐ কথাটির পুরো মর্ম বুঝতে পারে। সঙ্গী হচ্ছে সহায় সহানুভূতি আশ্রয়, সমচিন্তা আর সমস্বপ্ন, উপদেশ পরামর্শ, প্রয়োজনীয় ভর্ৎসনা সমর্থন ভরসা। রাজধানী অঞ্চলে সাত মাস কাজ করতে করতে আইগিপ্তসের অদ্ভুত ভাষা পান্দিওন কিছু কিছু শিখেছে, অন্যান্য ক্রীতদাসদের নানা ভাষা ভালোভাবে বুঝতে সুরু করেছে।

শেনে বন্দী যে পাঁচশ ক্রীতদাসকে রোজ কাজ করতে নিয়ে যাওয়া হয় — তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লোককে পান্দিওন বেশি করে বেছে নিতে সুরু করেছে।

ক্রীতদাসরাও ক্রমশ একে অন্যকে বিশ্বাস করতে শিখেছে। পান্দিওনের সঙ্গেও তাদের বন্ধুত্ব হয়েছে।

সাধারণ ভীষণ দুঃখকষ্টে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় লোকে সম্মিলিত হয়েছে। তাদের সকলেরই বাসনা — কালো রাজ্যের অন্ধ উৎপীড়নের

বিরুদ্ধে লড়াই করে বহুদিন আগে হারান মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়া। বাড়ি — এ কথার মর্ম প্রত্যেকেই জানে, যদিও কারো কাছে বাড়ি মানে দক্ষিণের রহস্যময় জলাভূমি, কারো বা পূব আর পশ্চিমের বালির সমুদ্রের ওপার, কারো বা, যেমন পান্দিওনের, উত্তরে, সমুদ্রের অপর তীর।

লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হবার মতো শক্তি শেনের খুব কম লোকেরই আছে। অন্যেরা ভীষণ খাটুনি আর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের ফলে নির্জীব, ক্রমশই নিঃশব্দে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তারা অবশ্য অধিকাংশই বয়স্কদের দল। চারপাশের জীবনে তাদের নেই কোনই উৎসাহ, নিষ্প্রভ চোখে নেই দৃঢ়তার দীপ্তি, সঙ্গীদের সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎকারে তারা নিরুৎসাহ। তারা কেবল কাজ করে, ধীরে ধীরে খায়, তারপর কঠিন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সকালবেলা পাহারাদারদের হাঁকে শিউরে উঠে কোনরকমে ধুঁকতে ধুঁকতে উদাসীনভাবে চলতে থাকে।

শেনেতে এতগুলো আলাদা আলাদা কুঠরির রহস্যটা পান্দিওন কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারল। সবাইকে পৃথক করে রাখার জন্যই এগুলির সৃষ্টি। রাত্রের খাবার পর কারো সঙ্গে কথা বলা বারণ। দেয়ালের উপর দাঁড়ান সান্ত্রীরা কড়া নজর রাখে চত্বরের উপর — নিষেধ না মানলেই পরদিন সকালে অপরাধীকে হয় লাঠির বাড়ি নয়ত তীরের খোঁচা খেতে হয়। অন্ধকারে লুকিয়ে অন্যের কুঠরিতে গুঁড়ি মেরে যাবার মতো জোর আর সাহস সবার নেই। কেউ কেউ অবশ্য তাও করত।

পান্দিওনের সবচেয়ে নিকট বন্ধু তিনজন। প্রথম জন হল কিদগো, প্রকাণ্ড এক নিগ্রো। প্রায় চার হাত লম্বা। আইগিপ্তসের দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় অনেক দূরে তার বাড়ি। ফুর্তিবাজ সদা উৎসাহী সহৃদয় এই লোকটির আঁকায় আর মূর্তিগড়াতেও বেশ হাত আছে। তার চওড়া নাক, পুরু ঠোঁট, বুদ্ধিবৃত্তি আর প্রাণশক্তি প্রকাশব্যঞ্জক মুখ দেখামাত্রই পান্দিওন আকৃষ্ট হয়েছিল। সুগঠিত শরীর নিগ্রো দেখে পান্দিওন অভ্যস্ত, কিন্তু প্রকাণ্ড এই লোকটির সুন্দর সুষম শরীর ভাস্করের চোখকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করল। কিদগোর

ছিপছিপে সর্পিল শরীরের সঙ্গে তার লোহাপেটা মাংসপেশীগুলো খুবই মানিয়েছে। কালো মুখের পটভূমিকায় তার বড় বড় চোখদুটো সব সময় আগ্রহ আর ঔৎসুক্যে ভরা।

প্রথমে পান্দিওন আর কিদগো ছুঁচলো কাঠি দিয়ে মাটিতে বা দেয়ালে ছবি এঁকে এঁকে নিজেদের মধ্যে আলাপ করত। তারপর পান্দিওন কিদগোর সহজ সরল ভাষার সঙ্গে কেম্‌তের ভাষা মিশিয়ে অনায়াসে কথা বলতে সুরু করল।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রে কিদগো আর পান্দিওন এ ওর কুঠরিতে গুঁড়ি মেরে গিয়ে ফিসফিস করে পালানর পরিকল্পনায় নতুন সাহস আর শক্তি সঞ্চয় করে।

এই ভাবে একমাস কেটে যাবার পর পান্দিওনদের শেনেতে এক দল নতুন ক্রীতদাস চালান হল।

নতুন বন্দীরা দরজার কাছে বসে বসে বা শুয়ে শুয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। তাদের যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে ক্রীতদাস মাত্রেরই পরিচিত গভীর দুঃখ আর হতাশার ছাপ। সন্ধ্যাবেলায় কাজ থেকে ফিরে এসে পান্দিওন জল খাবার জন্য বড় জালাগুলোর দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ হাত থেকে তার পাত্রটা পড়ে যাবার জোগাড়। নবাগতদের মধ্যে দুজন চাপা গলায় আলাপ করছিল এত্রাস্‌কান ভাষায়। সে ভাষা পান্দিওনের পরিচিত। এত্রাস্‌কানরা প্রাচীন জাতি। রুক্ষ বিচিত্র স্বভাব। এনিয়াদায় তারা প্রায়ই আসত। সেখানে তাদের সবাই যাদুকর বলে জানে, প্রকৃতির সব রহস্যই নাকি তাদের জানা।

দেশের কথা মনে পড়ায় পান্দিওন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল, সারা শরীর কেঁপে উঠল। এত্রাস্‌কানদের সঙ্গে কথা বলতে লোকদুটি তার কথা ঠিকই বুঝতে পারল।

মিশরীদের হাতে তারা কী ভাবে বন্দী হল, সে কথা জিজ্ঞেস করতে লোকদুটি চুপ করে রইল, কোন উত্তর দিল না, যেন পান্দিওনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তারা এতটুকুও খুসি নয়। এত্রাস্‌কান লোকদুটি মাঝারি লম্বা, কাঁধ চওড়া, শক্তিশালী মাংসপেশী। ঘন চুলগুলো ধুলো

বালি নোংরায় মুখের দুধারে জট পাকিয়ে ঝুলে ঝুলে আছে। একজন বছর চল্লিশেকের হবে। দ্বিতীয় জন প্রায় পান্দিওনেরই বয়সী।

দুজনের চেহারাটা অনেকটা একই রকমের — বসা গালের হাড়দুটো উঁচু, কঠোর বাদামী চোখদুটোর দীপ্তিতে একটা প্রবল দৃঢ় একরোখা ভাব।

লোকদুটোর উদাসীনতায় অবাক ও অপমানিত হয়ে পান্দিওন নিজের কুঠরিতে চলে গেল। তারপর কয়েকদিন সে ইচ্ছা করেই লোকদুটোর দিকে আর কোন নজর দেয়নি। কিন্তু লোকদুটো যে সব সময় তার উপর নজর রাখছে তা সে দেখতে পেয়েছিল।

এত্রাস্কানরা আসার দিন দশেক পরে পান্দিওন আর কিদগো একদিন রাত্রে পাশাপাশি বসে প্যাপিরাসের ডাঁটা নিয়ে খেতে বসেছে। দুজনে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করেই গল্প করতে সুরু করল, অন্যেরা তখনো খেয়ে চলেছে। পান্দিওনের অন্য পাশে বসেছিল বয়স্ক এত্রাস্কানটি। হঠাৎ লোকটি পান্দিওনের কাঁধের উপর মোটা হাতটা রাখল। পান্দিওন ফিরে চাইতেই লোকটি তার দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকাল।

'ভালো সাথী না হলে মুক্তি কখনো পাবে না,' যুদ্ধং দেহি ভাব করে বলল লোকটি। পাহারাদাররা তার ভাষা বুঝতে পারবে সে ভয় তার নেই, কারণ তা-কেমের লোকেরা বন্দী ক্রীতদাসদের ভাষা জানে না, বিদেশীদের তারা ঘৃণা করে।

এত্রাস্কানটির কথার প্রকৃত মর্ম বুঝতে না পেরে পান্দিওন অধীরভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। এত্রাস্কানটি কিন্তু তার কাঁধ জোরে চেপে রেখেছে, পান্দিওনের মাংসপেশীর উপর তার আঙুলগুলো ব্রোঞ্জের নখের মতো বসে গেছে।

'তুমি ওদের ঘৃণা কর, সেটা কিন্তু অন্যায়,' খেতে ব্যস্ত অন্যান্য ক্রীতদাসদের মাথা নেড়ে দেখিয়ে এত্রাস্কানটি বলল। 'ওরা তোমার চেয়ে কোন অংশেই হীন নয়। মুক্তির স্বপ্ন ওরাও দেখে ...'

'ওরা অপদার্থ,' গোঁয়ারের মতো বলে উঠল পান্দিওন। 'ওরা এখানে কতদিন হল রয়েছে, কিন্তু একবারও তো কেউ পালাতে চেষ্টা করেছে বলে শুনিনি!'

এত্রাস্‌কানটি তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট চেপে রেখে বলল:

'ছেলেছোকরাদের যথেষ্ট বুদ্ধি না থাকলে প্রবীণদের কাছ থেকে শেখা উচিত। তুমি বেশ শক্তসমর্থ, স্বাস্থ্যটাও ভাল। সারা দিনের প্রচণ্ড পরিশ্রমের পরেও তাগদ বজায় রাখ। খাবারের অভাবে তোমার শক্তি কমেনি। অথচ ওরা ওদের বল খুইয়েছে — ওদের সঙ্গে তোমার ঐটুকুই কেবল তফাৎ। সেটা তোমার সৌভাগ্য। কিন্তু মনে রেখ, এখান থেকে একা তুমি পালাতে পারবে না: রাস্তা জানতে হবে, জোর করে রাস্তা করে নিতে হবে। আর আমাদের একমাত্র শক্তি হল সবার মিলিত শক্তি। তুমি যখন ওদের সবার সত্যিকার সাথী হবে তখনই তোমার স্বপ্ন সত্য হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে ...'

এত্রাস্‌কানটির সেয়ানা বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে পান্দিওন বিস্মিত হল। লোকটি তার মনের সবচেয়ে গোপন কথাটাই ধরে ফেলেছে। তার কথার কোন উত্তর দিতে না পেরে পান্দিওন মাথা নিচু করে রইল।

'কী বলছে ও? কী বলছে?' কিদগো জিজ্ঞেস করল বারবার।

পান্দিওন বুঝিয়ে বলতে যাবে এমন সময় তাদের তদারকীর জিম্মাদার লোকটি মেঝে ঠুকল। ক্রীতদাসদের খাওয়া হয়ে গেলে তারা অন্য দলের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিজের নিজের কুঠরিতে ঘুমতে চলে গেল।

রাত্রে পান্দিওন আর কিদগো অনেকক্ষণ এত্রাস্‌কানটির কথা নিয়ে আলোচনা করল। আগন্তুক লোকটি যে ক্রীতদাসদের অবস্থাটা অন্য যে কারো চেয়েই অনেক ভাল বোঝে তা তাদের মানতেই হল। সত্যি, ফারাওয়ের মার্কা যাদের পিঠে পড়েছে তাদের পালাতে হলে দেশের পথঘাট জেনে নেওয়া চাই। সেটুকুই সব নয়: প্রতিকূল লোকজনের সঙ্গে তাদের লড়তেও হবে, কারণ মিশরীদের বিশ্বাস, ভগবানের নির্বাচিত লোকদের কাজ করার জন্যই 'জংলীদের' জন্ম।

এ ব্যাপারে দুই বন্ধু হতাশ বোধ করল, কিন্তু এই বুদ্ধিমান এত্রাস্‌কানটির উপর তাদের কেমন যেন একটা আস্থা এল।

আরো কয়েক দিন পার হল। ফারাওয়ের শেনেতে এখন চারজন বন্ধু। অন্য ক্রীতদাসদের উপর ক্রমশ তাদের প্রতিপত্তিও দেখা গেল।

বয়স্ক এত্রাস্কানটিকে ক্রীতদাসদের অনেকে তাদের সর্দার বলে মনে করতে সুরু করল। লোকটির নামটি আবার ভয়াবহ — কাভি, তার মানে মৃত্যুর দেবতা। চার বন্ধুর অন্য তিনজন হচ্ছে অপর এত্রাস্কান লোকটি — নাম রেম্দ্, কিদগো আর পান্দিওন। তিনজনেই শক্তিশালী কষ্টসহিষ্ণু আর সাহসী। এরা কাভির সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহকারী হয়ে উঠল।

ক্রমশ পাঁচশ ক্রীতদাসের মধ্যে আরো অনেক যোদ্ধা দেখা দিল, যারা দেশে ফেরার ক্ষীণ আশায় নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে রাজী। ধীরে ধীরে অন্যান্য সব ভীরু উৎপীড়িত ক্ষীণপ্রাণ ক্রীতদাসরাও নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠল। সবাই একসঙ্গে মিলিত হলে বিরাট রাষ্ট্রের সুসংগঠিত শক্তিকেও হার মানান যেতে পারে, এই আশা তাদের মনে জেগে উঠল।

কিন্তু দিন চলে যায়। বন্দী জীবনের লক্ষ্যহীন তিক্ত শূন্য দিন। একঘেয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি। কড়া মনিবদের সুখ সমৃদ্ধির জন্য হাজার হাজার মানুষ খাটছে, শুধু এই কারণেও এই জীবন ক্রীতদাসদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য। প্রতি দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে হৃতপ্রাণ লোকেরা সশস্ত্র যোদ্ধাদের পাহারায় শেনে ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় যায় কাজ করতে।

আইগিপ্তসের লোকেরা বিদেশীমাত্রকেই ঘৃণা করে। বন্দীদের ভাষা শেখার জন্য তাদের এতটুকুও উৎসাহ নেই। এই কারণে নতুন বন্দীদের প্রথমে খুব সাধারণ কাজে লাগান হয়; ক্রীতদাসরা কেম্তের ভাষা শিখলে পর তাদের আরো জটিল কাজে লাগান হয়, শিখতে হয় শিল্প। পরিদর্শকরা ক্রীতদাসদের নাম নিয়ে মাথা ঘামায় না, প্রত্যেককে তাদের জাতি অনুসারেই ডাকে। তাই পান্দিওনকে তারা ডাকে একুয়েশা বলে — ঈজীয় সাগর অঞ্চলবর্তী রাজ্যের অধিবাসীদের মিশরী নাম, — এত্রাস্কানদের বলে তুরুশা, কিদগো আর অন্য সব কালো লোকদের নেহ্সি — নিগ্রো।

প্রথম দুমাস পান্দিওন আর আরো চল্লিশজন নতুন ক্রীতদাস আমোন উদ্যানের* খাল সারাইয়ের কাজ করে, আগের বছরের বন্যায় ধুয়ে যাওয়া বাঁধ ফিরে তৈরী করে, ফলগাছের মাটি কোপায়, জল তোলে, ফুলের কেয়ারিতে জল দেয়।

নবাগতদের কষ্টসহিষ্ণুতা শক্তি আর বুদ্ধি দেখে পরিদর্শকরা ক্রমশ বাড়ি তৈরীর কাজের একটা নতুন দল তৈরী করল। ঘটনাক্রমে পান্দিওনরা চার বন্ধু আর আরও তিরিশজন পালোয়ান ক্রীতদাস একই দলে রয়ে গেল। শেনের ক্রীতদাসদের পাণ্ডা ছিল এরাই। বাড়ি তৈরীর কাজে এদের চালান করার ফলে অন্যান্য ক্রীতদাসদের সঙ্গে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিন্ন হল। কারণ এ কাজে তাদের পরপর কয়েক সপ্তাহ শেনের বাইরে কাটাতে হত।

ফারাও'র বাগান ছেড়ে পান্দিওন প্রথম পেয়েছিল একটি পুরোন মন্দির আর সমাধি ভেঙ্গে ফেলার কাজ। মন্দির আর সমাধি ছিল নদীর পশ্চিম তীরে, শেনে থেকে পঞ্চাশ স্টেডিয়া দূরে। ক্রীতদাসদের নৌকো বোঝাই করে নদী পার করান হত। সঙ্গে থাকত একজন পরিদর্শক আর পাঁচজন যোদ্ধা। তারপর তাদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত উত্তরে বিরাট খাঁজের মতো এক খাড়া পাহাড়ের ধারে। চষা ক্ষেত পেরিয়ে পথটা পড়েছে একটা পাকা রাস্তায়। এ পথে চলতে চলতে পান্দিওন হঠাৎ যে দৃশ্য দেখে তা তার স্মৃতিতে চিরদিনের মতো মুদ্রিত হয়ে যায়। নদীর উপর ঢালু হয়ে নেমে আসা বিরাট এক খোলা মাঠে ক্রীতদাসদের বসিয়ে রেখে পরিদর্শক চলে যায় এই বলে যে, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে।

সেই সময়ই প্রথম পান্দিওন ধীরেসুস্থে চারদিকটা দেখে নেবার সুযোগ পায়।

তার ঠিক সামনেই খাড়া উঠে গেছে তামাটে রঙের এক পাহাড়ের দেয়াল। তিনশ ফুট উঁচু, গায়ে তার নীল কালো ছায়ার ফোঁটা।

---

* লুক্সরের নিকটবর্তী কার্নাকের একটি মন্দির।

পাহাড়ের পায়ের কাছে মন্দিরের স্তম্ভগুলো তিনটে ধাপে ছড়িয়ে পড়েছে। নদীতীরের সমতল থেকে মসৃণ ধূসর পাথরের পথ উঠেছে, দুধারে স্ফিংকস'এর সারি, সিংহের দেহ আর মানুষের মাথা। আরও এগিয়ে চলে গেছে চওড়া সাদা সিঁড়ি। তার দুপাশের ঢালুতে খোদাই করা কুন্ডলী পাকান হলদে সাপ। সিঁড়িটা গেছে চোখ ঝলসান সাদা চুনাপাথরের তৈরী খাট স্তম্ভের উপর ভর রেখে দাঁড়ান দ্বিতীয় ধাপটায়। স্তম্ভগুলো অপেক্ষাকৃত খাট হলেও অন্তত দুমানুষ লম্বা। মন্দিরের মাঝের অংশেও ঐ একই ধরনের স্তম্ভ। তাদের প্রতিটির গায়ে মুকুট পরা মানুষের মূর্তি, হাতদুটো বুকের কাছে জোড় করা।

মন্দিরের দ্বিতীয় বিরাট ধাপটির সামনে একসার স্তম্ভ। ধাপটি হল বড় খোলা মাঠ, তাতে শুয়ে থাকা স্ফিংকসের সারি। প্রায় ত্রিশ হাত উঁচুতে তৃতীয় ধাপটি। তার চারপাশেই স্তম্ভ। পাহাড়ের সামনের স্বাভাবিক ঘেরা জায়গাটা ভরে রেখেছে।

নিচের ধাপটা প্রায় দেড় স্টেডিয়া চওড়া। তার প্রান্তে সাধারণ গোল স্তম্ভ, মাঝখানে চৌকো স্তম্ভ, আরো উপরে স্তম্ভগুলোর ছ'থেকে ষোলটা করে মুখ। মাঝখানের স্তম্ভ, পাশের স্তম্ভগুলোর শীর্ষ, পোর্টিকোর কার্ণিস আর মানুষের মূর্তি — সবই উজ্জ্বল নীল আর লাল রঙে সাজান। তাতে ধবধবে সাদা পাথর আরো ঝলমলে হয়ে উঠেছে।

সূর্যের আলোয় স্নাত মন্দিরটি পান্দিওনের পরিচিত অন্যান্য বিষণ্ণ হাঁপধরান মন্দিরের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। রঙিন নক্সার পাড়ে মোড়া তুষারশুভ্র স্তম্ভ সারির সৌন্দর্যে পান্দিওন মুগ্ধ হয়ে গেল। মনে হল এর চেয়ে সুন্দর আর কিছুই হতে পারে না। ধাপগুলিতে কী সুন্দর সুন্দর সব গাছ, পান্দিওন তা আগে কখনো দেখেওনি — বেঁটে, অথচ গায়ে গায়ে লাগান ছোট ছোট পাতায় ঘন ডালের গুচ্ছ। গাছগুলোর কড়া সুগন্ধে চারদিক ভরে আছে। তাদের সোনালিসবুজ পাতার ঝাড় লাল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়ান তুষারশুভ্র স্তম্ভের সঙ্গতে ভরে উঠেছে খুসির উজ্জ্বলতায়।

প্রবল আনন্দে কিদগো পান্দিওনকে কনুইয়ের খোঁচা মেরে ঠোঁটে আওয়াজ করে নানারকম অস্ফুট উক্তিতে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে লাগল।

ক্রীতদাসদের কেউই জানে না, মন্দিরটি প্রায় পাঁচশ বছর আগে তৈরী। স্থপতি সেন্মুৎ তাঁর আদরের রাণী খাৎশেপ্সুতের* জন্য এটি তৈরী করেন। মন্দিরটির নাম হচ্ছে জেশের-জেশেরু — অত্যাশ্চর্যের চেয়েও অত্যাশ্চর্য। ধাপের অদ্ভুত গাছগুলো আনা হয়েছে সুন্দর পুন্ত্ রাজ্য থেকে। রাণী খাৎশেপ্সুৎ সেদেশে এক বিরাট নৌ-অভিযান পাঠিয়েছিলেন। পুন্তের প্রতিটি অভিযানে এই মন্দিরটির জন্য চারাগাছ আনা এখন রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। গাছগুলো যেন সেই প্রাচীন কাল থেকে একই রয়ে গেছে।

দূর থেকে শোনা গেল পরিদর্শকের গলা। ক্রীতদাসরা তাড়াতাড়ি মন্দিরটি থেকে বাঁয়ে ঘুরল। সেখানে আরেকটা মন্দির। সেটাও পাহাড়ের খাঁজে তৈরী। এবার কাছে কাছে দাঁড়-করান স্তম্ভ সারির উপর ছোট্ট পিরামিডের আকারে বসান।**

নদীর পারে আরো কিছুটা দূরে পালিশ করা ছাইরঙা গ্রানিট পাথরের আরো দুটো ছোট মন্দির। তাদের কাছেরটায় ক্রীতদাসদের নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আগে থেকেই প্রায় জনা দুশ ক্রীতদাস দালান ভাঙার কাজ করছিল। ভিতরের সাদা পলস্তারা করা দেয়ালগুলোয় অপূর্ব সব রঙিন ছবি। আইগিপ্তসের গৃহনির্মাণ কর্মচারী আর কারিগর যারা এ কাজের ভার নিয়েছে তাদের নজর কেবল পোর্টিকো আর স্তম্ভের বাইরের পালিশ করা গ্রানিট পাথরগুলোর দিকে। ভিতরের দেয়ালগুলো তারা নির্মমভাবে ভেঙে ফেলল।

---

* খাৎশেপ্সুৎ — অষ্টাদশ রাজবংশের (খৃঃ পূঃ ১৫০০ — ১৪৫৭) রাণী। মন্দিরটি রয়েছে দেইর-এল্-বাহ্রি'তে।

** মধ্য রাজ্যের ফারাও ৪র্থ মেন্তুহতেপের মন্দির। একাদশ বংশ, আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২০৫০।

প্রাচীন শিল্পসম্ভারের এই ধ্বংসকাণ্ডে পান্দিওন মর্মাহত হল। পাথরগুলোকে কাঠের টানায় চাপিয়ে যারা নদীর কাছে নৌকোয় চাপাবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল কোনরকমে সে তাদের দলে ভিড়ল।

সে জানত না, আইগিপ্তসের ফারাওরা বহুদিন থেকেই প্রাচীন মন্দির ভাঙার কাজ করে আসছেন, বিশেষ করে প্রচুর পরিমাণে ভাল পালিশ করা পাথর দিয়ে তৈরি মধ্য রাজ্যের (খৃঃ পূঃ ২১৬০ — ১৫৮০) মন্দিরগুলো। প্রাচীন শিল্পসম্ভারের প্রতি তাঁদের কোনই শ্রদ্ধা নেই। তাঁরা কেবল তৈরী মাল দিয়ে মন্দির আর সমাধি তৈরী করে নিজেদের নাম অমর করে রাখতে চান।

বর্বর রাখাল জাত হিক্সোসরা যারা বহুশতাব্দী আগে তা-কেম জয় করেছিল বা পান্দিওনের জন্মের দুশ বছর আগে যে বিদ্রোহী ক্রীতদাসরা অল্প সময়ের জন্য এ দেশের রাজা হয়েছিল তারা কেউ এই সব মন্দিরের কোন ক্ষতি করেনি। কিন্তু এখন ফারাওদের গোপন নির্দেশ অনুসারে প্রাচীন রাজাদের মন্দির আর সমাধি পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হচ্ছে। বালিতে ঢাকা প্রাচীন পিরামিড, সেই সঙ্গে অষ্টাদশ, উনবিংশ আর বিংশ বংশের বড় বড় রাজাদের অপূর্ব সব ভূগর্ভ সমাধি খুঁড়ে যত সোনাদানা এনে জমা করা হচ্ছে ফারাওদের ভাণ্ডারে।

মন্দির ভাঙার কাজে পান্দিওনের সব মিলিয়ে তিন মাস কাটল। সে আর কিদগো বন্দীদের কাজ সহজ করার জন্য প্রাণপণ খাটত। তদারকরাও তাই চাইত: তা-কেমের শ্রমব্যবস্থা অনুযায়ী দুর্বলদেরও শক্তসমর্থ জোয়ানদের সমান কাজ করতে হয়। কিদগো আর পান্দিওনের অসাধারণ গায়ের জোর আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি পরিদর্শকদের নজর এড়াল না। তাদের দুজনকে পাথর-মিস্ত্রীদের কারখানায় কাজ শেখার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল। ফারাও'র একজন ভাস্কর সেই কারখানা থেকে তাদের নিয়ে গেল। তার ফলে তারা শেনের সঙ্গীদের কাছ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

তাদের রাখা হল একটা লম্বা বিশ্রী চালায়। সেখানে আরো অনেক ক্রীতদাসের বাস। তারা ইতিমধ্যেই তাদের সহজ সাধারণ কাজ শিখে

নিয়েছে। কারখানার উঠোনে পড়ে রয়েছে আকাটা পাথর আর খোয়া, এক কোণে কয়েক ঘর — কারিগরের বাস। তারা ক্রীতদাস নয়, আইগিপ্‌তসেরই লোক। মিশরীরা সব সময় ক্রীতদাসদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে, যেন ওদের ভয়, ক্রীতদাসদের সঙ্গে আলাপ সালাপ করলেই শাস্তি পেতে হবে।

কারখানার মালিক, রাজার ভাস্কর ভাবতেও পারেনি কিদগো আর পান্দিওনও ভাস্কর। তাই তাদের চটপট কাজ শিখে এগিয়ে যাওয়ার দৌড় দেখে সে তো তাজ্জব। সৃষ্টির কাজের জন্য পান্দিওন আর কিদগো তৃষিত, তাই এই কাজে তারা হৃদয় মন ঢেলে দিল। তারা যে ঘৃণ্য ফারাও'র জন্য কাজ করছে, সে কথা সাময়িকভাবে ভুলে গেল।

কিদগো মেতে গেল তার জলহস্তী কুমীর হরিণ আর আরো নানারকম সব অদ্ভুত জন্তুজানোয়ারের ছাঁচ নিয়ে পান্দিওন যা জন্মেও দেখেনি। তার সেই ছাঁচ নিয়ে অন্য ক্রীতদাসরা চীনামাটির ছোট ছোট মূর্তি গড়ে চলল। মিশরী ভাস্কর দেখল, মানুষের মূর্তি গড়ায় পান্দিওনের খুব উৎসাহ। তাই এই প্রতিভাবান তরুণ একুয়েশাকে সে নিজে কাজ শেখাতে লাগল। ফরমাশের কাজ খুব নিখুঁৎ করে শেষ করা চাইই চাই। 'এতটুকু গাফিলতিতে নিখুঁৎ সুষমা নষ্ট হয়,' এ কথাটা মিশরী ভাস্কর থেকে থেকেই বলে — কালো রাজ্যের প্রাচীন শিল্পগুরুদের এইটেই ছিল জপমন্ত্র। পান্দিওন মন দিয়ে কাজ শিখতে লাগল। তার ফলে বাড়ির জন্য মন কেমন করাটাও তার একেক সময় স্তিমিত হয়ে গেল। কঠিন পাথরে মূর্তি খোদাইয়ের কাজ ভাল করে শেষ করা আর সোনালি অলংকরণ বসানয় সে খুবই উন্নতি করল।

ভাস্করের সঙ্গে ফারাও'র প্রাসাদে গিয়ে পান্দিওন সেখানকার ঘরদোরের প্রচন্ড বিলাসিতা দেখে এল। রাজবাড়ির রঙিন মেঝেতে মহানদীর ঝোপঝাড়ের ছবি আঁকা, তার যত গাছপালা আর জীবজন্তুরও। নানা রঙের ঢেউ খেলান বা পাকান রেখার পাড়ে মোড়া কী সুন্দর সব ছবি! দেখে মনে হয় যেন সজীব। ঘরের দেয়ালে চীনামাটির টালি। তার উপর আবার স্বচ্ছ নীল রঙের পালিশ। ভিতরে সোনার পাতার

অত্যাশ্চর্য সব উজ্জ্বল অলংকরণ। এই সব শিল্পকার্যকে অলৌকিক ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

এই অপূর্ব আশ্চর্য শিল্পসম্ভারের মাঝখানে আসীন গর্বোদ্ধত অনড় সভাসদদের দিকে পান্দিওন তাকায় ঘৃণা ভরে।

সভাসদদের বেশভূষা সে ভাল করে দেখে নিয়েছে — সাদা পোষাকের ছোট ছোট ভাঁজগুলো ভাল করে ইস্ত্রি করা, গলায় মোটা মোটা হার, সোনার আংটি আর লকেট। কোঁকড়ান পরচুলো এসে পড়েছে কাঁধের উপর। পায়ে শুঁড় তোলা কাজ করা চপ্পল।

পান্দিওন নীরব ছায়ার মতো ব্যস্ত সমস্ত ভাস্করাচার্যকে অনুসরণ করে চলল। চলতে চলতে কেলাসিত শিলা আর কঠিন পাথর কেটে তৈরী করা পাৎলা পাত্র, কাচের ফুলদানী, ফিকে নীল রঙের নক্সা আঁকা ছাইরঙা চীনামাটির কলসগুলো দেখে নিল। এই সব সৃষ্টি যে কঠোর পরিশ্রমের ফলে সম্ভব হয়েছে, তা সে ভাল করেই বুঝতে পারল।

পান্দিওন সবচেয়ে মুগ্ধ হল আমোন উদ্যানের নিকটবর্তী বিরাট মন্দিরটি দেখে। ঐ আমোন উদ্যানেই তার ক্রীতদাস জীবনের সুরু। শেনের উঁচু দেয়ালের ওপারে তখন তার দীর্ঘ দিনগুলো চলত ধীর পায়ে।

অনেক দেবতার এই মন্দিরটি বহু হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে তৈরী হয়েছে। আটশ হাত লম্বা বিরাট মন্দিরটিকে তা-কেমের প্রত্যেক রাজা নতুন নতুন সংযোজন করে বাড়িয়েছেন।

নদীর ডান তীরে চমৎকার বাগান। বাগানটি রাজধানী নুৎ-আমোন বা শুধু নুৎ — নগরীর, মিশরীরা এই নামই ব্যবহার করে, মধ্যেই পড়ে। তাতে সারে সারে বড় বড় তালগাছ। দুই প্রান্তে কয়েকটি মন্দির। মন্দিরগুলো থেকে বড় বড় বীথী চলে গেছে নদীতীর আর মুতের মন্দিরের সামনেকার পবিত্র হ্রদ পর্যন্ত। মুৎ যে কিসের দেবী পান্দিওন তা বুঝে উঠতে পারেনি। প্রতিটি বীথীর দুধারে অদ্ভুত সব জন্তুজানোয়ারের মূর্তি।

তিন মানুষ উঁচু গ্রানিট পাথরের তৈরী জন্তু। সিংহের মতো শরীর, মাথাটা হয় ভেড়ার মতো নয়ত মানুষের। দেখে কেমন একটা হাঁপধরে

যায়। চোখধাঁধান রোদে বেদীর উপর আসীন কাছাকাছি সব রহস্যময় স্থাণু মূর্তি, পথচারীদের উপর এসে পড়েছে তাদের মাথা।

তালগাছের রুক্ষ ঘন পত্রগুচ্ছ ফুঁড়ে উঠেছে জলন্ত ধূপকাঠির মতো সোনারুপোর খাদে তৈরী উজ্জ্বল হলদে পাতে মোড়া পঞ্চাশ হাত উঁচু বিরাট ছুঁচলো মুখ পিরামিডাকার সরু স্তম্ভ।

রুপোমোড়া পাথর দিয়ে তৈরী বীথীগুলো দিনের বেলা ঝলসে দেয় দর্শকদের বিস্মিত চোখ। রাত্রে চাঁদ আর তারার আলোয় মনে হয় যেন অপার্থিব আলোর স্রোত বয়ে চলেছে।

মন্দিরের তোরণের সামনে বিরাট বিরাট পিলন, তারা মন্দিরের প্রবেশপথ আটকে রাখে। তাদের গায়ে দেবদেবী আর ফারাওয়ের প্রকাণ্ড সব মূর্তি, তা-কেমের অজ্ঞাত দুর্বোধ্য ভাষায় উৎকীর্ণ লিপি। সোনারুপোর খাদের অলংকরণ সমৃদ্ধ ব্রোঞ্জের পাত লাগান বিরাট দরজা পিলনগুলোর মাঝখানের পথ আটকে রেখেছে। তাদের ঢালাই ব্রোঞ্জের কব্জাগুলোর একেকটার ওজনই হবে কয়েকটা ষাঁড়ের সমান। তাদের বিরাট বহর দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

মন্দিরের ভিতরটা পঞ্চাশ হাত উঁচু স্তম্ভে ভরা। স্তম্ভগুলোর মাথার খোদাইকাজে মন্দিরের উপরের অংশটা ছেয়ে গেছে। দেয়াল ছাদ আর স্তম্ভের বিরাট বিরাট পাথরগুলো যেমন সুন্দর পালিশ করা তেমনি নিখুঁৎভাবে বসান।

দেয়াল স্তম্ভ আর কার্ণিসগুলো উজ্জ্বল রঙে আঁকা থাক থাক ছবি আর খোদাইকাজে ভরা। রহস্যময় আধঅন্ধকারে মন্দিরের দূরাংশ থেকে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে রয়েছে সূর্যচক্র বাজপাখি আর জন্তুর মাথাওয়ালা দেবদেবীরা।

বাইরেও সেই সোনা আর রুপোর একই উজ্জ্বল রং; বিরাট বিরাট দালান আর মূর্তি দেখে হতচকিত দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, হাঁপ ধরে আসে।

সবখানেই গোলাপী আর কালো গ্রানিট, লাল বালিপাথর আর হলদে চুনাপাথরের মূর্তি — তা-কেমের দেবত্বপ্রাপ্ত রাজারা অমানুষিক

গাম্ভীর্য নিয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে বসে আছেন। কোন কোনটা আবার কোণাকার রুক্ষ পাথর-কাটা, চল্লিশ হাত উঁচু বিরাট মূর্তি। অন্যগুলো ভয়াবহ বিষণ্ণ, তাদের আবার সযত্নে চিত্রিত করা হয়েছে। অত্যন্ত খুঁটিয়ে ভাল করে শেষ করা এই মূর্তিগুলোও মানুষের মাপের চেয়ে একটু বড়।

পান্দিওনের জীবন কেটেছে প্রকৃতির কোলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে। তাই প্রথমটা সে এ সব দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এই বিরাট সমৃদ্ধ দেশের সব কিছুই তার মনে গভীর ছাপ ফেলেছে।

মর্ত্য মানুষের ধারণাতীত কোন উপায়ে নির্মিত এই বিরাট নির্মাণকার্য, মন্দিরের বিষণ্ণতায় লুকিয়ে আছে ভয়াবহ দেবদেবীরা, জটিল আচার অনুষ্ঠানের দুর্বোধ্য ধর্ম, দালানগুলোর গায়ে প্রাচীনতার ছাপ, এসবের ফলে পান্দিওনের মনটা প্রথম প্রথম হাঁপিয়ে ওঠে। তার ধারণা হয়েছিল, আইগিপ্তসের গর্বোদ্ধত দুর্বোধ্য অধিবাসীরা গভীর সত্যের অধিকারী, শক্তিশালী অদ্ভুত বিজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছে। সে জ্ঞান লুকিয়ে রয়েছে বিদেশীদের কাছে দুর্বোধ্য কালো রাজ্যের লিপিতে।

প্রাণহীন মৃত্যুদায়ী মরুভূমির চাপে দেশটা পরিণত হয়েছে এক সংকীর্ণ উপত্যকায়। এক বিরাট নদী দূর দক্ষিণের কোন অজানা দেশ থেকে তার জন্য জল বয়ে আনছে। এ দেশটা যেন নিজেই একটা আলাদা জগৎ, ওইকুমেনার অন্যান্য অংশের সঙ্গে তার কোনই যোগাযোগ নেই।

তরুণ গ্রীকের সুস্থ মন কিন্তু ক্রমশ এই সব নানারকম ধারণা আর ছাপের ঘোর কাটিয়ে সহজ স্বাভাবিক সত্যের সন্ধান করতে লাগল।

সে এখন সময় পেয়েছে সবকিছু ভেবেচিন্তে দেখার। সর্বদা সুন্দরের সন্ধানী তরুণ ভাস্করের মন আইগিপ্তসের শিল্প আর জীবনের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠতে সুরু করল। পরে সচেতন হয়ে উঠল এই প্রতিবাদ।

এই উর্বর দেশে প্রতিকূল আবহাওয়া কেউ কখনো দেখেনি, আকাশ সব সময়ই উজ্জ্বল পরিষ্কার আর প্রায় সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত, স্বচ্ছ প্রাণদায়ী বাতাস। মনে হয় এদেশটা যেন সুস্থ সুখের জীবনের জন্য

বিশেষভাবে সৃষ্ট। পান্দিওন এ দেশ খুব কমই দেখেছে। কিন্তু তবু আইগিপ্তসের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যায় যারা সবচেয়ে বেশি সেই দরিদ্রতম নেম্‌হুদের দৈন্য আর দুর্দশা তার চোখ এড়ায়নি। বিরাট বিরাট মন্দির আর মূর্তি, সুন্দর সুন্দর বাগান, এই সব প্রাসাদ আর মন্দিরের কারিগরদের সারি সারি অজস্র কদর্য কুঠরিগুলোকে ঢেকে রাখতে পারেনি। শত শত শেনের ক্রীতদাসদের দুর্দশার কথা তো পান্দিওন নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই ভালো করে জানে।

ক্রমশ সে বুঝল, আইগিপ্তসের শিল্প দেশের ফারাও আর পুরোহিতদের হাতে বাঁধা। শিল্পে সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবির নিয়মকানুন খুঁজে দেখার তার যে ইচ্ছা তার একেবারে বিপরীত।

কেবল খোলামেলা চারপাশের দৃশ্যের সঙ্গে সুষমা রেখে তৈরী জেশের-জেশেরু মন্দির দেখে তার ভাল লাগল। মনে হল এইটেই তার আদর্শের কাছাকাছি।

অন্য সব বিরাট বিরাট মন্দির আর সমাধি উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। সেই দেয়ালের আড়ালে আইগিপ্তসের কারিগররা পুরোহিতদের নির্দেশ অনুসারে মানুষকে জীবন বিমুখ ছোট করে তুলে তার মনোবল ভেঙে দেবার জন্য তাদের সব কৌশল প্রয়োগ করেছে, মহিমাময় দেবদেবতা আর ফারাওদের তুলনায় মানুষ যে অনেক নগণ্য সে কথাই বোঝাতে চেয়েছে।

গঠনগুলির বিরাট আয়তন, তাদের নির্মাণে যে প্রচণ্ড শ্রম আর মালমশলা লেগেছে তা মানুষের মনোবল ভেঙে দেয়। একই একঘেয়ে রূপ একটার উপর আরেকটা ক্রমাগত বসিয়ে অসীম দূরত্বের ভাব গড়ে তোলা হয়েছে। সেই একই স্ফিংক্‌স্‌, একই স্তম্ভ দেয়াল আর পিলন। প্রত্যেকটিতেই কয়েকটি বাছাই-করা খুঁটিনাটি চিত্রণ। সবকটিই যেমন বিরাট তেমনি আয়ত, স্থাণু। অন্ধকার মন্দিরগুলোর পথের দুপাশে একই রকমের বিরাট বিরাট বিষণ্ণ ভয়াবহ সব মূর্তি।

আইগিপ্তসের শাসনকর্তা — শিল্প পরিচালকরা — ভয় পায় খোলামেলাকে: প্রকৃতির রাজ্য থেকে নিজেদের ছিনিয়ে এনে তারা

চারপাশে বেড়া বেঁধে দিয়েছে, মন্দিরের ভিতরটা ভরে দিয়েছে বিরাট বিরাট পাথরের স্তম্ভ, মোটা মোটা দেয়াল আর পাথরের কড়ি বরগা দিয়ে — খোলা জায়গার চেয়ে তারা বেশি জায়গা জুড়ে বসে থাকে। প্রবেশদ্বার যত দূরে মন্দিরের ভিতর স্তম্ভের বন ততই ঘন, স্বল্প আলোকিত ঘরগুলো ততই অন্ধকার। অসংখ্য সরু সরু দরজা মন্দিরগুলোকে রহস্যজনক ভাবে দুষ্প্রবেশ্য করে তুলেছে। অষ্টপ্রহর আধঅন্ধকার দেবদেবীদের প্রতি ভয় বাড়িয়ে তোলে।

মানুষের মনের উপর এই ইচ্ছাকৃত রেখাপাতের গোপন রহস্য ক্রমশ পান্দিওনের কাছে ধরা পড়ল। বহু শতাব্দীর স্থাপত্যের অভিজ্ঞতার ফলেই এই অভিপ্রায় সফল হতে পেরেছে।

চারপাশের ঢেউখেলান বালির উপর উদ্ধত বিরাট পিরামিডের নিখুঁৎ জ্যামিতিক গঠন পান্দিওন যদি দেখতে পেত তাহলে মানুষকে প্রকৃতির বিরোধী করে তোলার রাজকীয় ধরনটা সে আরো ভাল করে বুঝতে পারত। অজানার প্রতি নিজেদের ভয়কে লুকিয়ে রাখার এই উপায়ই গ্রহণ করেছিল তা-কেমের শাসনকর্তারা। মিশরীদের গণ্ডীবদ্ধ রহস্যময় ধর্মেও প্রতিফলিত হয়েছে সেই ভয়।

বিরাট মূর্তি আর তাদের বিপুল শরীরের সুষম স্থাণুত্বে তা-কেমের কারিগররা চেষ্টা করেছে দেবদেবীদের আর ফারাওদের শক্তির প্রকাশ ঘটাতে, চেয়েছে এইভাবে তাদের মহিমা প্রচার করতে।

মন্দিরের দেয়ালে ফারাওদের ছবি আঁকা হয়েছে সাধারণ চেহারার চেয়ে অনেক বড় করে। তাঁদের পায়ের কাছে যে বামনরা ভীড় করে আছে তারা হচ্ছে কালো রাজ্যের অন্যান্য অধিবাসী। মিশরের রাজারা নিজেদের মহত্ব প্রচারের সবরকম উপায় গ্রহণ করেছেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, মানুষকে সবরকম ভাবে হীন করেই নিজেদের বড় করা যায়, ভেবেছিলেন এইভাবেই সবার উপর তাঁদের প্রভাব বিস্তার লাভ করবে।

পান্দিওন তখনো কালো রাজ্যের লোকেদের সত্যিকার শিল্পের কথা খুব কম জানে। সে শিল্প রাজসভা আর পুরোহিতদের হাতে বাঁধা নয়। সাধারণ জনগণের নিত্যব্যবহার্য জিনিসেই তার প্রকাশ। সে

অনুভব করেছিল, প্রকৃত শিল্প গড়ে ওঠে জীবনের সঙ্গে সহজ সরল সানন্দ সম্মিলনে, মানুষকে তা হীন করে না, বড় করে। আইগিপ্‌তসের সব শিল্প সৃষ্টির চেয়ে তা একেবারেই অন্য ধরনের, নদনদী মাঠঘাট বন সমুদ্র আর পাহাড়ের বৈচিত্র্যে ভরা, ঋতুর রঙিন পরিবর্তনে সুন্দর পান্দিওনের দেশ যেমন আগুনের মতো বালিতে ঘেরা সবখানে একরকমের একঘেয়ে পাহাড় আর সযত্নে তৈরী বাগানে ছাওয়া নদী উপত্যকা এই আইগিপ্‌তস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আইগিপ্‌তসের অধিবাসীরা হাজার হাজার বছর আগে প্রতিকূল জগৎ থেকে পালিয়ে এসে নীলনদীর উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছে। আজ তাদের বংশধররা জীবন থেকে পালাবার চেষ্টায় আশ্রয় নিয়েছে প্রাসাদ আর মন্দিরে।

পান্দিওনের মনে হল, আইগিপ্‌তসের শিল্প মহিমা অনেকাংশে বিভিন্ন জাতের ক্রীতদাসদের স্বাভাবিক ক্ষমতার ফল। লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হত সবচেয়ে প্রতিভাবানদের। তারা তাদের উৎপীড়ক দেশের মহিমা প্রচারেই অনিচ্ছাসহকারে নিবেদিত করত নিজেদের সমস্ত সৃজন ক্ষমতা। আইগিপ্‌তসের শক্তির প্রতি নতি স্বীকারের ভাব কেটে যাবার পর পান্দিওন ঠিক করল যত তাড়াতাড়ি পারে পালাবে। কিদগোকে সেটা বোঝাতে হবে ...

কিদগো আর আরো দশজন ক্রীতদাসের সঙ্গে প্রাচীন সহর আখেতাতোনের* দূর পথে চলতে চলতে পান্দিওন শুধু পালানর কথাই ভাবছিল। নৌকোর দাঁড়ে নদীর বুকের মসৃণতা ভেঙে দিয়ে চলেছে তরুণ ভাস্কর। ভাঁটার টানে দ্রুত ছুটে চলা নৌকো তার মন আনন্দে ভরে দিয়েছে। বহুদূর পাল্লার যাত্রা। প্রায় তিন হাজার স্টেডিয়া। তার মানে পান্দিওনের দেশ থেকে ক্রীট। এককালে সেটাই তার কাছে কী অপরিমেয় মনে হত। এই যাত্রার সময়ই পান্দিওন জানতে পারল, মিশরীরা যাকে বিরাট সবুজ সাগর বলে আখেতাতোনের চেয়ে সেটা

---

* আখেতাতোন (তেল্‌-এল্‌-আমার্‌না) — ফারাও ৪র্থ আমেনহোতেপের রাজধানী, খৃঃ পূঃ ১৩৭৫ — ১৩৫৮।

দ্বিগুণ দূরে। সেই সাগরের উত্তর তীরেই তেস্‌সা তার অপেক্ষায় রয়েছে।

পান্দিওনের খুসির ভাব কিন্তু শীগ্‌গীরই দূর হয়ে গেল: এই প্রথম সে বুঝতে পারল ফেনার রাজ্যের কত ভিতরে সে ঢুকে পড়েছে। দেশে ফেরার জন্য সমুদ্রতীরে যাওয়া দরকার, কিন্তু সে সমুদ্রতীর যে বহুদূরে।

আবার সে দাঁড়ের উপর ঝুঁকে পড়ল। নৌকোটা সেই অন্তহীন নদীর মসৃণ বুকের উপর দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে সবুজ গাছগাছড়া চষা ক্ষেত নলখাগড়ার বন আর উত্তপ্ত পাহাড়।

রাজার ভাস্কর ডোরাকাটা একটা চাঁদোয়ার নিচে শুয়ে ছিল। এক ক্রীতদাসের উপর ছিল তার চামরব্যজনের ভার। দুই তীরে সারি সারি কুঁড়েঘর — এই উর্বর দেশ অজস্র লোকের অন্ন জোগাচ্ছে। হাজার হাজার লোক কাজ করছে ক্ষেতে, বাগানে আর প্যাপিরাস ঝাড়ে। অত্যন্ত সামান্য জীবিকা উপার্জনের জন্য করে চলেছে প্রাণপাত পরিশ্রম। অসংখ্য গ্রামের সংকীর্ণ রোদে-পোড়া রাস্তায় হাজার হাজার লোকের ভীড়। গ্রামগুলোর উপান্তে রোদ আড়াল করে উদ্ধতভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বিরাট সব বেঢপ মন্দির।

পান্দিওনের হঠাৎ মনে হল তা-কেমের এই কদর্য জীবনযাত্রায় যে শুধু সে আর তার সঙ্গীরাই বাঁধা পড়েছে তা নয়। ঐ কুঁড়েঘরগুলোর হতভাগ্য বাসিন্দারাও বাঁধা পড়েছে তাদের দুঃখকষ্টের দাসত্বে, ওরা যতই তাকে বুনো মার্কামারা জংলী বলুক আসলে ওরাও রাজা আর রাজার সভাসদদের দাস ...

গভীর ভাবনায় মগ্ন পান্দিওনের দাঁড়টা তার পাশের লোকের দাঁড়ের গায়ে সশব্দে গিয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ শোনা গেল কর্ণধারের উচ্চ চিৎকার:

'ওহে, ও একুয়েশা, আরে চোখ চাও, দেখে চালাও!'

প্রত্যেক সহর আর মন্দিরের কাছাকাছি আছে জেলখানা। রাত্তিরে সেই কয়েদখানাতেই ক্রীতদাসদের বন্ধ করে রাখা হয়।

প্রত্যেক জায়গায় ফারাও'র ভাস্করের মহা খাতির। দুজন বিশ্বস্ত চাকর সঙ্গে নিয়ে সে যায় বিশ্রাম করতে।

পাঁচদিনের দিন নৌকো নদীর জলে ধোওয়া একটা পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে গেল। পাহাড়ের ওদিকে ধুধু মাঠ। নদী আর মাঠের মাঝখানে তাল আর সাইকামোর গাছের সারি। নৌকো পাথরে বাঁধান ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। ঘাটের চওড়া সিঁড়িদুটো জল পর্যন্ত নেমে এসেছে। নদীতীরে একটা খাঁজকাটা দেয়াল, তার পিছনে মস্ত এক মিনার। বড় বড় তোরণগুলো আধখোলা। তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় পুকুর, একটি বাগান আর ফুলে ভরা জমি। তার ভিতরে রঙিন নক্সা আঁকা একটা সাদা বাড়ি।

এখানকার মন্দিরগুলোর প্রধান পুরোহিতের বাড়ি।

রাজভাস্করকে দেখেই সান্ত্রীরা নত হয়ে শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন জানাল। ভাস্কর তোরণের ভিতরে ঢুকল। ক্রীতদাসরা বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল দুজন যোদ্ধার পাহারায়। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। কিছুক্ষণ পরেই ভাস্কর একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। লোকটির হাতে ভাঁজ করা প্যাপিরাস। ক্রীতদাসদের নিয়ে তারা কতগুলো মন্দির আর বসতবাড়ি পার হয়ে একটা বড় জায়গায় এল। কতগুলো পোড়ো দেয়াল আর অজস্র স্তম্ভ সেখানে দাঁড়িয়ে। ছাদ সব ভেঙে পড়েছে। মৃত নগরীর এখানে ওখানে কয়েকটা ছোটখাট বাড়ি দাঁড়িয়ে, ততটা ভাঙ্গাচোরা নয়। মাঝে মাঝে একেক জায়গায় গাছের খোঁটা দেখে বোঝা যাচ্ছে এক সময়ে বাগান ছিল। শুকনো পুকুর আর খাল বালিতে ভরে গেছে। পাথর বাঁধান রাস্তাগুলোর উপরে বালির ঘন আস্তর, বালির গাদা জমেছে কালের আঘাতে ক্ষয় পাওয়া দেয়ালগুলোর কাছে। কোথাও কোন সজীব প্রাণের সাড়া নেই। ভীষণ গরমের মধ্যে মারাত্মক এক নৈঃশব্দ্য।

রাজভাস্কর সংক্ষেপে পান্দিওনকে বলল, জায়গাটা এক সময়ে ছিল দেবতাদের দ্বারা অভিশপ্ত ধর্মদ্রোহী ফারাওয়ের* মনোরম রাজধানী। কালো রাজ্যের প্রকৃত সন্তান কেউ তাঁর নাম মুখে আনে না।

---

* ৪র্থ আমেনহোতেপ। তিনি মিশরে নতুন ধর্ম প্রচলনের চেষ্টা করেন। সে ধর্মে একটিমাত্র দেবতা — সূর্যচক্র আতোন।

চার শতাব্দী আগেকার এই ফারাও কী করেছিলেন, এই নতুন রাজধানীই বা কেন তৈরী করেছিলেন, পান্দিওন তা জানতে পারল না।

ভাস্করের সঙ্গের লোকটি তার গুটনো প্যাপিরাস মেলে দিল। তাতে আঁকা ছবি দেখে দুজন মিশরী একটা লম্বা বাড়ির অবস্থান খুঁজে পেল। বাড়িটার প্রবেশপথের স্তম্ভগুলো মাটিতে পড়ে গেছে। ভিতরের দেয়ালগুলোয় সোনার শিরা বসান আসমানী টালি।

পান্দিওন আর অন্য ক্রীতদাসদের কাজ হল দেয়ালে পাকাভাবে গেঁথে দেওয়া এই পাৎলা টালিগুলোকে সযত্নে তুলে আনা। কাজ শেষ হতে কয়েক দিন লাগল। রাত্তিরে ক্রীতদাসরা ঐ ধ্বংসপুরীতেই থাকে। পাশের গ্রাম থেকে তাদের খাবারদাবার আর জল আনা হয়।

কাজ শেষ হয়ে গেলে পর পান্দিওন কিদগো আর আরো চারজন ক্রীতদাসকে জায়গাটা ইচ্ছামত ঘুরে কোথাও কোন শিল্পসম্ভার পড়ে আছে কিনা খুঁজে দেখতে বলা হল। কিছু পাওয়া গেলে সেগুলো চালান যাবে ফারাও'র প্রাসাদে। কিদগো আর পান্দিওন একসঙ্গে বেরল। এই প্রথম তাদের সঙ্গে কোন পাহারাদার নেই, নেই পরিদর্শকের কড়া নজর।

চারপাশটা ভাল করে দেখে নেওয়ার জন্য দুই বন্ধুতে একটা বড় দালানের মিনারের মাথায় উঠল। পূর্বদিক থেকে বালি ধ্বংসপুরীর কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে, তারপর ছড়িয়ে পড়েছে ঢেউখেলান বালিয়াড়ি আর পাথরের মরুভূমি। যতদূর চোখ যায় শুধু ঐ একই দৃশ্য।

নীরব ধ্বংসপুরীর দিকে তাকিয়ে পান্দিওন উত্তেজনায় কিদগোর হাতটা জোরে চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল:

'চল দৌড়ে পালাই, অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোন খোঁজ পড়বে না। কেউ আমাদের দেখছে না ...'

নিগ্রোর সরল মুখটা হাসিতে ভরে গেল।

'মরুভূমি কী বস্তু তা বুঝি জান না?' কিদগো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'আগামী কাল এই সময়ে অনুসন্ধানী যোদ্ধারা রোদে পোড়া আমাদের মৃতদেহগুলো খুঁজে পাবে। ওরা, তার মানে মিশরীরা, এসব

ভাল করেই জানে। একটিমাত্র রাস্তা আছে পূবে, সেটা গেছে জলের কুয়ো ধরে। সে পথে পাহারার ভাল ব্যবস্থা। অথচ এখানে মরুভূমির বাঁধন শিকলের চেয়েও শক্ত ...'

পান্দিওন বিষণ্নভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল, তার ক্ষণেকের উত্তেজনা কেটে গেছে। নিঃশব্দে মিনারের মাথা থেকে নেমে এসে দুই বন্ধু দু দিকে চলে গেল, দেয়ালের ফুটোতে উঁকি মারল। অন্ধকার খোলা দরজা দিয়ে একেকটা ঘরে ঢুকতে লাগল।

কিদগো একটা ছোট্ট সুরক্ষিত দোতলা প্রাসাদে ঢুকে পড়ল। তার জানলায় কাঠের জালিকাজের অবশিষ্টাংশ। সেখানে সে সৌভাগ্যবশত হলদে রঙের শক্ত চুনাপাথরের তৈরী মিশরী মেয়ের একটা ছোট্ট মূর্তি খুঁজে পেল। পান্দিওনকে ডেকে দুজনে মিলে তারা সেই অজ্ঞাত শিল্পাচার্যের হাতের কাজ ভালো করে দেখতে লাগল। মেয়েটির সুন্দর মুখ খাঁটি মিশরী ধাঁচের। পান্দিওন সে ধাঁচের সঙ্গে পরিচিত — ছোট কপাল, তোলা সংকীর্ণ চোখ, গালের উঁচু হাড়, মোটা ঠোঁট, তার দুকোণে টোল।

মূর্তিটি নিয়ে কিদগো কর্মশালার মনিবের কাছে গেল। পান্দিওন ভগ্নাবশেষ পেরিয়ে আরো ভিতরে চলল। যন্ত্রচালিতবৎ খসে পড়া দেয়াল ছাদ আর পাথরের গাদা পার হয়ে পান্দিওন হেঁটে চলল। কোন দিকে যাচ্ছে তার খেয়াল নেই। কিছুক্ষণ পরেই সে এসে পড়ল একটা ভেঙে না পড়া দেয়ালের ঠাণ্ডা ছায়ায়। একেবারে সামনেই একটা এঁটে বন্ধ করা দরজা। সেটা পার হয়ে মাটির নিচে যাওয়া যায়। দরজার তামার তৈরী হাতলটা ধরে চাপ দিতেই পচে যাওয়া কাঠগুলো ভেঙে গেল। পান্দিওন ঘরে ঢুকল। অন্ধকার ঘর। সিলিং'এর একটা সরু ফাটল থেকে কেবল একটুখানি ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে।

ছোট্ট ঘর। চমৎকার গাঁথা পাথরে তৈরী দেয়াল। ধুলোয় ঢাকা দুটো পাৎলা আব্লুস কাঠের আরাম কেদারা। তাতে হাতির দাঁতের কাজ। এক কোণে পড়ে আছে একটা ভাঙা বাক্স! উল্টো দেয়ালে গোলাপী গ্রানিট পাথরের উপর দাঁড় করান একটা ছাইরঙের পাথরে তৈরী পূর্ণাবয়ব নারী মূর্তি। তার নিচের অংশটা শেষ হয়নি।

মূর্তির দুপাশে দুটো কালো পাথরের প্যান্থার যেন পাহারা দিচ্ছে। মূর্তির গায়ের ধুলো সযত্নে ঝেড়ে ফেলে নীরব মুগ্ধতায় পান্দিওন একটু পেছিয়ে দাঁড়াল।

দক্ষ শিল্পী মেয়েটির গায়ের স্বচ্ছ বাস পাথরে চমৎকার ফুটিয়েছে। বাঁ হাতে মেয়েটি বুকের কাছে চেপে ধরেছে একটা পদ্ম। একাধিক বেণীতে বাঁধা তার ঘন চুলের মাঝখানে সোজা সিঁথি। চুলগুলো মুখ ঘিরে ঘাড়ের নিচে এসে পড়েছে। সুন্দর মেয়েটি মিশরীদের মতো দেখতে নয়। গোল মুখ, ছোট্ট খাড়া নাক, উঁচু কপাল আর দূরে দূরে বসান বড় বড় চোখ।

পান্দিওন এক পাশ থেকে মূর্তিটা দেখে অবাক হল। মেয়েটির মুখে এক অদ্ভুত সূক্ষ্ম বিদ্রূপের ভাব ভাস্কর ফুটিয়ে তুলেছে। মূর্তিতে এরকম প্রাণ আর বুদ্ধির প্রকাশ সে আগে কখনো দেখেনি। আইগিপ্তসের শিল্পীদের পছন্দ কেবল বিরাটতা আর উদাসীন জড়তা।

মেয়েটি বরং অনেকটা এনিয়াদার মেয়েদের মতোই দেখতে, এমনকি পান্দিওনের দেশের সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের সুন্দর মেয়েদের সঙ্গেই তার মিল বেশি।

মূর্তিটির প্রশান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মুখ মিশরী ভাস্কর্যের বিষণ্ণ সৌন্দর্যের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। তার রূপায়ণও এত নিপুণ যে, আবার দেশের জন্য পান্দিওনের মন কেমন করে উঠল। যাকে দেখে মূর্তিটি গড়া হয়েছে, দুহাত মুঠো করে পান্দিওন মনে মনে তার কথা কল্পনা করতে লাগল। মেয়েটির সঙ্গে কেন যেন তার একটা একাত্মতা গড়ে উঠল। এ মেয়েটিও চার শতাব্দী আগে অজানা পথে আইগিপ্তসে এসে পৌঁছেছিল। তাকেও কি পান্দিওনের মতো বন্দীদশা ভোগ করতে হয়েছিল, নাকি সে কোন দূর দেশ থেকে এখানে এসেছিল নিজের ইচ্ছাতেই?

সিলিং'এর ফাটল দিয়ে আসা আলোর রেখাটা মূর্তির উপর একটা ধুলোমাখা আলো ফেলেছে। পান্দিওনের মনে হল মূর্তির মুখের অভিব্যক্তি বদলে গেছে — চোখ জ্বলছে, ঠোঁট কাঁপছে, যেন পাথরে সাড়া তুলেছে এক রহস্যময় গোপন প্রাণস্পন্দন।

গড়তে হলে এরকম মূর্তিই গড়া চাই... এই তো সন্ধান মিলেছে গুরুর... বহু কাল আগে পরলোকগত এই আচার্যের কাছেই পান্দিওন শিখতে পারবে সজীব সৌন্দর্যের রূপায়ণ-কৌশল!

যে ছোটখাট সূক্ষ্ম প্রায় অধরা কাজের ফলে মূর্তিটি এত সজীব হয়ে উঠেছে তা পরখ করে দেখার জন্য মূর্তির মুখের উপর শ্রদ্ধাভরে আঙুল ছোঁয়াল পান্দিওন।

অনেকক্ষণ ধরে সে মূর্তিটির সামনে দাঁড়িয়ে রইল। মূর্তির সুন্দর মেয়েটি বিদ্রূপভরা বন্ধুত্বের ভাবে হেসে চেয়ে রইল তার দিকে। পান্দিওনের মনে হল সে এক নতুন বন্ধুর সন্ধান পেয়েছে, এর হাসিতে লাঘব হবে নিরানন্দ দিনের অন্তহীন ক্রমযাত্রার ভার।

নিজের অজ্ঞাতসারেই পান্দিওন তেস্‌সার কথা ভাবতে সুরু করল। আবার চোখের সামনে রূপ নিল তার সজীব মূর্তি ...

দেয়াল আর সিলিং'এর অলংকরণের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল পান্দিওনের চিন্তিত চোখদুটো। সেখানে ষাঁড়ের মাথার সঙ্গে মিলে মিশে গেছে তারার দল, পদ্মের গুচ্ছ আর বাঁকা লিলি। হঠাৎ শিউরে উঠল পান্দিওন: তেস্‌সার স্বপ্নমূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার বদলে দেয়ালে আঁকা রয়েছে পিঠে পিঠে বাঁধা একদল ক্রীতদাস — তাদের টেনে আনা হচ্ছে ফারাওয়ের পায়ের কাছে। পান্দিওনের মনে পড়ল দেরী হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। এতক্ষণ না ফেরার অজুহাত হিসাবে কিছু নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু মূর্তিটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে পান্দিওন বুঝল, ভাস্করাচার্যকে এ মূর্তি সে কিছুতেই দিতে পারবে না। সেটা হবে বিশ্বাসঘাতকতা, মেয়েটিকে দ্বিতীয়বার দাসত্বের যূপকাষ্ঠে ঠেলে দেওয়া। তাড়াতাড়ি চারদিকে তাকাতে হঠাৎ কোণের মঞ্জুষাটার কথা মনে পড়ে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে পান্দিওন তার ভিতর থেকে চারটে পানপাত্র তুলে নিল, পদ্মফুলের মতো তারা দেখতে, নীল এনামেলে ঢাকা। এই যথেষ্ট। মেয়েটির মুখের প্রতিটি খুঁটিনাটি স্মৃতিতে গেঁথে রাখার চেষ্টায় পান্দিওন শেষ বারের মতো মূর্তিটির দিকে তাকাল। তারপর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পানপাত্র চারটে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। চারদিকে

তাকিয়ে সে একবার দেখে নিল কেউ তাকে দেখছে কি না। তারপর তাড়াতাড়ি বড় বড় পাথর দিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চারিদিকে ছিটিয়ে দিল খোয়া যাতে প্রবেশপথটাকে ভাঙা দেয়ালেরই অংশ বলে মনে হয়। পানপাত্রগুলোকে তার নেংটিতে সযত্নে বেঁধে নিয়ে আপনা থেকেই সে নিজের নিরাপদ আলয়ে নিশ্চিন্ত মূর্তিটির উদ্দেশে জানাল বিদায় সম্ভাষণ। তারপর তাড়াতাড়ি দলের লোকদের দিকে এগল। ক্রীতদাসদের চীৎকার শুনে শুনে সে দিক ঠিক করে এগিয়ে চলল। তারা সম্ভবত তার সন্ধান করছিল। সবার গলা ছাপিয়ে উঠেছিল কিদগোর বাজখাঁই ডাক।

রাজভাস্কর পান্দিওনকে দেখেই শাসাতে সুরু করেছিল। কিন্তু পান্দিওনের আনা মহামূল্য জিনিসগুলো দেখে শান্ত হয়ে গেল।

ফিরতি পথে নদীর স্রোত ঠেলে উল্টো দিকে চলতে হল বলে আরো তিনদিন বেশি লাগল। সেই মূর্তির কথা কিদগোকে জানাল পান্দিওন। তার কাজে সমর্থন জানিয়ে নিগ্রো বলল, মেয়েটি খুব সম্ভব মাশুআশি। বিরাট পশ্চিম মরুভূমির উত্তর প্রান্তে তাদের বাস।

কিদগোকে পান্দিওন অনেক করে বোঝাল, চল পালাই। কিন্তু বন্ধু তার কেবল মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে তার সব পরিকল্পনা নাকচ করে দেয়।

সাতদিনের যাত্রায় পান্দিওন তার বন্ধুকে কিছুতেই বোঝাতে পারল না। কিন্তু নিজে সে চুপ করে বসে থাকতে পারল না। মনে হল সে বুঝি আর সইতে পারবে না, মরেই যাবে। নির্মাণ কাজে রত শেনের সঙ্গীদের অভাব সে খুবই অনুভব করতে লাগল। তার মনে হল ওরাই হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জন করার শক্তি, তাদের সাহচর্যেই সে দেখেছিল আশায় ভরা ভবিষ্যতের ছবি... কিন্তু এখানে মুক্তির কোন আশাই কোথাও নেই — অসহায় রাগে ফুলতে লাগল পান্দিওন।

কর্মশালায় ফেরার দুদিন পর রাজভাস্কর পান্দিওনকে প্রধান স্থপতির প্রাসাদে নিয়ে গেল। সেখানে তখন একটা উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। পান্দিওনের উপর হুকুম হল মাটির পুতুল গড়ে তা থেকে মিষ্টি বিস্কুটের জন্য ছাঁচ তৈরী করার।

কাজ শেষ হয়ে গেলে পর পান্দিওনকে ওখানেই বসে থাকতে বলা হল। ভোজের পর রাজভাস্করকে পাল্কীতে করে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। প্রাসাদের ব্যস্তসমস্ত অন্যান্য দাস দাসীদের দিকে কোন নজর না দিয়ে পান্দিওন একা একা চলে গেল বাগানে।

অন্ধকার আকাশে তারা জ্বলছে। কিন্তু ভোজের পালা তখনো শেষ হয়নি। খোলা জানলা দিয়ে হলদে আলোর উজ্জ্বল রেখা বাগানের অন্ধকার ভেদ করে গাছের কাণ্ড পাতা আর ফুলের উপর পড়েছে। পুকুরের আয়নার মতো মসৃণ বুকে ফেলেছে জ্বলন্ত লাল আলোর প্রতিবিম্ব। দেবদারু গাছের মসৃণ কাণ্ডের স্তম্ভে সজ্জিত একতলার বড়ঘরটায় অতিথিরা সবাই সমবেত। সেখান থেকে ভেসে আসছে গানবাজনার আওয়াজ। এতদিন ধরে অজানা বিষণ্ণ গান ছাড়া আর কোন সুর পান্দিওনের কানে পৌঁছয়নি, তাই আজ সে অলক্ষ্যে বড় জানলাটার কাছে এগিয়ে গেল। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগল ভিতরে কী হচ্ছে।

লোকভর্তি বড় ঘর থেকে এসে পৌঁছল সুগন্ধি তেলের তীব্র গন্ধ। দেয়াল স্তম্ভ আর জানলাগুলো টাটকা ফুলের মালা দিয়ে সাজান, তার মধ্যে অধিকাংশই পদ্ম। আসনের কাছে নিচু চৌকির উপর উজ্জ্বল রঙের পানপাত্র আর ফলের আধার। সুরা আর সুগন্ধি প্রলেপের ঘোরে উত্তেজিত অতিথিরা দেয়ালের কাছে ভীড় করে। স্তম্ভগুলির মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় ধীরে ধীরে নাচছে লম্বা পোষাক পরা মেয়েরা। অসংখ্য সরু সরু বেণীতে বাঁধা কালো চুল দুলছে নর্তকীদের কাঁধের কাছে। হাতে তাদের রঙিন পুঁতির চওড়া বালা। বিচিত্র বন্ধনী চমক দিচ্ছে তাদের পাৎলা পোষাকের ভিতর থেকে। পান্দিওন নজর না করে পারল না যে, মিশরী নর্তকীদের চেহারা যেন একটু কাঠ কাঠ। তার নিজের দেশের সবল শক্তিশালী মেয়েদের সঙ্গে এদের অনেক তফাৎ। ঘরের এক কোণে মিশরী তরুণীরা নানা রকম যন্ত্র বাজাচ্ছে: দুটি মেয়ে বাজাচ্ছে বাঁশি, আরেকজন বহুতারবিশিষ্ট হার্প, আরো দুটি মেয়ে লম্বা দোতারযন্ত্রে তীব্র কাঁপা আওয়াজ তুলে চলেছে।

নর্তকীদের হাতে উজ্জ্বল ব্রোঞ্জের পাতা। মাঝে মাঝে হঠাৎ নাচের সংগীতের তাল ভেঙে দিয়ে তারা পাতাগুলো একবার বাজাচ্ছে। সুরের হঠাৎ উঁচু থেকে নিচে নেমে আসা তারপর দ্রুত সদা পরিবর্তিত লয়ের এরকম সুরে পান্দিওন অভ্যস্ত নয়। নাচ শেষ হল। ক্লান্ত নর্তকীরা জায়গা ছেড়ে দিল গাইয়েদের। মন দিয়ে শুনতে শুনতে গানের কথাগুলো ধরার চেষ্টা করতে লাগল পান্দিওন। দেখল যে নিচু পর্দার ঢিমা লয়ের গানগুলোর ভাষা সে ধরতে পারে।

প্রথম গানটায় বলা হয়েছে কেম্‌তের দক্ষিণে যাওয়ার কথা। "সেখানে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হবে, সে তোমায় দেবে তার বুকের ফুলের অর্ঘ্য।" পান্দিওন বুঝতে পারল।

আরেকটা গানে কেম্‌ত সন্তানদের সামরিক বীরত্বের গৌরব গাওয়া হয়েছে। তার ভীষণ জটিল আর ক্লিষ্ট অভিব্যক্তি পান্দিওনের কাছে অর্থহীন ঠেকল। বিরক্তিভরে সে চলে এল জানলা ছেড়ে।

"বীরের নাম সর্বদা অমর হয়ে থাকবে —" গানের শেষ কথাগুলো তার কানে এল। ঠিক তারপরেই হৈহুল্লোড় আর হাসির শব্দ। পান্দিওন আবার জানলার দিকে তাকাল।

ক্রীতদাসরা একটি ছোট করে ছাঁটা ঢেউখেলান চুল ফর্সা মেয়েকে নিয়ে এসে ঘরের মাঝখানে ঠেলে দিল। মেয়েটি থতমত খেয়ে ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল নর্তকীদের মাড়িয়ে যাওয়া ফুলের মাঝখানে। ভীড় ছেড়ে একজন লোক এগিয়ে এসে মেয়েটিকে কী যেন ধমকে বলল। অত্যন্ত বাধ্য ভাবে সে তুলে নিল তার দিকে বাড়িয়ে দেওয়া হাতির দাঁতের লিউট। লিউটের তারের উপর খেলে বেড়াতে লাগল তার ছোট্ট হাতের আঙুলগুলো। মেয়েটির পরিষ্কার মৃদু গলা রণিত হওয়া মাত্র চুপ হয়ে গেল সারা ঘর। মিশরীদের কাটা কাটা, হঠাৎ ওঠা হঠাৎ নামা সুর এ নয়। এ গান বয়ে চলেছে স্বচ্ছন্দ গতিতে, করুণ সুরে। প্রথমে যেন ধীরে ধীরে আলাদা আলাদা জলের ফোঁটা ঝরে পড়ল। তারপর তারা একসঙ্গে মিলেমিশে চলতে লাগল ঢেউয়ের নিয়মিত উত্থান পতনের ভঙ্গীতে। ঢেউয়ের অনুচ্চ গর্জন আর অস্ফুটধ্বনি সবই তাতে মিশেছে। আর সেই সঙ্গে বয়ে এনেছে

বাঁধ না মানা দুঃখ। সে গান শুনে পান্দিওন চুপ করে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। সেই মোহিনী কণ্ঠস্বরের অবোধ্য শব্দে ফুটে উঠেছে অবাধ উন্মুক্ত সমুদ্রের তরঙ্গধ্বনি। আইগিপ্‌তসে সমুদ্র অজ্ঞাত অনাদৃত, কিন্তু পান্দিওনের কাছে তা অত্যন্ত আদরের। তার মনের যত লুকনো আবেগ হঠাৎ উৎসারিত হয়ে উঠতে পান্দিওন প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার সেই অতি আপনার মুক্তি বাসনা ফুটে উঠেছে মেয়েটির গানের ক্রন্দন ও বেদনায়। দুহাতে কান ঢেকে দাঁতে দাঁত চেপে কোন রকমে আকুল চীৎকারটাকে দমিয়ে রেখে বাগানের অন্য দিকে ছুটে গেল পান্দিওন, তারপর অবাধ্য কান্নায় লুটিয়ে পড়ল গাছের ছায়ায় মাটির উপর...

'ওহে এই, একুয়েশা, এদিকে এস!' পান্দিওনের মনিব চেঁচিয়ে উঠল। ভোজ পর্ব যে শেষ হয়ে গেছে পান্দিওন তা খেয়াল করেনি।

ফারাওয়ের ভাস্করের তখন বেশ মত্ত অবস্থা। পান্দিওনের উপর ভর দিয়ে সে চলেছে, অন্য দিক থেকে তাকে ধরে রেখেছে আর একটি ক্রীতদাস — সে লোকটির জন্মই হয়েছে বন্দী দশায়। রাজভাস্করের ইচ্ছা পাল্কীতে না উঠে হেঁটে বাড়ি ফেরে।

রাস্তার উঁচুনিচুতে হোঁচট খেতে খেতে অর্ধেক পথ এসে রাজভাস্কর হঠাৎ পান্দিওনের খুব প্রশংসা করতে লাগল। বার বার বলতে লাগল, পান্দিওনের সামনে পড়ে আছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। পান্দিওনের মনে তখনো গানের রেশ লেগে রয়েছে, রাজভাস্করের কথা তার কানে প্রায় পৌঁছলই না। এই ভাবেই তারা রাজভাস্করের বাড়ির রঙিন পোর্টিকো পর্যন্ত এসে পৌঁছল। আলো হাতে দুটি দাসীকে নিয়ে দরজার কাছে বেরিয়ে এল ভাস্করের স্ত্রী। রাজভাস্কর টলতে টলতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে পান্দিওনের কাঁধ চাপড়ে দিল। পান্দিওন আবার পথে নেমে এল, কারখানার কোন ক্রীতদাসের বাড়িতে ঢোকার অনুমতি নেই।

'এক মিনিট দাঁড়াও একুয়েশা!' ধূর্ত হাসির ভাব মুখে আনার চেষ্টা করে সোল্লাসে বলে উঠল রাজভাস্কর। 'দে!' একজন দাসীর হাত থেকে আলোটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে তাকে ফিসফিস করে কী যেন বলল সে। মেয়েটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পান্দিওনকে দরজা দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে রাজভাস্কর তাকে বসার ঘরে নিয়ে গেল। বাঁ দিকে দুটো জানলার মাঝখানে একটা সুন্দর কালো-লাল রঙের নক্সা তোলা ফুলদানি। ওজাতের ফুলদানি পান্দিওন ক্রীটে দেখেছে। তাই সেটা চোখে পড়তেই তার বুক আবার ব্যথিয়ে উঠল।

'মহারাজাধিরাজ, জীবন, স্বাস্থ্য, শক্তি,'* মন্ত্রোচ্চারণের মতো গম্ভীরভাবে বলল রাজভাস্কর, 'আদেশ দিয়েছেন, তোমাদের সমুদ্রাঞ্চল থেকে আনা এই ফুলদানির মতো সাতটা ফুলদানি আমায় বানাতে হবে। কেবল ঐ গেঁয়ো রঙের জায়গায় বসাতে হবে তা-কেমের প্রচলিত নীল রং ... এ কাজ যদি ভাল করতে পার তাহলে বড়বাড়িতে তোমার কথা আমি বলব ...আর এখন ...' গলাটা চড়িয়ে রাজভাস্কর তাকাল দ্রুত এগিয়ে আসা দুটি ছায়া শরীরের দিকে।

তারা হল রাজভাস্করের দুই দাসী, একটি সেই যে তার আদেশে চলে গিয়েছিল আর একটি নতুন মেয়ে। গায়ে তার লম্বা বিচিত্র জোব্বা।

'কাছে এস,' রাজভাস্কর অধীর হয়ে উঠে জোব্বা পরা মেয়েটির মুখের কাছে আলোটা তুলে ধরল।

পান্দিওনের দিকে সভয়ে তাকিয়ে রইল মেয়েটির বড় বড় কালো চোখদুটি। ফোলা ফোলা ছেলেমানুষী ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে পড়ল দীর্ঘনিঃশ্বাস। জোব্বার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আছে তার ঢেউখেলান কালো চুল। ছোট্ট সুন্দর সরু নাকটি কাঁপছে। দাসীটি নিশ্চয়ই এশিয়া থেকে এসেছে। পুবদেশী কোন উপজাতির মেয়ে।

'দেখ একুয়েশা,' কম্পিত অথচ জোরাল হাতে মেয়েটির জোব্বাটা টেনে খুলে ফেলে রাজভাস্কর বলল।

ক্ষীণ স্বরে চীৎকার করে উঠে মেয়েটি দুহাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইল সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়।

'একে তুমি বিয়ে কর,' পান্দিওনের দিকে মেয়েটিকে ঠেলে দিয়ে

---

* জীবন, স্বাস্থ্য, শক্তি — ফারাওয়ের সম্মানসূচক এই তিনটি কথা প্রাচীন মিশরে তাঁর নামোল্লেখের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল।

বলল রাজভাস্কর। মেয়েটি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে পান্দিওনের বুক ঘেঁষে দাঁড়াল।

পান্দিওন একটু পিছিয়ে এসে তরুণী বন্দিনীর জটপাকানো চুলে হাত বুলিয়ে দিল। মন তার ভরে উঠল ভীত সুন্দর প্রাণীটির জন্য করুণা আর মমতায় ভরা এক মিশ্রিত আবেগে।

রাজভাস্কর হাসিমুখে পরম খুসিতে তুড়ি দিল।

'একুয়েশা, এ মেয়েটি তোমার। তোমাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়ে হবে। তারা হবে আমার ছেলেমেয়েদের সম্পত্তি...'

পান্দিওনের ভিতরে কোথায় যেন হঠাৎ একটা জ্যাবদ্ধ তীর ছুটে গেল। মনের ভিতর যে বিদ্রোহ অনেক দিন থেকে জমে উঠছিল, আজকের সন্ধ্যার সেই গানে উত্তেজিত হয়ে তা এবার চরমে পেঁছিল। চোখের সামনে দেখা দিল লাল কুয়াশা।

মেয়েটির কাছ থেকে সরে এসে পান্দিওন ঘরের চারপাশটা দেখে নিয়ে ঘুঁষি পাকাল। সঙ্গে সঙ্গে নেশা কেটে গেল রাজভাস্করের। বাড়ির ভিতর পালিয়ে গিয়ে সে চাকরবাকরদের চেঁচামেচি করে ডাকাডাকি করতে লাগল। ভীতু লোকটার দিকে একবারও না তাকিয়ে পান্দিওন তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ক্রীট থেকে আনা সেই দামী ফুলদানিটায় ভীষণ জোর এক লাথি কসিয়ে দিল। ফুলদানির টুকরোগুলো ভারী শব্দে ঝরে পড়ল মেঝের উপর।

বাড়িতে তখন হৈচৈ, দৌড়োদৌড়ির শব্দ। কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেল পান্দিওন তার মনিবের পায়ের কাছে পড়ে আছে। মনিব ঝুঁকে পড়ে তার গায়ে থুতু ফেলতে ফেলতে চেঁচিয়ে গালাগাল করছে আর ভয় দেখাচ্ছে।

'নচ্ছার, হতভাগাটার মরাই উচিত। ওর প্রাণের চেয়ে ভাঙা ফুলদানিটার দাম অনেক বেশি, কিন্তু বেটা অনেক কিছু সুন্দর জিনিস তৈরী করতে পারে ... এরকম ভাল কারিগরকে হারাতে আমি রাজী নই,' ঘণ্টাখানেক পরে রাজভাস্কর তার স্ত্রীকে বলল। 'ওকে প্রাণে মারব না। কয়েদখানায়ও পাঠাব না, সেখান থেকে ওকে সোনার খনিতে চালান করে দেবে।

সেখানে গেলে ও নিশ্চয় মরবে। ওকে আবার শেনেতেই পাঠিয়ে দেব। সব কিছু ভেবে চিন্তে দেখুক। বীজ রোপণের সময় ফের নিয়ে আসব ...'

পান্দিওন — প্রচুর মার খেয়েও নত হবার পাত্র সে নয় — এইভাবে আবার শেনেতেই ফিরে এল। সেখানে তার পুরনো বন্ধু — এগ্রাস্‌কানদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে ভারী আনন্দিত হল। নির্মাণ কাজের পুরো দলটা মন্দির ভাঙা শেষ করে তখন আমোন উদ্যানে জল দেবার কাজে লেগেছে।

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে শেনের দরজা আবার যথারীতি ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে খুলে গেল। অন্য ক্রীতদাসদের সোচ্চারিত সানন্দ স্বাগতধ্বনির সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করল কিদগো। তার পিঠ চাবুকের ঘায়ে ফুলে উঠেছে, কিন্তু হাসিতে তার দাঁত চমকে উঠছে, চোখদুটোতেও খুসির আলো।

'তোমায় এখানে পাঠিয়েছে শুনলাম,' বিস্মিত পান্দিওনের উদ্দেশে বলে উঠল কিদগো, 'ও খবর পাওয়া মাত্র, কর্মশালার মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে হাতের কাছে যা কিছু পেলাম ভাঙতে সুরু করলাম। কিছু পিট্টি দিয়ে ওরা আমায়ও এখানে পাঠিয়ে দিল। সেটাই চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু তুমি তো ভাস্কর হতে চেয়েছিলে, তাই না?' পান্দিওন বিদ্রূপের স্বরে বলল।

হাতদুটো নেড়ে নিগ্রো ভীষণভাবে চোখ পাকিয়ে আইগিপ্‌তসের বিরাট রাজধানীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে থুক করে থুতু ফেলল।

মুক্তি সংগ্রাম

প্রচণ্ড রোদে তেতে ওঠা পাথরগুলোয় লোকের কাঁধ আর হাত পুড়ে যাবার জোগাড়। অল্প অল্প বাতাসে ভালর চেয়ে খারাপই হচ্ছে, উড়ে আসা পাথরের গায়ের বালিগুলো চোখ কেটে বসে যাচ্ছে।

ত্রিশজন ক্রীতদাস জটিল খোদাই কাজ করা একটা মস্ত ভারী টালি দড়িতে বেঁধে দেয়ালের উপর তুলছে। পরিশ্রমে তাদের প্রাণ বেরিয়ে

যাবার জোগাড়। মাটি থেকে প্রায় আট হাত উঁচুতে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় টালিটা বসাতে হবে। চারজন অভিজ্ঞ দক্ষ ক্রীতদাস তল থেকে পাথরটাকে ধরে রেখেছে। সে দলে পান্দিওনও রয়েছে। তার পাশের লোকটি মিশরী, শেনের নানাজাতের ক্রীতদাসদের মধ্যে মিশরী লোক এই একটিই। এক অজ্ঞাত ভীষণ অপরাধের জন্য সে আজীবন দাসত্বে দণ্ডিত। শেনের দক্ষিণ-পূব কোণের ভাল দিকটায় তার কুঠরি। তার বুক আর পিঠে লাইলাক রঙের দুটো বড় ক্রুশের মতো ছক মার্কা মারা, গালে একটা লাল সাপ আঁকা। বিষণ্ণ লোকটির মুখে কখনো হাসি দেখা যায় না, কারো সঙ্গে সে কথাও বলে না, নিজের এই ভয়াবহ অবস্থা সত্ত্বেও বিদেশীদের তার স্বাধীন দেশওয়ালাদের মতোই ঘৃণা করে।

এবারও লোকটি কারো দিকে না তাকিয়ে ন্যাড়া মাথাটা নুইয়ে দু হাতে ভারী পাথরটাকে ধরে আছে, পাথরটা যাতে নড়ে না যায়।

হঠাৎ পান্দিওনের চোখে পড়ল পাথরের সঙ্গে বাঁধা দড়িটার তন্তুগুলো প্রায় ছিঁড়তে সুরু করেছে। সে চেঁচিয়ে উঠে সবাইকে সাবধান করে দিল। দুজন ক্রীতদাস একপাশে লাফিয়ে সরে গেল। মিশরী লোকটি কিন্তু পান্দিওনের কথা কানেই তুলল না। মাথার উপর কী ঘটছে তার চোখে পড়েনি — ভারী পাথরটার নিচেই সে দাঁড়িয়ে রইল।

ডান হাতটা জোরে বাড়িয়ে দিয়ে পান্দিওন লোকটির বুকে এমন এক ধাক্কা মারল যে, লোকটি ছিটকে গিয়ে বিপদের বার হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় বাঁধন ছিঁড়ে পাথরটা নিচে পড়ল পান্দিওনের হাত একটু ঘেঁষে। মিশরী লোকটির মুখ তখন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দেয়ালের গোড়ায় পাথরটা ভীষণ জোরে পড়ল। খোদাইয়ের এক কোণ থেকে ভেঙে বেরিয়ে এল একটা বড় টুকরো।

পরিদর্শক তেড়ে এসে পান্দিওনের গায়ে চাবুক কসিয়ে দিল। জলহস্তীর চামড়ার দুআঙুল মোটা চৌকো চাবুকটা তার মাজায় কেটে বসে গেল। দারুণ যন্ত্রণায় তার চোখের সামনে সবকিছু ঘোলাটে হয়ে গেল।

'নচ্ছার হতভাগা, ঐ পচামাংসটাকে তোর বাঁচাতে যাবার কী দরকার ছিল?' পান্দিওনের উপর আরেক ঘা কসিয়ে দিয়ে পরিদর্শক চেঁচিয়ে উঠল, 'নরম শরীরের উপর পড়লে পাথরটা বেঁচে যেত! তোদের একশটার প্রাণের চেয়ে ঐ খোদাই কাজের দাম অনেক বেশি!'

পান্দিওন পরিদর্শককে ঠিক তেড়ে যেত, কিন্তু কয়েকটি যোদ্ধা ছুটে এসে তাকে নির্মমভাবে পেটাতে লাগল।

রাত্তিরে কুঠরিতে পান্দিওন মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। ভীষণ জ্বর। চাবুকের গভীর ক্ষতে পিঠ কাঁধ পিছন পা সব ফুলে উঠেছে। কিদগো গুড়ি মেরে এসে তাকে জল খেতে দিল। মাথা ধুইয়ে দিল কয়েক বার।

দরজার বাইরে একটা খসখস শব্দ। ফিসফিস করে কে যেন বলে উঠল:

'একুয়েশা আছ?'

পান্দিওন সাড়া দিতে অন্ধকারের মধ্যে তার গায়ে ঠেকল একটা হাত।

সেই মিশরী লোকটি। কোমরবন্ধ থেকে একটা ছোট্ট কুঁজো খুলে অনেকক্ষণ ধরে হাতের তেলোতে কী যেন ডলতে লাগল। তারপর সযত্নে পান্দিওনের ক্ষতের উপর হাত বুলিয়ে মাখিয়ে দিল তীব্র বিশ্রী গন্ধ একরকম মলম। যন্ত্রণায় পান্দিওন শিউরে উঠল, কিন্তু মিশরীটি দৃঢ় হাত বুলিয়েই চলল। লোকটি যখন পান্দিওনের পায়ে মলম লাগাতে সুরু করেছে, পিঠের ব্যথা তখন মরে গেছে। কয়েক মিনিট পরেই পান্দিওন ঘুমিয়ে পড়ল।

'কী করলে বল তো?' ঘরের কোণ থেকে বলে উঠল অদৃশ্য কিদগো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মিশরীটি বলল:

'এ হচ্ছে "কিফি", চমৎকার মলম। এ মলম তৈরীর গোপন প্রক্রিয়া একমাত্র পুরুতরাই জানে। আমার মা এক যোদ্ধাকে মোটা ঘুষ দিয়ে এটা এখানে আনেন।'

'তুমি লোকটি ভাল। আগে তোমায় খারাপ ভেবেছিলাম বলে কিছু মনে কর না!' কিদগো বলল।

মিশরী লোকটি কী যেন বলল অস্পষ্টভাবে। তারপর নীরবে অন্ধকারে বেরিয়ে গেল।

তারপর থেকে মিশরীটি পান্দিওনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলল, কিন্তু তার সঙ্গীদের সে আগেকার মতো অবহেলা করে চলত। এখন প্রায়ই পান্দিওন তার ঘরের দরজায় খড়মড় আওয়াজ শুনতে পায়। সে একা থাকলে গুড়ি মেরে ঘরে ঢোকে রোগা ঢ্যাঙ্গা মিশরীটি। তা-কেমের এই নিঃসঙ্গ নিষ্ঠুর লোকটি তার ব্যথার দরদী পান্দিওনের কাছে মন খুলে কথা বলে। তার ইতিহাস কয়েক দিনের মধ্যেই পান্দিওনের জানা হয়ে গেল।

'চাঁদের ছেলে' ইয়াখ্‌মসের জন্ম এক পুরনো 'নেজেস' পরিবারে। নেজেসরা হল প্রাচীন ফারাওদের বিশ্বস্ত ভৃত্য, কিন্তু রাজবংশের পরিবর্তনের ফলে পদ আর বিত্ত দুইই খুইয়েছে। ইয়াখ্‌মস ভালোভাবেই লেখা পড়া করেছিল। খরগোশ প্রদেশপাল তাকে কেরাণীর কাজে নিযুক্ত করেন। ঘটনাক্রমে ইয়াখ্‌মস এক স্থপতির মেয়ের প্রেমে পড়ে। মেয়ের বাপ বলে জামাই হওয়া চাই বেশ পয়সাওয়ালা লোক। মেয়েটির প্রেমে ইয়াখ্‌মসের মাথার ঠিক থাকে না। যেন তেন প্রকারে টাকা করতে সে উঠে পড়ে লেগে যায়। তাড়াতাড়ি বড়লোক হয়ে ওঠার জন্য রাজাদের সমাধি লুণ্ঠন সুরু করে। এই সাংঘাতিক অপরাধের কঠোর শাস্তি। ইয়াখমস চিত্রলিপি জানে, এ ব্যাপারে সেটা তার বেশ কাজে লাগে। কয়েকদিনের মধ্যেই ইয়াখ্‌মস অনেক সোনা হাতিয়ে নেয়। কিন্তু এর মধ্যেই সেই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় দূর দক্ষিণের এক রাজকর্মচারীর।

খানাপিনা আর রক্ষিতায় ইয়াখ্‌মস তার দুঃখ ভুলতে চাইল। দেখতে দেখতে উড়ে গেল টাকাপয়সা। ধনার্জনের কুপন্থা তার জানাই ছিল। আবার সে সুরু করল চুরিডাকাতি। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল। সইতে হল ভীষণ অত্যাচার। সঙ্গীদের কারো প্রাণদণ্ড হল, কেউবা

অত্যাচারেই মারা গেল। ইয়াখ্‌মসকে নির্বাসনে পাঠান হল সোনার খনিতে। প্রতি বছর একবার করে বন্যার সময় সোনার খনিতে নতুন দল পাঠান হয়। ততদিন ইয়াখ্‌মসকে একটা শেনেতে রাখা হল, কারণ প্‌তা'র মন্দিরের নতুন দেয়াল গড়ার কাজে মজুর কিছু কম পড়েছিল।

ইয়াখ্‌মসের কাহিনী আগ্রহভরে শুনতে শুনতে পান্দিওন লোকটির বীরত্ব আর সাহসের পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেল। বাইরে থেকে দেখে লোকটাকে মোটেই বীর বা সাহসী বলে মনে হয় না।

ইয়াখ্‌মস মাটির তলার ভয়াবহ গোলকধাঁধার অভিজ্ঞতার কথা বলল। নির্মাতাদের ধূর্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী জালে সেখানে অবাঞ্ছনীয় অতিথির জন্য প্রতি পদে মৃত্যু অপেক্ষা করছে।

বিরাট বিরাট পিরামিডের নিচে যে সব প্রাচীনতম সমাধি আছে তাদের ধনরত্ন আর রাজার শবাধার রক্ষা করার জন্য ঢালু সুড়ঙ্গের মুখে বড় বড় জগদ্দল পাথর বসান থাকে। পরবর্তী সমাধিগুলোতে রয়েছে ভুয়ো অলিন্দের গোলকধাঁধা, সে অলিন্দে জায়গায় জায়গায় পালিশ-করা দেয়াল, গভীর কুয়ো। চোরে সমাধির পাথর সরাতে গেলেই উপর থেকে এসে পড়ে বিরাট সব চাঙ্গড়, বালির গাদা, চোরেদের সামনে এগোবার পথ যায় বন্ধ হয়ে। তবু যদি কেউ সাহস করে আরো ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে তবে কুয়ো থেকে প্রচুর মাটি ঝরে পড়ে, বালির ঢিবি আর সদ্য পড়া পাথর মাঝখানের সরু পথেই চোরকে কবর দিয়ে দেয়। আরো পরের কালের সমাধিগুলোয় আছে একধরনের পাথরের জাঁতাকল। সেই জাঁতাকল অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে এসে চোরকে পিষে ফেলে। নয়ত আছে ধারাল বর্শার ফলা লাগান ফ্রেম। চোর মেঝের একটা বিশেষ মারাত্মক পাথরে পা দেওয়া মাত্রই ফ্রেমটা উপর থেকে নিচে এসে পড়ে। শিকারের জন্য হাজার হাজার বছর ধরে নিঃশব্দে ওত পেতে বসে থাকা বহু বিভীষিকার কথাই ইয়াখ্‌মস জানে। এই ভীষণ কাজে নিহত বহুলোকের অবস্থা দেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। কোন অজ্ঞাত অতীতে প্রাণহারান অজানা লোকের গলিত শব সে অনেকবারই দেখেছে।

পশ্চিম মরুভূমির ধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে 'মৃতদের নগর'। ইয়াখ্মস তার সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে অনেক রাত্তির কাটিয়েছে। অন্ধকারে লুকিয়ে শেয়ালের ডাক, হায়েনার হাসি আর সিংহের ভয়ানক গর্জন শুনে তাদের পথ হাতড়ে চলতে হয়েছে। কথা বলা বা আলো জ্বালার সাহস হয়নি। সরু ছোট্ট হাঁপধরান পথ দিয়ে যেতে হয়েছে, একেকবার গভীরে লুকনো সমাধির আশায় পুরো পাহাড়ই এইভাবে পার হতে হয়েছে।

ও এক ভয়াবহ পেশা। জীবনের চেয়ে মৃত্যুর কথাই যারা বেশি ভেবেছে, চেষ্টা করেছে সজীব কীর্তির চেয়ে মৃতদের গৌরব চিরকাল রক্ষা করতে এ পেশা তাদেরই মানায়।

এই রোগা হাড়জিরজিরে অতি নগণ্য লোকটির গল্প পান্দিওন অবাক হয়ে শুনল। কয়েক মুহূর্তের প্রমোদের জন্য সে কতবারই না প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছে। লোকটিকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

'তুমি শেষ পর্যন্ত কেন এরকম জীবনযাত্রা চালিয়ে গেলে?' একদিন রাত্রে পান্দিওন তাকে জিজ্ঞেস করল। 'পালিয়ে গেলে না কেন?'

ইয়াখ্মসের মুখে ফুটে উঠল এক নীরব নিরানন্দ হাসি।

'কেম্‌ত রাজ্য বড় অদ্ভুত দেশ। তুমি বিদেশী, এ দেশকে বুঝতে পারবে না। আমরা সবাই এখানে বন্দী — শুধু ক্রীতদাসরা নয়, কালো রাজ্যের স্বাধীন লোকেরাও। অনেক অনেক কাল আগে মরুভূমিই আমাদের রক্ষা করত। আজ তা-কেম মরুভূমির মাঝখানে পিষে যাচ্ছে — শক্তিশালী যোদ্ধার দল নিয়ে যারা দূর পাড়ি না দিতে পারে তাদের প্রত্যেকের কাছেই এদেশ একটা মস্ত বড় কয়েদখানা।

'পশ্চিমে মরুভূমি — মৃত্যুর রাজ্য। পুবদিকের মরুভূমিটা ভালরকম জলের ব্যবস্থা করে শুধু বিরাট কাফিলা নিয়েই পার হওয়া চলে। দক্ষিণে প্রতিকূল বন্যজাতির বাস। প্রতিবেশী সব রাজ্যেরই আমাদের দেশের উপর ভীষণ রাগ, এদেশের সমৃদ্ধি দুর্বল জাতির দুর্ভাগ্যের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে।

'তুমি তা-কেমের লোক নও। বিদেশে মরতে যে আমাদের কী

সাংঘাতিক ভয়, তা তুমি বুঝতে পারবে না। আমাদের এই হাঁপি উপত্যকায়, সর্বত্রই যার চেহারাটা এক, আমাদের পূর্বপুরুষরা হাজার হাজার বছর ধরে বসবাস করেছেন, জমি চাষ করেছেন, খাল কেটেছেন। দেশটাকে উর্বর করে তুলেছেন। আমাদেরও এখানেই বসবাস করে মরতে হবে। তা-কেম সারা জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। সেইটেই হচ্ছে আমাদের কাছে অভিশাপের মতো। লোকসংখ্যা খুব বেশি হলে মানুষের জীবনের আর কোন মূল্য থাকে না — অথচ অন্যদেশে গিয়ে বসবাস করার উপায় নেই। দেবতাদের আশিস্ প্রাপ্ত আমাদের জাতিকে অন্য দেশের লোকেরা ভালবাসে না ...'

'কিন্তু তুমি তো এখন ক্রীতদাস, এখন কি তোমার পালিয়ে যাওয়াই ভাল নয়?' পান্দিওন জিজ্ঞেস করল।

'একা আর এই মার্কা নিয়ে?' ইয়াখ্মস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'আমি এখন বিদেশীরও অধম... মনে রেখ একুয়েশা, এখান থেকে পালানর কোনই উপায় নেই। কেবল শক্তির জোরে সারা কালো রাজ্যটাকে যদি উলটপালট করে দেওয়া যায় তবেই তা সম্ভব। কিন্তু কে তা করবে বল? প্রাচীন কালে অবশ্য এরকম ঘটনা কিছু ঘটেছে ...' সখেদে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ইয়াখ্মস।

শেষ কথাগুলোয় পান্দিওনের মনে কৌতূহল জেগে উঠল। মিশরীকে সে প্রশ্ন করতে সুরু করল। প্রাচীন কালে মাঝে মাঝে যে সব বড়বড় দাস বিপ্লব সারা দেশে আলোড়ন তুলেছিল তার ইতিহাস ইয়াখ্মস পান্দিওনকে শোনাল। এ কথাও বলল, ক্রীতদাসদের সঙ্গে দেশের গরীব লোকরাও যোগ দেয়, কারণ তাদের অবস্থা অনেকটা ছিল ক্রীতদাসদেরই সামিল।

ক্রীতদাসদের সঙ্গে সাধারণ লোকদের যোগাযোগ মানা ছিল। ফারাওরা তাঁদের ছেলেদের বলে গিয়েছিলেন, "গরীব লোকে শেনের ক্রীতদাসদের বিদ্রোহের সুযোগ দেবে"।

কেম্তের গরীব লোকে, চাষী আর কারিগররা, নিজেদের রাস্তার সংকীর্ণ জগতেই বসবাস করে। অন্য লোকের সঙ্গে তাদের আলাপ

সালাপ প্রায় নেই বললেই হয়। সৈন্যদের সামনে তারা কেঁচো হয়ে থাকে, রাজকর্মচারীদের হুকুমের 'বাহক' তো তারাই। ফারাওরা চান লোকেরা তাঁদের খুবই বাধ্য হয়ে থাকুক আর প্রাণপণে খেটে চলুক। সামান্য অপরাধেই চলে প্রচণ্ড মারধর। দেশের উপর বিরাট বোঝার মতো চেপে আছে কর্মচারীদের বিরাট চক্র। দেশ ছেড়ে যাওয়া বা ভ্রমণে বেরন শুধু পুরোহিত আর সম্ভ্রান্ত ঘরের লোকেদের জন্য।

পান্দিওনের অনুরোধে ইয়াখ্‌মস চাঁদের আলোয় মেঝের উপর কেম্‌ত রাজ্যের মানচিত্র এঁকে দিল। তা দেখে পান্দিওন ভয়ে আঁতকে উঠল। তারা রয়েছে হাজার হাজার স্টেডিয়া লম্বা এক বিরাট নদীর উপত্যকার একেবারে মাঝখানে। উত্তর আর দক্ষিণে জল আর জীবন দুইই রয়েছে, কিন্তু এই জনাকীর্ণ বসতি আর তার অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি পেরিয়ে সীমান্তে পৌঁছন অসম্ভব ব্যাপার। দুপাশের মরুভূমিতে প্রহরী নেই, কিন্তু জীবন ধারণের কোন উপায়ও নেই।

কয়েকটা কাফিলার পথ আছে। সে পথে কুয়োও পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে কড়া পাহারা।

ইয়াখ্‌মস চলে যাবার পর পান্দিওন শুয়ে শুয়ে আপনা থেকেই পালানর মৎলবটা ভাবতে লাগল। সারা রাত্রি চোখে তার ঘুম এল না। সে বুঝতে পারল, সময় যত যাবে ততই পালান আরো অসম্ভব হয়ে উঠবে, অসহনীয় দাসত্বের ফলে তার শরীর হয়ে পড়বে আরো দুর্বল। পালানর ব্যাপারে ভাগ্য তাদেরই সহায় হবে যাদের সহ্যশক্তি আর গায়ের জোর অসাধারণ।

পরদিন রাত্রে পান্দিওন কাভির কুঠরিতে গিয়ে ইয়াখ্‌মসের কাছ থেকে সে যা কিছু জেনেছে সব বলল। কাভিকে সে আবার অনেক করে বোঝাল ক্রীতদাসদের বিদ্রোহী করে তুলতে। কাভি কোন উত্তর না দিয়ে দাড়ি চোমরাতে চোমরাতে কী যেন ভাবতে লাগল। পান্দিওন অবশ্য ভাল করেই জানে, বিদ্রোহের প্রস্তুতি অনেক আগেই সুরু হয়ে গেছে। নানা উপজাতিদল তাদের দলপতি বেছে নিয়েছে।

'আমার আর সহ্য হচ্ছে না, এত অপেক্ষা করার কী আছে?' পান্দিওন

সাগ্রহে উচ্চস্বরে বলে উঠল। তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরল কাভি। 'এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল,' একটু শান্ত হয়ে আগের চেয়ে ধীরস্থির ভাবে বলল পান্দিওন। 'অপেক্ষার কী আছে? অবস্থার কী বদলটা হবে বল? দশ বছর পরে যদি কিছু বদলে যায়, তখন আমাদের লড়াই করার, পালাবার ক্ষমতাও থাকবে না। কিসের ভয় তোমার, মরার?'

কাভি হাত তুলল।

'ভয় আমার নেই, সে কথা তুমি জান,' সে বলে উঠল, 'কিন্তু পাঁচশ লোকের জীবন নির্ভর করছে আমাদের উপর। তাদের বলি দেব, এই কি তুমি চাও? তোমার মৃত্যুর জন্য অনেক দাম দিতে হবে!'

হঠাৎ উঠতে গিয়ে নিচু সিলিংয়ে পান্দিওনের মাথাটা ঠুকে গেল।

'কথাটা ভেবে চিন্তে লোকেদের সঙ্গে আলাপ করে দেখব,' কাভি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কিন্তু দুঃখের কথা, আমাদের কাছাকাছি শুধু দুটো শেনে রয়েছে, অন্য শেনের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কাল রাত্রে আমরা আলাপ করে দেখব, তোমায় সব জানাব। কিদগোকেও আসতে বল...'

কাভির কুঠরি ছেড়ে চাঁদ ওঠার আগেই ইয়াখ্‌মসের ঘরে পেঁাছনর জন্য পান্দিওন দেয়ালের ছায়ায় ছায়ায় গুড়ি মেরে তাড়াতাড়ি এগোতে লাগল। ইয়াখ্‌মস তখনো ঘুময়নি।

'তোমার ঘরে গিয়েছিলাম,' উত্তেজিত গলায় ফিসফিস করে বলে উঠল মিশরী, 'কিন্তু তুমি ছিলে না। বলছিলাম কি...' ইয়াখ্‌মস আমতা আমতা করতে লাগল। 'কাল নাকি আমায় এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে; তিনশ লোককে মরুভূমির সোনার খনিতে পাঠান হচ্ছে। এই তো ব্যাপার — ওখান থেকে কেউ কখনো ফিরে আসে না...'

'কেন?'

'ওখানে যে সব ক্রীতদাসদের কাজ করতে পাঠান হয় তারা সাধারণত এক বছরের বেশি বাঁচে না। ওখানকার কাজের চেয়ে খারাপ কাজ দুনিয়ায় আর নেই। রোদে তাতা পাহাড়ের মধ্যে কাজ করতে হয়। হাওয়া প্রায় নেই। জলও খুবই সামান্য। কাজটা হল আবার খুবই শক্ত পাথর ভেঙে ঝুড়িতে করে আকর বয়ে আনা। সবচেয়ে শক্ত সমর্থ

লোকও সারাদিনের কাজের পর অবসন্ন হয়ে পড়ে। তাদের কান আর গলা দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে ... বিদায় একুয়েশা, তুমি বড় ভাল, যদিও বৃথাই আমার প্রাণ বাঁচালে। এরকম প্রাণ বাঁচানর তত মূল্য দিই না, মূল্য দিই দরদকে ... অনেক কাল আগে জীবনের তীব্র হতাশা আর নিষ্ঠুরতার ফলে আমাদের এক প্রাচীন কবি মৃত্যুর গৌরবগাথা রচনা করেছিলেন। সেই গান আজ আমি আবার গাইব ...

'"আমার কাছে মৃত্যু হল অসুস্থ লোকের রোগমুক্তি,"' ইয়াখ্মস গানের মতো করে বলে উঠল, '"সুন্দর দিনে বাতাসে পাল মেলে দেওয়া, পদ্মের সুরভি, বৃষ্টি ধোওয়া পথ, যুদ্ধের পর বাড়ি ফেরা ..."' ইয়াখ্মসের গলা কান্নার মতো আওয়াজে ভেঙে পড়ল।

ব্যথিত পান্দিওন এগিয়ে এল তার দিকে।

'কিন্তু তুমি তো নিজে হাতেই তোমার ...' পান্দিওন মাঝপথেই থেমে গেল।

ইয়াখ্মস হঠাৎ শিউরে উঠে তার কাছ থেকে সরে গেল।

'কী বলছ বিদেশী! তবে যে অনন্তকাল ধরে আমার কা* আমার বা'কে** অশেষ যন্ত্রণা দেবে — তা কি কখনো করতে পারি?..'

পান্দিওন কিছুই বুঝতে পারল না। তার দৃঢ় বিশ্বাস মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব যন্ত্রণা দূর হয়ে যায়। কিন্তু মিশরীর বিশ্বাসে সে ঘা দিতে চাইল না, তাই চুপ করে রইল।

শোবার খড়ের আঁটিটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে ইয়াখ্মস তার কুঠরির একটা কোণ খুড়তে লেগে গেল।

'এই যে, এই ছোরাটা নাও, যদি কখনো সাহসে কুলোয় ... আর এইটেও। কোন অলৌকিক উপায়ে যদি কখনো মুক্তি পাও তখন এই জিনিসটা তোমায় আমার কথা মনে পড়িয়ে দেবে।' একটা মসৃণ ঠাণ্ডা কী যেন ইয়াখমস পান্দিওনের হাতে তুলে দিল।

---

* কা — বুদ্ধির আত্মা বা মন।

** বা — জৈব বা শারীরিক আত্মা।

'কী এটা? এ দিয়ে আমি কী করব?'

'একটা পাথর। পাহাড়ে লুকনো একটা পুরনো মন্দিরের মাটির নিচের ঘরে পেয়েছিলাম।'

অতীতের স্মৃতিতে বর্তমানকে ভুলে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে ইয়াখমস খুসি হয়ে উঠল। পাথরের ইতিহাস সে বলে চলল। মহানদীর এক বাঁকে ধনদৌলতে ভরা সমাধির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এক রহস্যময় পুরনো মন্দিরে সে এসে পড়ে। রাজধানী উয়াসেতের বহু নিচে মন্দিরটা।

এক উপসাগরের ঘন ঝোপঝাড়ে লুকনো তীর থেকে একটা প্রাচীন পথের ছাপ খাড়া পাহাড়ে গিয়ে পড়েছে। ধারে কাছে কোন গ্রাম নেই। কোন লোক সেখানে আসে না, এই ন্যাড়া পাথুরে পাহাড়ে এসে চাষী বা রাখালদের কোন লাভ নেই।

অনুসন্ধানে তাই বিপদের কোন ভয় নেই দেখে বড় বড় পাথর ছড়ান একটা সংকীর্ণ গিরিসংকটের ভিতর ইয়াখমস ঢুকে পড়ে। পথটা গিয়েছিল নদী তীরে। বড় বড় পাথরগুলো পড়েছে পথটা পরিত্যক্ত হবার পর। ইয়াখমস অনেকক্ষণ ধরে পাথর, জলে ধোওয়া গর্ত আর কাঁটা ঝোপে ঘুরে বেড়ায়। গিরিসংকটটা মাকড়সায় ভর্তি। পথজোড়া মাকড়সার জাল রাজসমাধি লুণ্ঠনকারীর ঘামে ভেজা চটচটে মুখে এসে লাগতে থাকে।

গিরিসংকটটার অপর প্রান্তটা বেশ চওড়া। সেটা শেষ হয়েছে উঁচু পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকায়। মাঝখানে একটা ছোট্ট ঢিপি, তার চারদিকে দুসার খাল — বোঝা যায় এককালে বাগানে জল দেবার জন্য এখানে ঝর্ণা ছিল। কালো চকচকে পাহাড়ের দুর্ভেদ্য দেয়ালে ঘেরা হাঁপধরা বিষণ্ণ অন্ধকার উপত্যকার কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। যে গিরিসংকট দিয়ে ইয়াখ্‌মস এই সর্বজনবিস্মৃত জায়গায় এসেছে অন্যপ্রান্তেও ঠিক সেরকমেরই আরেকটা গিরিসংকট।

সমাধিচোর একটা টিলার মাথায় উঠে দেখতে পায় পাহাড়ের গায়ে একটা প্রবেশপথ। এতক্ষণ ঢিপিটার আড়ালে পড়ে ছিল। প্রবেশপথের

মুখটা পাথরে ঢাকা। বহু চেষ্টার পর ইয়াখমস পাথর সরিয়ে ভিতরে ঢোকে। ভিতরে অন্ধকার, ঠাণ্ডা গুহা। একটু জিরিয়ে নিয়ে সে তার সব সময়ের সঙ্গী আলোটা জ্বালিয়ে নেয়। তারপর মারাত্মক ফাঁদের জন্য দু পাশের মূর্তিগুলো ভাল করে নজর করতে করতে একটা উঁচু বারান্দা ধরে এগোতে থাকল। কিন্তু ফাঁদের ভয়টা অমূলক। হয় নির্মাতারা মন্দিরটা লোকচক্ষুর আড়ালে বলে কোন ফাঁদের ব্যবস্থা করেনি, নয়ত হাজার হাজার বছর পার হয়ে যাওয়ায় সেগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে। ইয়াখমস অবাধে এসে পেঁছিয় মাটির নিচের একটা বড় গোল ঘরে। ঘরটার মাঝখানে থৎ দেবের মূর্তি। তাঁর লম্বা ঠোঁট উঁচু বেদী থেকে নিচের দিকে বাড়ান। ঘরের চারদিকে সমান দূরত্বে দেয়াল কেটে সরু সরু দরজা করা হয়েছে। তাদের ভিতর দিয়ে অন্যান্য ঘরে যাওয়া যায়। ঘরগুলো আধপচা সব জিনিসে ভর্তি: পুঁথি, প্যাপিরাস আর ছবি আর লিপিতে ভরা কাঠের ফলক। একটা ঘরে বোঝাই করা শুকনো ঘাস, সে ঘাস ছোঁয়া মাত্র গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। আরেকটা ঘর শুধু পাথরে ভর্তি। ইয়াখমস আটটা ঘর ঘুরে দেখে, সব কটাই চৌকো। একটাতেও সে কৌতূহলজনক কিছুই খুঁজে পায় না। ন' নম্বর দরজাটা দিয়ে সে এসে পড়ে গ্রানিট স্তম্ভে ঘেরা লম্বা একটা ঘরে। স্তম্ভগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বড় কালো ডায়াবেস টালি, প্রাচীন তা-কেম ভাষায় তাদের গায়ে কী সব লেখা। ঘরের মাঝখানে লম্বাঠোঁট ইবিসমুখো থৎ দেবতার আরেকটা মূর্তি। মূর্তির বেদীর গায়ে একটা ব্রোঞ্জের পাত্র। তার মধ্যে একটা পাথর আলোর শিখায় চমকাচ্ছে। ইয়াখ্‌মস তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে আলোর আরো কাছে নিয়ে এসে ভাল করে দেখে। তারপর হতাশায় কাতরোক্তি করে ওঠে। চোরের অভিজ্ঞ চোখ প্রথম দৃষ্টিতে বুঝতে পারে, এ পাথরের তা-কেমে কোনই মূল্য নেই, বণিকরা তা কিনতে রাজী হবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইয়াখমস পাথরটা যতই চেয়ে দেখে ততই তার ভাল লাগতে থাকে। বর্শার ফলার আকারের চ্যাপ্‌টা পালিশ করা অসাধারণ স্বচ্ছ নীল-সবুজ রঙের একটা স্ফটিক। পাথরটা সম্বন্ধে ইয়াখমসের বড় কৌতূহল জেগে ওঠে। দেয়ালের লেখাগুলো পড়ে সে

পাথরের ইতিহাস জানার চেষ্টা করতে থাকে। প্রধান কেরাণীদের বিদ্যালয়ে তা-কেমের প্রাচীন ভাষা সে যা শিখেছিল তা ভোলেনি। শক্ত ডায়াবেসে খোদাই করা সুরক্ষিত চিত্রলিপি সে অনায়াসে পড়তে সুরু করে।

মন্দিরের হাওয়া চলাচলের পথ অনেককাল আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। ঘরে তাই হাওয়া খুব কম। আলো টিমটিম করতে শুরু করল। ইয়াখমস কিন্তু তবু একগুঁয়ের মতো পড়েই চলেছে। ক্রমশ খেওপোসের মহা পিরামিড নির্মাণের কিছু পরেই সংঘটিত এক বীরত্বের ইতিহাস এই পেশাদার সমাধিচোরের কাছে প্রকাশ পেল। ফারাও জেদেফ্রা* পৃথিবী আর মহাগোলার্ধ — মহাসমুদ্রের সীমা জানার জন্য তাঁর কোষাধ্যক্ষ বাউর্জেদকে অনেক দক্ষিণে তা-নুতের্ বা আত্মাদের রাজ্যে অভিযানে পাঠান। নীল জলের** তীরের সুউ জাহাজঘাটা থেকে সবচেয়ে বড় সাতটা জাহাজ নিয়ে বাউর্জেদ রওনা হন। সাত বছর তাঁরা কালো রাজ্যের বাইরে থাকেন। মহাগোলার্ধের ভীষণ ঝড়ে দলের অর্ধেক লোক আর চারটে জাহাজ খোয়া যায়। অন্যেরা অজানা উপকূল ধরে এগোতে এগোতে শেষ পর্যন্ত উপকথার পুন্ত্ রাজ্যে গিয়ে পৌঁছয়। ফারাওয়ের হুকুমে তাদের আরো দক্ষিণে যেতে হয়। পৃথিবীর সীমানা খুঁজে বের করতে তারা জাহাজ ছেড়ে স্থলপথেই দক্ষিণমুখো চলতে থাকে।

দুবছর ধরে তারা ঘন বন, বিরাট সমতল আর বিদ্যুতের আবাস উঁচু পাহাড় পেরিয়ে পৌঁছয় এক বড় নদীর তীরে। তাদের শক্তি তখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। নদীতীরে এক শক্তিশালী জাতির বাস, পাথরের মন্দির তারা তৈরী করে। এখানে এসে তারা জানতে পায়, পৃথিবীর প্রান্ত এখনো বহু দূরে, নীল ঘাসের প্রান্তর পেরিয়ে, রুপোলি পাতা গাছের বন ছাড়িয়ে, অনেক দক্ষিণে। সেইখানে, পৃথিবীর প্রান্তের ওপারে বয়ে চলেছে মহাগোলার্ধ — মহাসমুদ্র, যার শেষ কোথায় মানুষের তা জানা

---

* জেদেফ্রা — ৪র্থ রাজবংশের একজন ফারাও (খৃঃ পূঃ ২৮৭৭ — ২৮৬৯)।

** নীল জল — লোহিত সাগর। সুউ — আধুনিক এল-কোজেইর।

নেই। অভিযাত্রীরা বুঝতে পারে, ফারাওয়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সম্ভব নয়। তাই পুন্ত্ রাজ্যে ফিরে তারা মহাগোলার্ধের ঝড়ে বিধ্বস্ত ঘুণধরা জাহাজগুলোর বদলে নতুন জাহাজ বানিয়ে নেয়। একটা জাহাজের জন্য যতলোক প্রয়োজন তত লোক তখন আর বেঁচে নেই। তা সত্ত্বেও দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা পুন্তের উপহার উপঢৌকনে জাহাজ বোঝাই করে সেই অকল্পনীয় দুর্গম যাত্রায় পাড়ি দেয়। দেশে ফেরার আগ্রহে তারা পায় নতুন শক্তি। ঝড়ঝাপটা, বালির আঁধি, জলের তলে লুকনো পাহাড়, খিদে তেষ্টা সব কিছু জয় করে সাত বছর পর তারা নীল জলের সুউ বন্দরে পেঁছয়।

কালো রাজ্যে এর মধ্যে অনেক অদল বদল হয়েছে: নতুন অত্যাচারী ফারাও খাফ্র দ্বিতীয় বিরাট পিরামিড তৈরী করছেন হাজার হাজার বছর ধরে নিজের নাম অমর করে রাখার জন্য। অন্য কিছুর কথা ভাবার সময় নেই দেশের। অভিযাত্রীদের প্রত্যাবর্তনটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। পৃথিবী আর মহাসমুদ্র অপরিমেয় শুনে ফারাও তো অত্যন্ত হতাশ হলেন, তার উপর আবার দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা যেমন সংখ্যায় বেশি, তেমনি শক্তিশালী। ফারাও নিজেকে পৃথিবীর অধিপতি বলে মনে করতেন। বাউর্জেদ তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, কেম্ত রাজ্য হচ্ছে পৃথিবীর একটা ছোট্ট অংশ মাত্র। এই বিরাট পৃথিবী কত বন জঙ্গল, নদী নালায় ভরা। সেখানে কত রকমের প্রাণী আর ফলমূল, সবরকম কাজকর্ম আর শিকারে দক্ষ কত রকমের মানুষ।

ফারাওয়ের রাগ পড়ল অভিযাত্রীদের উপর আর বাউর্জেদের সঙ্গীদের নির্বাসনে পাঠান হল দূর প্রদেশে। তাদের যাত্রার উল্লেখ পর্যন্ত প্রাণদণ্ডের ভয় দেখিয়ে নিষিদ্ধ হয়ে গেল। জেদেফ্রার লেখায় আত্মাদের রাজ্যে এই দক্ষিণ অভিযানের উল্লেখ যেখানে যা ছিল সে সব মুছে ফেলা হল। বাউর্জেদকে ফারাওয়ের কোপানলে পড়তে হত, তার অভিযানের সব স্মৃতিও লোপ পেয়ে যেত। কিন্তু বিদ্যা শিল্প আর লিখনের দেবতা থৎ'এর এক বৃদ্ধ প্রাজ্ঞ পুরোহিতের দৌলতে সেটা ঘটেনি। এই পুরোহিতই পরলোকগত ফারাওকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অনুসন্ধানে উৎসাহ

দিয়েছিলেন, — বড় বড় পিরামিড করে রাজ্যের ভাঁড়ার শূন্য। তাই তিনি ফারাওকে উপদেশ দিয়েছিলেন নতুন ধনদৌলতের উৎস সন্ধানের। রা'র* পুরোহিতরা নতুন ফারাওয়ের রাজসভা থেকে তাঁকে তাড়িয়ে ছাড়ে। থতের লুকনো মন্দিরে তিনি বাউর্জেদকে আশ্রয় দেন। সে মন্দিরে ছিল নানা গোপন গ্রন্থ, নানা মানচিত্র; দূর দূর দেশের পাথর আর গাছগাছড়ার সংগ্রহ। পুরোহিতের আদেশে বাউর্জেদের মহান যাত্রার কথা পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ করে মাটির নিচের দুষ্প্রবেশ্য ঘরে রেখে দেওয়া হয়। কোনদিন নিশ্চয় দেশের সে জ্ঞানের দরকার হবে, সেই আশায়। দক্ষিণের মহানদীর ওপারে আরো অনেক দূরের এক দেশ থেকে বাউর্জেদ একটা নীলচে-সবুজ স্বচ্ছ পাথর নিয়ে আসেন। সে পাথর তা-কেমের লোকদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। এ জাতের পাথর পাওয়া যায় কেবল নীল সমতলে। তা-কেম থেকে সে দেশ মহানদীর দক্ষিণে তিন মাসের পথ। পৃথিবীর প্রত্যন্ত দেশের প্রতীক এই পাথরটি বাউর্জেদ থৎ দেবের কাছে অর্ঘ্য হিসাবে নিবেদন করেন। সেই পাথরটিই ইয়াখমস মূর্তির পায়ের কাছের বেদীতে পায়।

যাত্রার বিবরণ ইয়াখমস শেষ পর্যন্ত পড়তে পারেনি। সবে সে নীল জলের অতলে অভিযাত্রীদের দেখা অপূর্ব সব বাগানের কথায় এসেছিল, এমন সময় তার আলো যায় নিভে। বহুকষ্টে সে মাটির নিচের সেই ঘর থেকে বেরতে পারে কেবল সেই অসাধারণ পাথরটি সঙ্গে নিয়ে।

দিনের আলোয় দূর বিদেশের সেই স্ফটিকটি আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। ইয়াখমস পাথরটাকে কিছুতেই ছাড়তে পারেনি। পাথরটা কিন্তু তার সৌভাগ্য আনেনি।

পান্দিওনকে তার অনেক দূর দেশে ফিরতে হবে। এই পাথর নিয়ে বাউর্জেদ অজানা দূর প্রান্তর থেকে দেশে ফিরেছিলেন। পাথরটা পান্দিওনকেও তার যাত্রায় সাহায্য করবে, সেই আশাই ইয়াখ্মস জানাল।

---

* রা — সূর্যদেবতা, পিরামিড পর্বের মিশরীদের প্রধান দেবতা।

‘এই যাত্রার কথা তুমি আগে কিছুই শোননি?’ পান্দিওন জিজ্ঞেস করল।

‘না, কেম্‌তের সন্তানের কাছে সে ইতিহাস অজ্ঞাতই রয়ে গেছে,’ ইয়াখমস বলল। ‘পুন্‌ত্‌ আমাদের কাছে এখন অনেক দিনের পরিচিত দেশ। কেম্‌তের জাহাজ নানা সময়ে অনেকবার সে দেশে গেছে। তবে আরো দক্ষিণের অঞ্চলগুলো আমাদের কাছে এখনো রহস্যময় আত্মাদের রাজ্য রয়ে গেছে।’

‘ওসব দেশে যাবার জন্য আর কেউ চেষ্টা করেনি, তা কি কখনো হতে পারে? তোমার মতো অন্য কোন লোক ঐ শিলালিপি পড়ে লোকেদের জানায়নি?’

ইয়াখমস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। বিদেশী লোকটির কথার কী উত্তর দেবে তা ভেবে পায় না।

‘তা-কেমের দক্ষিণ প্রদেশগুলোর শাসক, দক্ষিণের অধিপতিরা প্রায়ই দেশের আরো ভিতরে ঢুকেছেন, কিন্তু তাঁরা কেবল ফারাও’র কাছে পাঠানো তাঁদের হাতির দাঁত, সোনা আর ক্রীতদাসের উপঢৌকনের কথাই লিখেছেন। পথটা তাই অজানাই রয়ে গেছে। পুন্‌তের আরো নিচে জাহাজ নিয়ে কেউ যাবার চেষ্টা করেনি, খুবই বিপজ্জনক যাত্রা — প্রাচীন কালের মতো সাহসী লোক এখন আর পাওয়া যায় না।’

‘কিন্তু শিলালিপিগুলো কেন আর কেউ পড়ল না?’ সেই এক কথা পান্দিওন আবার জিজ্ঞেস করল।

‘তা জানি না... এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না,’ ইয়াখমস স্বীকার করল।

ইয়াখমস সত্যি জানত না, যে পুরোহিতদের সবাই মহাপণ্ডিত বলে জানে, প্রাচীন কালের গোপন কথা তাদের নখদর্পণে বলে মনে করে, তারা বহুদিন আগেই সে সব গুণ হারিয়েছে। জ্ঞানের অবনতি হয়েছে ধর্ম আচার আর যাদুমন্ত্রে। প্রাচীন কালের জ্ঞানের স্বাক্ষর যে প্যাপিরাস, তারা পচছে সমাধির ভিতর। মন্দিরগুলো পরিত্যক্ত জীর্ণ। কঠিন পাথরের গায়ে লেখা দেশের যে ইতিহাস পড়ে রয়েছে তাদের প্রতি

কারো ঔৎসুক্য আগ্রহ কিছুই নেই। ইয়াখমস জানত না, জনগণের সতেজ সপ্রাণ সংস্পর্শ থেকে সরে এলে শুধু দীক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজনের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ সবরকম জ্ঞান বিজ্ঞানেরই এরকম হাল হতে বাধ্য ...

ভোর হয়ে আসছে। দুঃখের সঙ্গে পান্দিওন বিদায় জানাল হতভাগ্য মিশরীকে। ইয়াখমসের আর বাঁচার কোনই আশা নেই।

পান্দিওন শুধু ছুরিটা নিয়ে পাথরটা ইয়াখমসকে ফেরৎ দিতে চাইল।

ইয়াখমস বলল, 'আমার যে আর কিছুরই দরকার নেই, সেকথা কি বুঝতে পারছ না? শেনের এই গহ্বরে এমন সুন্দর পাথরটা কেন ফেলে রাখব?'

ছোরাটা দাঁতে চেপে ধরে পাথরটা হাতে নিয়ে ছায়ায় গুড়ি মেরে পান্দিওন তার কুঠরিতে তাড়াতাড়ি ফিরে এল।

ভোরের আলো ফুটে ওঠা পর্যন্ত সে ঘুমল না। গালদুটো তার জ্বলছে, সারা গায়ে কাঁপুনি। শুয়ে শুয়ে সে তার জীবনের কী পরিবর্তন আসছে, সে কথাই ভাবতে লাগল। দুঃখ আর হতাশার একটানা একঘেয়ে ক্লান্তিকর দিনগুলো শীগ্‌গীরি শেষ হয়ে আসার সম্ভাবনা এবার দেখা দিয়েছে।

তার কুঠরিতে ঢোকার ফুটোটা এল ধূসর হয়ে। ক্রমশ অন্ধকারের ভিতর থেকে ফুটে উঠল তার সামান্য আসবাবপত্র। সকালের আলোয় পান্দিওন তুলে ধরল ছোরাটা। কালো ব্রোঞ্জের* চওড়া ফলার দুটো ধার অত্যন্ত ধারাল, মাঝখানটা একটু উঁচু। বিরাট বাঁটটা সিংহীর আকারে খোদাই করা, সে সিংহী হিংস্র দেবী শেখমেৎ। ছোরা দিয়ে দেয়ালের নিচে একটা গর্ত করে পান্দিওন উপহারটাকে লুকিয়ে রাখতে যাবে এমন সময় হঠাৎ

---

* কালো ব্রোঞ্জ — তামা আর দুর্লভ ধাতুর খাদ। প্রাচীনকালের ধাতুবিদরা ব্রোঞ্জের সঙ্গে দস্তা, ক্যাড্‌মিয়াম আর অন্য ধাতু মিশিয়ে অসাধারণ শক্ত খাদ তৈরী করতে পারতেন।

মনে পড়ে গেল পাথরটার কথা। খড়ের মধ্যে হাতড়ে সেটাকে পাওয়া গেল। আলোয় ধরে পান্দিওন ভালো করে দেখতে লাগল পাথরটাকে।

গোল ধার চ্যাপ্টাবুক স্ফটিকটা আকারে বর্শা ফলার সমান। শক্ত অত্যন্ত পরিষ্কার আর স্বচ্ছ। ভোরের আগের আধঅন্ধকারে তার রং ধূসর-নীল।

হাতের তেলোর উপর পাথরটা রাখতেই উদয়সূর্যের আলো এসে হঠাৎ পাথরটার গায়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পাথরটার চেহারা বদলে গেল — পান্দিওনের হাতের তেলোয় জ্বলতে লাগল ভাস্বর জ্যোতিতে। তার নীলচে-সবুজ রং অপ্রত্যাশিত খুসিতে দীপ্ত। উজ্জ্বল আর গভীর সেই রঙে টলটলে সোনালি মদের উত্তাপের ছোঁয়াচ। পাথরটার আয়নার মতো বুক নিশ্চয়ই কেউ ঘষে তৈরী করেছে।

পাথরটার রং দেখে পান্দিওনের মনে পড়ে গেল অত্যন্ত পরিচিত কিছুর কথা। তার দীপ্তি পান্দিওনের বিষণ্ণ মনে উত্তাপ সঞ্চার করল। সমুদ্র! ঠিক সেই রং তীর থেকে অনেক দূরে, মেঘমুক্ত নীল আকাশের মাঝখানে যখন সূর্য জ্বলে। ভাগ্যহীন ইয়াখমস পাথরটার নামকরণ করেছে নুতুর আয়ে — দৈব পাথর।

নিরানন্দ দিনের সকাল বেলায় স্ফটিকের এই অলৌকিক বিচ্ছুরণ পান্দিওনের শুভ লক্ষণ বলে মনে হল।

সত্যিই ইয়াখমসের বিদায় উপহারদুটি চমৎকার। একটা ছোরা আর একটা পাথর — শেষটার গুণ জানা নেই। পান্দিওনের বিশ্বাস পাথরটা তার সমুদ্রে ফিরে যাবার বার্তা বয়ে এনেছে। সমুদ্র তার সঙ্গে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাকে মুক্তি দেবে, দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। পান্দিওন একাগ্রচিত্তে পাথরটার দিকে চেয়ে রইল — পাথরের স্বচ্ছ গভীরতায় দুলছে তার নিজের দেশের সমুদ্রের ঢেউ ...

ঢাকের ভয়াবহ নিনাদ ফেটে পড়ল, ক্রীতদাসদের ঘুম ভাঙাবার সংকেত।

মুহূর্তের মধ্যে পান্দিওন ঠিক করে ফেলল, এই অসাধারণ পাথরটিকে সে কখনোই ছেড়ে থাকবে না, মুক্ত সমুদ্রের প্রতীক এই

পাথরটিকে রেখে যাবে না শেনের ধুলোভরা মাটিতে। পাথরটা সবসময় তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে।

কয়েক বার ব্যর্থ চেষ্টার পর পাথরটাকে সে কোনরকমে তার নেংটির ভিতর লুকিয়ে রাখল। তারপর তাড়াতাড়ি ছোরাটাকে মাটিতে পুঁতে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু তবুও আরেকটু হলেই সকালের খাবারের জন্য তার দেরী হয়ে যেত।

পথ চলতে চলতে আর কাজের সময় পান্দিওন কাভির উপর নজর রাখতে লাগল। দেখল সে থেকে থেকেই পান্দিওনের চেনা শেনের দলপতিদের একেকজনকে তাড়াতাড়ি করে কী যেন বলছে, তারাও সমান সংক্ষিপ্ত ভাষায় তার জবাব দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাভির কাছ থেকে সরে গিয়ে সঙ্গীদের কী যেন জানাচ্ছে।

একটা সুবিধাজনক সময় বেছে নিয়ে পান্দিওন কাভির কাছে গিয়ে জুটল। কাভি তখন একটা পাথর ঘষে সমান করতে ব্যস্ত। মুখ না তুলেই সে কাজ করতে করতে ফিসফিস করে এক নিঃশ্বাসে দ্রুত বেগে বলল:

'আজ রাত্রে, চাঁদ ওঠার আগে, উত্তরের দেয়ালের শেষ প্রবেশপথে...'

পান্দিওন কাজে ফিরে গেল। শেনেতে ফেরার সময় পথে খবরটা সে কিদগোকে জানিয়ে দিল।

সন্ধ্যাটা পান্দিওনের অপেক্ষায় কাটল, বহুদিন সে এরকম উৎসাহ আর আনন্দ অনুভব করেনি, নিজেকে লড়াইয়ের জন্য এত প্রস্তুতও মনে হয়নি।

শেনে যেই চুপ হয়ে গেল, সান্ত্রীরা ঘুমে ঢুলতে লাগল, অমনি পান্দিওনের কুঠরির অন্ধকারে দেখা গেল কিদগোকে।

দুজনে তারা তাড়াতাড়ি গুড়ি মেরে দেয়ালের কাছে চলে গেল। তারপর কুঠরিগুলোর মাঝখানের সরু পথে বাঁক নিয়ে পেঁছিল উত্তরের দেয়ালে। সেইখানেই সবচেয়ে ঘন অন্ধকার।

এই দেয়ালের কাছে সান্ত্রীরা সাধারণত আসে না। পুব আর পশ্চিম দেয়াল থেকে কুঠরিগুলোর মাঝখানের পথ বরাবর চোখ রাখা অনেক

সোজা। তাই ফিসফিস করে আলোচনা করলে সান্ত্রীরা যে উপর থেকে শুনে ফেলবে, সে ভয় তাদের ছিল না।

অন্তত ষাটজন ক্রীতদাস দু সারে প্রবেশপথে দেয়ালের গায়ে পা লাগিয়ে মাথাগুলো একত্র করে শুয়েছিল। কাভি আর রেম্‌দ্‌ মাঝখানে। কাভি ফিসফিস করে পান্দিওন আর কিদগোকে ডাকল।

অন্ধকারে কাভির হাতটা ছুঁয়ে পান্দিওন ছোরাটা তার হাতে গুঁজে দিল। কিছু বুঝতে না পেরে ঠাণ্ডা ফলাটায় হাত বোলাতে গিয়ে কাভির হাত গেল কেটে। তারপর অস্ত্রটা সাগ্রহে চেপে ধরে ফিসফিস করে ধন্যবাদ জানাল।

অভিজ্ঞ যোদ্ধা কাভি অস্ত্রের জন্য কাঙাল হয়ে উঠেছিল, তাই ছোরাটা পেয়ে তার অত্যন্ত আনন্দ হল। এও বুঝল যে, এই দুর্মূল্য ছোরাটা তাকে দিয়ে পান্দিওন তাকে জ্যেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নিল, মুখে কিছুই না বলে তাকে দলপতি বলে মেনে নিল।

ছোরাটা পান্দিওন পেল কোথা থেকে সে কথা জিজ্ঞেস না করে সে ফিসফিস করে কথা বলতে সুরু করল। তার কথার মাঝে মাঝে দীর্ঘ ছেদ, কাছের লোকেরা যাতে সেই সময়ে দূরের সঙ্গীদের কানে তার কথা পৌঁছে দিতে পারে। দলপতিদের সভা সুরু হয়ে গেল—শেনের বন্দী পাঁচশ ক্রীতদাসের জীবন আর মুক্তির প্রশ্নের সমাধান করতে হবে।

কাভি বলল, বিদ্রোহ আর পিছিয়ে রাখা যায় না, ভবিষ্যতের অপেক্ষায় বসে থাকা নিরর্থক। ক্রীতদাসদের যদি নানা দলে আবার ভাগ করে ভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় তবে অবস্থাটা আরো খারাপ হয়ে উঠবে।

'আমাদের সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করছে শুধু আমাদের শক্তির উপর। কিন্তু কর্তারা আমাদের যে পরিমাণ প্রাণপাত করে খাটাচ্ছে তার ফলে সে শক্তি ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। বন্দীদশায় প্রতি মাসে আমাদের স্বাস্থ্য আর শক্তি ক্ষয় পাচ্ছে। লড়াইয়ে প্রাণ দেওয়া যেমন সম্মানের তেমনি আনন্দের। চাবুক খেয়ে মরার চেয়ে যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া অনেক সোজা।'

অদৃশ্য শ্রোতারা ফিসফিস করে তাদের পূর্ণ সমর্থন জানাল। কাভি বলে চলল:

'বিদ্রোহে দেরী করা আর চলবে না, কিন্তু একটা সর্ত মেটাতে হবে — এই অভিশপ্ত দেশ থেকে বেরবার পথ আমাদের বের করতে **হবে**। যদি আরো দুতিনটে শেনে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়, এমনকি যদি অস্ত্রশস্ত্রও পাই, তবুও দীর্ঘ সংগ্রামে আমরা সমর্থ হব না। মহাবিদ্রোহের পর থেকে কেম্‌তের কর্তারা বিভিন্ন শেনের ক্রীতদাসদের আলাদা করে রাখার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। অন্যদের সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই। এক সঙ্গে অনেক লোককে বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা রয়েছি খোদ রাজধানীতে, এখানে অজস্র সৈন্য। লড়াই করতে করতে এ দেশের মধ্যে দিয়ে পথ করে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আইগিপতসের তীরন্দাজ বাহিনী অত্যন্ত সাংঘাতিক, এদিকে আমাদের অত ধনুকও নেই, তাছাড়া প্রত্যেকে তা চালাতেও জানে না। এখন দেখা যাক মরুভূমি পেরিয়ে আমরা পুব বা পশ্চিমে যেতে পারি কিনা। শেনে ছেড়ে যাবার কিছু পরেই আমরা হয়ত মরুভূমিতে পড়ব। মরুভূমি যদি পার না হতে পারি তবে আমার মতে বিদ্রোহের চেষ্টা না করাই ভাল। শুধু শুধু শক্তি ক্ষয় আর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে প্রাণ খোয়ান। তাহলে আমাদের মধ্যে মুক্তির ক্ষীণ আশা নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করতে যারা প্রস্তুত তারাই শুধু পালাক। আমি নিজেই সে চেষ্টা করে দেখতে প্রস্তুত।'

এত্রাস্‌কান চুপ করে গেল। চারপাশে উত্তেজিত চাপা গলার ফিসফিসানি শোনা গেল।

ক্রীতদাসদের সারির এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত তার কথা ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম দিকে শ্রোতারা লড়াইয়ের জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, এখন আবার সাহসী দলপতিদের মনে দেখা দিল দ্বিধা আর সন্দেহ। কাভির কথায় সাফল্যের সব আশা গেল নির্মূল হয়ে, অত্যন্ত দুঃসাহসী যোদ্ধারাও তাই ইতস্তত করতে লাগল। প্রবেশপথের কয়লাঢালা অন্ধকারে নানা ভাষায় ফিসফিস গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল।

নীল জলের ওপারের একজন আমু, সেমাইট, গুড়ি মেরে মাঝখানে এগিয়ে এল যেখানে চারবন্ধু শুয়ে আছে। শেনেতে তার জাতির লোক অনেক।

'আমি বিদ্রোহই চাই। মৃত্যু যদি আসে আসুক, যাই হোক না কেন এই অভিশপ্ত দেশের হতভাগা লোকগুলোর উপর প্রতিশোধ নেব! অন্যদের কাছে আমরা নিদর্শন হয়ে থাকব! কেম্‌ত বহুদিন হল শান্তি ভোগ করছে। অত্যাচারের হিংস্র কলা-কৌশল লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসের লড়াইয়ের উৎসাহ নিয়েছে কেড়ে। আমরা আবার জ্বালাব বিদ্রোহের আগুন ...'

'তোমার কথা শুনে খুসি হলাম, সাহস আছে তোমার,' কাভি লোকটিকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু যাদের তুমি চালাবে তাদের কী বলবে?'

'তাদের কাছেও এই একই কথা বলব,' লোকটি সোৎসাহে বলল।

'তোমার বিশ্বাস তারা তোমার অনুসরণ করবে?' এত্রাস্‌কান বলল। 'এ বড় কঠোর সত্য... অথচ এ অবস্থায় মিথ্যে দিয়ে ভোলানও বেফায়দা — লোকেরা আসল ব্যাপারটা ধরে ফেলবেই। ওদের মনের মধ্যে যে কথাটা রয়েছে সেটাই ওদের কাছে সত্য।'

সেমাইট লোকটি কোন জবাব দিল না। সেই ফাঁকে শুয়ে থাকা লোকজনদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে এল লিবীয়ার আখ্‌মির সর্পিল পাৎলা শরীরটি। পান্দিওন শুনেছে লোকটি 'পৃথিবীর শিং'এর যুদ্ধে ধরা পড়ে। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। সে সবাইকে বলল, কেম্‌তের সবচেয়ে পুরনো রাজাদের সমাধির কাছে, তিনিস আর আবিদসের সহরের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে একেবারে উয়াখেৎ-উয়ের পর্যন্ত। উয়াখেৎ-উয়ের হচ্ছে একটা বড় মরূদ্যান। এই পথে প্রচুর জলের ভাল ভাল কুয়ো পাওয়া যাবে। তারোপর রাস্তাটায় সৈন্যদের পাহারা ব্যবস্থাও নেই। প্রথমে সোজা যেতে হবে জেশের-জেশেরু মন্দিরের পিছনের মরুভূমি ধরে। তারপর উত্তর-পশ্চিমে বাঁক নিয়ে নদী থেকে একশ কুড়ি হাজার হাত দূরে একজায়গায় ঐ পথে

পড়তে হবে। লিবীয়ার লোকটি পথ দেখাবার ভার নিতে রাজী। মরূদ্যানে অল্পই সৈন্য আছে, বিদ্রোহী ক্রীতদাসরা সহজেই সেটা দখল করে নিতে পারবে। তারপর আর মাত্র হাজার পঁচিশেক হাত মরুভূমি পেরিয়েই পাশ্ত মরূদ্যান। এই সরু লম্বা মরূদ্যানটা পশ্চিমের দিকে এগিয়ে গেছে। আরো খানিক পরে পাওয়া যাবে মুৎ মরূদ্যান। সেখান থেকে 'মরা সাপ' পাহাড়ে একটা রাস্তা গেছে, সে রাস্তায়ও কুয়ো আছে। 'মরা সাপ' পাহাড় থেকে একটা রাস্তা গেছে কালোদের রাজ্যে। সে পথ লিবীয়ার লোকটির জানা নেই।

'সে রাস্তা আমি জানি,' কিদগো বলে উঠল, 'বন্দীদশার সেই দুর্বৎসরে ঐ পথ দিয়ে আমায় যেতে হয়েছে।'

'মরূদ্যানগুলিতে প্রচুর খেজুর পাওয়া যায়। বিশ্রামও করতে পারব। কোথাও কোন পাহারা ঘাঁটি নেই। উটও সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে। উটে চড়ে 'মরা সাপ' পর্যন্ত যাব। তারপর নুনের হ্রদের ওপারে ঘন ঘন জল পাওয়া যাবে।'

পরিকল্পনাটি সবার অনুমোদন পেল, সকলের তা সম্ভব বলে মনে হল।

তবুও সতর্ক কাভি লিবীয়ার লোকটিকে জিজ্ঞেস করল:

'তুমি ঠিক জান যে, নদী থেকে একশ কুড়ি হাজার হাত দূরে কুয়ো আছে? সে যে বহু দূর পথ।'

'হয়তো আরো কিছু বেশিও হতে পারে,' লিবীয়ার লোকটি শান্তভাবে জবাব দিল। 'জল ছাড়াও শক্তসমর্থ লোক এপথে যেতে পারে অবশ্য যদি রওনা হতে আমাদের মাঝরাত্রের বেশি দেরী না হয় আর কোথাও না থেমে সোজা হেঁটে চলি। মরুভূমিতে জল না খেয়ে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি বেঁচে থাকা যায় না। তাছাড়া দুপুরবেলার পরও হাঁটা সম্ভব নয়।'

এশিয়ার এক খেরিউশা প্রস্তাব করল, সুউ বন্দরটার পথে যে দুর্গটা পড়ে সেটা আক্রমণ করা চাই। অনেকের সে প্রস্তাবটা বেশ পছন্দ, তাদের বেশির ভাগই এশিয়াবাসী আর আমু। কিন্তু তবুও লড়াই করে পুবে এগোনর প্রস্তাবটা অসম্ভব বলে সাব্যস্ত হল।

লিবীয়ার লোকটির প্রস্তাবই ঢের বেশি সম্ভব মনে হল, কিন্তু এ বিষয়ে নিগ্রো আর এশীয়দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারণ হচ্ছে এই: দক্ষিণ-পশ্চিমের পথ ধরে গেলে এশিয়ার লোকেরা তাদের দেশ থেকে আরো দূরে চলে যায়, কিন্তু নিগ্রো আর লিবীয়ার লোকদের পক্ষে সেটা সুবিধাজনক। লিবীয়ার লোকেরা চায় মুৎ মরূদ্যান থেকে উত্তরে গিয়ে তাদের দেশের যে অংশ মিশরীদের অধিকারের বাইরে সেখানে গিয়ে পেঁছয়। পান্দিওন আর এত্রাস্কানরা লিবীয়ার লোকদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক।

একজন বয়স্ক নুবিয়াবাসী সকলকে শান্ত করল। সে বলল তার একটা পথ জানা আছে। পথটা দক্ষিণে কালো রাজ্যের দুর্গগুলোর পাশ কাটিয়ে নুবিয়ার সমতল পার হয়ে নীল জলে গিয়ে পড়েছে।

মরুভূমির ছাদের মতো পাহাড়ের মাথায় এদিকে সরু চাঁদ দেখা দিয়েছে। বিদ্রোহী ক্রীতদাসরা কিন্তু তখনো আলোচনা করে চলেছে তাদের পালানর পরিকল্পনা নিয়ে। এখন বিদ্রোহের খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। নির্দিষ্ট লোকের নেতৃত্বে একেকটা দলকে বিশেষ বিশেষ কাজ দেওয়া হল।

ঠিক হল একদিন পর ঘোর অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহ সুরু হবে।

ষাটজন লোক গুড়ি মেরে শেনের বিভিন্ন দিকে তাদের ঘরে নিঃশব্দে চলে গেল। দেয়ালের মাথায় চাঁদের আলোয় সান্ত্রীদের ছায়ামূর্তি। নিচে কী ঘটছে সে বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই। পায়ের নিচে অন্ধকার খুপরিতে যারা ঘুমচ্ছে তাদের প্রতি এদের ঘৃণার ভাব।

পরদিন সারাদিন আর সারারাত এবং তার পরের দিনও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, সবার চোখের আড়ালে বিদ্রোহের তোড়জোড় চলল। বিশ্বাসঘাতকদের ভয়ে কেবল ভালো করে চেনা লোকদের সঙ্গেই নেতারা এ বিষয়ে আলাপ করল। তাদের আশা, একবার সান্ত্রীদের ঘায়েল করতে পারলেই অন্যান্য সবাই বিদ্রোহে যোগ দেবে।

বিদ্রোহের রাত্রি এল। কয়েক দল লোক অন্ধকারে জমায়েত হয়েছে। উত্তর, দক্ষিণ আর পশ্চিম — তিন দেয়ালে তিনটে দল। পূবে ভিতরের দেয়ালের নিচে দুটো দল জড়ো হল।

এতটুকু সময় নষ্ট না করে প্রত্যেকে জায়গা মতো দাঁড়িয়ে গেছে। আক্রমণের সংকেত হিসাবে কাভি উপুড় হয়ে থাকা জলের একটা ঘড়ায় পাথর দিয়ে ঘা দেওয়া মাত্র তারা সজীব পিরামিড বানিয়ে ফেলেছে। খাড়া দেয়ালে গা লাগিয়ে সত্তর জন লোক একটা ঢালুর মতো গড়ে তুলেছে। এরকম পাঁচটা সজীব ব্রিজের উপর দিয়ে চারদিক থেকে ছুটে এল যুদ্ধের নেশায় উন্মত্ত জনস্রোত।

ভিতরের দেয়ালের মাথায় যারা প্রথম উঠল তাদের মধ্যে রয়েছে কাভি, পান্দিওন, রেম্‌দ্‌ আর কিদগো। আর ভেবেচিন্তে দেখার জন্য একমুহূর্ত না থেমে পান্দিওন সোজা অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্যেরাও অনুসরণ করল।

প্রহরীদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসা একজন যোদ্ধাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে পান্দিওন একলাফে তার পিঠে চড়ে বসে তার ঘাড় মটকে দিল। যোদ্ধাটির শিরদাঁড়া গেল ভেঙে। পান্দিওনের হাতে তার শরীরটা অবশ অসাড় হয়ে পড়ল। তার চারপাশে ক্রীতদাসরা ততক্ষণে ঘৃণিত শত্রুদের খুঁজে বের করে আক্রমণ চালাতে সুরু করেছে। ভীষণ রাগে তারা খালি হাতেই সশস্ত্র যোদ্ধাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যোদ্ধারা সামনে থেকে এগিয়ে আসা শত্রুকে প্রতিহত করার আগেই পিছন আর পাশ থেকে অন্যেরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। অস্ত্রহীন কিন্তু প্রচণ্ড রাগে ভয়াবহ ক্রীতদাসরা যোদ্ধাদের অস্ত্র ধরা হাতে দাঁত বসিয়ে দিল, চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিল। অস্ত্র চাই, যে করেই হোক অস্ত্র চাই — এই ছিল তখন আক্রমণকারীদের একমাত্র চিন্তা। যারা ছোরা বা বর্শা জোগাড় করতে পারল, তারা আরো ভয়ানক হয়ে উঠল, দুহাতে কালান্তকর শক্তি অনুভব করতে লাগল। মৃত শত্রুর কাছ থেকে পাওয়া তলোয়ার নিয়ে পান্দিওন এপাশ ওপাশ শত্রু নিধন করতে লাগল। জল আনার বিরাট বাঁকটা নিয়ে লড়াই করল কিদগো।

সজীব ব্রিজের উপরে উঠে কাভি ভিতরের দরজার পাহারাদার চারজন যোদ্ধার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হতচকিত মিশরীরা উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া নিঃশব্দ ক্রীতদাসদের বন্যায় সত্যি সত্যিই বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়াতে প্রায় লড়তেই পারল না।

জয়ের আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে কাভি দরজার বিরাট খিল খুলে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্তি পাওয়া ক্রীতদাসরা প্রাচীরের মাঝখানের সমস্ত জায়গাটা দখল করে নিয়ে শেনের অধিনায়কের ঘরে ঢুকে যোদ্ধাদের মেরে ফেলল। পাহারার পালা বদলের পর তারা তখন বিশ্রাম করছিল।

দেয়ালের উপরে আরো সাংঘাতিক লড়াই চলেছে। সেখানকার ন জন সান্ত্রী আক্রমণোদ্যত ক্রীতদাসদের আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিল। বাতাসে তখন তীরের শব্দ, আহতদের আর্তনাদ আর উপর থেকে পড়ে যাওয়ার শব্দ।

কিন্তু ন জন মিশরী একশ জন ক্রোধোন্মত্ত ক্রীতদাসের সঙ্গে আর কতক্ষণই বা লড়বে! ক্রীতদাসরা যোদ্ধাদের বর্শার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের নিয়েই দেয়াল গড়িয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে দুটো দেয়ালের মাঝখানের সংকীর্ণ জায়গাটায় অন্যান্য কর্মচারীদের সায়েস্তা করা হয়েছে। মৃত অধিনায়কের কাছে বড় দরজার চাবি পাওয়া গেল। দরজা খোলার সময় মরচে পড়া কব্জা সুতীব্র চীৎকারে রাত্রির বুক যেন বিজয়ধ্বনিতে ভরে দিল।

বর্শা ঢাল ছোরা তীরধনুক — সৈন্যদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেওয়া হল। সশস্ত্র ক্রীতদাসরা অন্য পলাতকের সামনে সামনে নদীর দিকে চলতে লাগল। .কারো মুখে কথা নেই।

নদীতে নৌকো বজরা ভেলা যা পাওয়া গেল সবকিছু নিয়ে এবার সুরু হল নদী পেরনর পালা। কয়েকজন জলে পড়ে প্রাণ হারাল, তা-কেমের জল পাহারা দেয় যে বড় বড় কুমীর তাদের পেটে গেল।

ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই বাহিনীর আগুয়ান দল নদীর অপর তীরে জেশের-জেশেরু পথে একটা শেনেতে পৌঁছল।

কাভি পান্দিওন আর লিবীয়ার দুটি লোক সোজাসুজি তোরণের দরজায় টোকা মারল। অন্যেরা দরজার কাছেই দেয়ালে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

দেয়ালের উপর থেকে একজন যোদ্ধা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, তারা কী চায়। লিবীয়ার একজন তা-কেমের ভাষা খুব ভাল জানত। সে বলল, শেনের অধিনায়ককে চাই, রাজকীয় নির্মাণ বিভাগের অধ্যক্ষ চিঠি পাঠিয়েছেন। দরজার আড়ালে অনেকের গলা শোনা গেল। একটা মশাল জ্বলে উঠল। দরজা খুলে গিয়ে দেখা গেল দুটো দেয়ালের মাঝখানে একটা উঠোন, ঠিক ছেড়ে আসা শেনেটার মতোই। প্রহরীদের অধিনায়ক যোদ্ধাদের দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে চিঠি চাইল।

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ জোর চেঁচিয়ে উঠে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইয়াখমসের ছোরাটা তার বুকে বসিয়ে দিল কাভি। পান্দিওন আর লিবীয়ার লোক দুটি অন্য যোদ্ধাদের দিকে তেড়ে গেল। অন্য সশস্ত্র ক্রীতদাসরা তৈরী হয়েই দাঁড়িয়েছিল। এই গোলমালের সুযোগে তারা ভীষণ চীৎকার করতে করতে শেনেতে ঢুকে পড়ল। মশালগুলো গেল নিভে। অন্ধকার ভরে উঠল চাপা আর্তনাদ গর্জন আর সামরিক চীৎকারে। পান্দিওন চট করে দুজনকে সেরে ফেলে ভিতরের দরজাটা খুলে ফেলল। লড়াইয়ের গোলমালে জেগে ওঠা শেনে জুড়ে বিদ্রোহের ডাক শোনা গেল। ক্রীতদাসরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে হকচকিয়ে যাওয়া স্বদেশীবাসীদের মাতৃভাষায় ডাক দিচ্ছে। সারা শেনে গুঞ্জনে ভরে উঠল। সে-আওয়াজ ক্রমশ বেড়ে উঠে এক গম্ভীর গর্জনে পরিণত হল। দেয়ালের উপরের যোদ্ধারা ভয়ে নামতে পারে না, খালি এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে। উপর থেকে তারা মাঝে মাঝে এলোপাতাড়ি তীর ছুঁড়তে লাগল। দেয়ালের মাঝখানের উঠোনের লড়াই কমে এল। দেয়ালের উপর পরিস্ফুট যোদ্ধাদের উপর দক্ষ হাতের তীর এসে পড়ল নীচ থেকে। দ্বিতীয় শেনের ক্রীতদাসরা মুক্তি পেল।

ক্রীতদাসরা হঠাৎ মুক্তি পেয়ে কেমন যেন ধাঁধিয়ে গেল। তারা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। মুক্তিদাতাদের চীৎকার তাদের কানে পেঁৗছল না। কিছুক্ষণ পরেই কাছের বাড়িগুলো থেকে ভীষণ

চীৎকার ভেসে এল। নানা জায়গায় আগুন জ্বলে উঠল। অন্য দলপতিদের নিয়ম ও শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত তাদের শেনের লোকদের জড় করার হুকুম দিল কাভি। তারপর দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে সে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। সে তখন পশ্চিমে তাকিয়ে আছে। সেদিক থেকে আগুনের ছায়া তার চোখে এসে পড়েছে।

কাভির মনে হল, কোন প্রস্তুতির আগেই দ্বিতীয় শেনের ক্রীতদাসদের হঠাৎ মুক্তি দেওয়াটা বোধ হয় উচিত হয়নি। তার নিজের অনুচররা এর মধ্যেই একটা বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখী সাধারণ সংগ্রামের ভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। এই নতুন দলের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে দিলে বোধ হয় ভালর চেয়ে খারাপই হবে বেশি। কারণ দ্বিতীয় শেনের ক্রীতদাসরা একেবারেই প্রস্তুত নয়, তারা প্রত্যেকে একেক জন আলাদাভাবে ইচ্ছে মতো কাজ করে চলেছে, প্রতিশোধ নেওয়া আর মুক্তির সম্ভাবনায় ক্ষেপে উঠেছে।

সত্যিই সেরকমটাই ঘটল। প্রথম শেনের অনেকেও লুটতরাজ আর বাড়িঘরদোর জ্বালানর ব্যাপারে আকৃষ্ট হল। তাছাড়া সময়ও নষ্ট হল; অথচ প্রতিটি মুহূর্ত তখন অত্যন্ত মূল্যবান। অপেক্ষাকৃত ছোট বাহিনীটা সেখান থেকে হাজার আটেক হাত দূরের তৃতীয় শেনের দিকে এগোল। সে শেনেটা জেশের-জেশেরু মন্দিরের একেবারে কাছেই।

তখন আর বিদ্রোহের পরিকল্পনা বদল করার সময় নেই। কাভি বুঝতে পারল সামনে ভয়ানক বাধা। তার অনুমান সত্যি হল। তৃতীয় শেনের কাছে আসতে কাভি দেখতে পেল, দেয়ালের উপর যোদ্ধারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। 'আআতু আআতু' (বিদ্রোহী) চীৎকার কানে পৌঁছল। তারপরেই তীরের শীৎকারে মিশরীরা দূর থেকেই তাদের অভিনন্দন জানাল।

বিদ্রোহীরা আক্রমণের পরিকল্পনা ঠিক করে নেবার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। প্রতিরক্ষার জন্য শেনে ভাল দুর্গের মতো প্রস্তুত। কাজেই তা দখল করতে অনেক সময় নেবে। শেনের ক্রীতদাসরা যাতে জেগে উঠে দেয়ালের সৈন্যদের ভিতর থেকে আক্রমণ করে সেই উদ্দেশে বিদ্রোহীরা সবাই মিলে ভীষণ হৈচৈ করে উঠল।

কাভির গলা তখন ভেঙে গেছে। তবু সে অন্য দলপতিদের উদ্দেশে তারস্বরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, আক্রমণ কর না। কিন্তু তারা কিছুতেই শুনবে না। আগে সহজে জিতে যাওয়ায় তাদের তখন প্রচুর আত্মপ্রত্যয়। তাদের ধারণা, সারা কেম্‌তের ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে তারা দেশটাই জয় করে ফেলবে।

লিবীয়ার সেই আখ্‌মি হঠাৎ এক ভীষণ চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে তার দিকে ঘুরে তাকাল। আখ্‌মি হাত নেড়ে নদী দেখিয়ে দিল। নদীর উঁচু ঢালু পাড় ক্রমশ পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে। এখান থেকে রাজধানীর নানা ঘাট দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটা অনেক দূর পরিষ্কার দেখা যায়। সবখানে মশাল জ্বলে উঠে একটা নিষ্প্রভ কম্পিত রেখায় মিশে গেছে। নদীর বুকেও আলোর ফোঁটার চমক, এমনকি বিদ্রোহীদের তীরে দুজায়গায় মশালগুলো সমবেত হচ্ছে।

কোন সন্দেহ নেই — বিরাট সৈন্যদল নদী পার হচ্ছে। আগুন লাগা জায়গাটা আর ক্রীতদাসদের ঘিরে ফেলার জন্য তাড়াতাড়ি তারা এগিয়ে আসছে।

আর এদিকে বিদ্রোহীরা তখনো শেনে আক্রমণ করার জন্য এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ সেচখাল বেয়ে শত্রুদের কাছে যাবার চেষ্টা করেছে, অন্যেরা নষ্ট করে চলেছে অত্যন্ত মূল্যবান তীর।

জনতার অন্ধকার ছায়ার দিকে তাকিয়ে কাভি বুঝতে পারল, এদের মধ্যে তিনশ জনের বেশি লড়াই করতে পারবে না। সেই তিনশ জনের মধ্যে আবার অর্ধেকেরও কম লোকের ছুরি আর বর্শা আছে। ধনুক মাত্র গোটা তিরিশেক পাওয়া গেছে।

কালো রাজ্যের শত শত মারাত্মক তীরন্দাজ দূর থেকে তাদের উদ্দেশে তীরের মেঘ ছোটাতে ও হাজার হাজার সুশিক্ষিত যোদ্ধার সদ্য মুক্তির স্বাদ পাওয়া ক্রীতদাসদের বজ্র আঁটুনিতে ঘিরে ফেলতে কম সময় নেবে।

আখ্‌মির চোখ রাগে জ্বলছে। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, মাঝরাত্তির এসে গেছে, এক্ষুনি রওনা না হলে সব পণ্ড হবে।

সেই উন্মত্ত জনতাকে রাজধানীর সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করার পরিণাম বোঝাতে গিয়ে আখ্‌মি কাভি আর পান্দিওনের মূল্যবান সময় নষ্ট হল। দলপতিরা বলতে লাগল, এক্ষুনি মরুভূমিতে যাত্রা সুরু করতে হবে; দরকার হলে অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধানে ব্যস্ত, লুটতরাজ আর প্রতিশোধ গ্রহণে উৎসাহীদের ফেলে রেখে তারা এগিয়ে যাবে। একদল ক্রীতদাস তাদের কথা শুনল না। দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে নদীর তীর দিয়ে এক ধনীর বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সেখান থেকে চীৎকার ভেসে এল, দেখা গেল মশালের আলো। বাকি দুশর কিছু বেশি ক্রীতদাস দলপতিদের সঙ্গে যেতে রাজী হল।

কিছুক্ষণ পরেই সেই দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন বাহিনী সূর্যের আলোয় তপ্ত খাড়া পাহাড়ের সরু গিরিসংকটের ভিতর দিয়ে সাপের মতো এগোতে লাগল। গিরিসংকট পেরিয়ে তারা এসে পড়ল এক সমতলে। সামনে কেবল বালি আর পাথরের টুকরো। নিচে বয়ে যাওয়া বিরাট নদীর ক্ষীণ রেখাটা পান্দিওন শেষ বারের মতো দেখে নিল। এই শান্ত জলধারার তীরে তার দুঃখ হতাশা আশা রাগে ভরা কতদিন কেটে গেছে! বিশ্বস্ত সঙ্গীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আর আনন্দে তার বুক ভরে উঠল। বিজয়গর্বে সে দাসত্বের রাজ্যের দিকে পিছন ফিরে তার গতি আরও বাড়াল।

উপত্যকার প্রান্ত পেরিয়ে বিদ্রোহীরা প্রায় বিশ হাজার হাত আসার পর আখ্‌মি সবাইকে থামতে বলল। তাদের পিছনে, পূর্বদিকে আকাশে তখন আলো ফুটে উঠেছে।

অস্পষ্ট প্রায় অদৃশ্য দিগন্ত রেখা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া গোল বালির ঢিবি — কোনটা.শ' দেড়েক হাত উঁচু — ভোরের ধূসর আলোয় অল্প অল্প চোখে পড়ছে। ভোরের সময়টায় মরুভূমি একেবারে নীরব। বাতাস স্তব্ধ। শিয়াল আর হায়েনার দল তাদের ডাক থামিয়ে দিয়েছে।

'এতক্ষণ তো আমাদের তাড়া দিচ্ছিলে, এখন নিজেই থেমে গেলে কেন? কী চাও?' পিছনের সারের ক্রীতদাসরা আখ্‌মিকে অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

পথপ্রদর্শক বলল, যাত্রার সবচেয়ে দুর্গম অংশটা এখন আরম্ভ হবে — অজস্র অনন্ত বালির ঢিবি। একের পর এক। একটার চেয়ে আরেকটা আরো বেশি উঁচু। ঢিবিগুলো শেষ দিকে তিনশ হাত উঁচুতে উঠেছে। ক্রীতদাসদের দুজন দুজন করে সার বেঁধে দাঁড় করান হবে, সোজা চলতে হবে। থামলে চলবে না, পিছিয়ে পড়বে না, শ্রান্তিক্লান্তি কিছুই মানবে না। যারা পিছিয়ে পড়বে তারা কখনই আর গন্তব্যে পেঁছিতে পারবে না। আখ্মি আগে আগে বালির ঢিবির মধ্যে দিয়ে পথ খুঁজে খুঁজে যাবে।

দেখা গেল রওনা হবার আগে প্রায় কেউই জল খেয়ে আসেনি। এখন লড়াইয়ের উত্তেজনার পর অনেকেই ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছে। সবার আবার রোদের হাত থেকে ঘাড় আর মাথা বাঁচাবার জন্য জোব্বা বা কোনো কাপড়ও নেই। কিন্তু নিরুপায়!

নীরব ক্রীতদাসদের দুশ হাত লম্বা সারি এগিয়ে চলল। মাটির দিকে স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তারা কোনরকমে নরম বালির উপর পা টেনে টেনে চলতে লাগল। সামনের দল ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে এঁকেবেঁকে বালিয়াড়ি দিয়ে চলেছে, সরে যাওয়া বালির ঢালু এড়িয়ে।

পুব আকাশের অনেকটা জুড়ে তখন টকটকে লাল আভা দেখা দিয়েছে।

বালি পাহাড়ের অর্ধচন্দ্রাকার তীক্ষ্ন রেখায় সোনালি রঙের ছোঁয়া। সূর্যের আলোয় পান্দিওনের মনে হল যেন সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ জমে গেছে, তাদের ঢালুর গায়ে কমলা রঙা আলোর ছটা পড়েছে। রাত্রের উত্তেজনা ক্রমশ দূর হল, ক্রীতদাসরা সবাই অসাধারণ রকম শান্ত হয়ে এসেছে। মরুভূমির উদার বিস্তৃতি, ঊষার সোনালি আভা — বন্দীদশায় শ্রান্তক্লান্ত ক্রীতদাসেরা নতুন জীবন লাভ করল। রাগ দ্বেষ ভয় দুঃখ আর হতাশার জায়গায় তাদের বুক ভরে উঠল শান্তিতে।

সকালের আলো ফুটে উঠতে আকাশ যেন সরে গিয়ে ডুব দিল তার অতল নীল গভীরতায়। সূর্য ক্রমেই উপরে উঠছে। প্রথম প্রথম তার উত্তাপটা বেশ ভালই লাগছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই রোদে সবার মুখ পিঠ পুড়ে যেতে লাগল। উঁচু বালি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সেই

গোলকধাঁধার মতো ক্লান্তিকর মন্থর পথ ক্রমেই হয়ে উঠছে দুর্গম। পাহাড়গুলোর ছায়া অনেক ছোট হয়ে এল। উত্তপ্ত বালির উপর দিয়ে হাঁটা কষ্টকর, কিন্তু তবু সবাই হেঁটে চলল। কেউ থামল না, পিছন ফিরে তাকাল না। সামনে তাদের অনন্ত বালি পাহাড়, সব কটার চেহারা একেবারে একরকম। চারপাশের দৃশ্য তারা আড়াল করে রেখেছে।

বেলা বাড়তে থাকে। বাতাস রোদ আর বালি একাকার হয়ে গিয়ে সৃষ্টি করে এক বিরাট আগুনের সমুদ্র। চারিদিক গলন্ত ধাতুর মতো জ্বলছে, সবার চোখ গেল ধাঁধিয়ে, দমবন্ধ হয়ে এল।

পান্দিওন আর এত্রাস্কান দুজনের মতো যারা উত্তরের লোক তাদের পক্ষে এই যাত্রা বিশেষ কষ্টকর। পান্দিওনের মনে হল তার রগদুটো কে যেন লোহার আংটা দিয়ে চেপে ধরেছে। কপালের শিরা দপ দপ করছে. অসহ্য যন্ত্রণায়।

চোখে সে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, সামনে তার নানা রকম অদ্ভুত চড়া রং নানা রকম নক্সা তুলে পাক খাচ্ছে। সূর্যের অসহ্য তেজে মরুভূমির বালিকে মনে হচ্ছে যেন আলো ছড়ান সোনার গুঁড়ো।

পান্দিওন তখন যেন রয়েছে প্রলাপের ঘোরে। নানা রকম সব অদ্ভুত কল্পনা তার উন্মত্ত মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে এসে রূপ নিচ্ছে। আইগিপ্‌তসের বিরাট বিরাট মূর্তিগুলো লাল আগুনের ভিতর দিয়ে উড়ে গিয়ে বেগুনী সমুদ্রের ঢেউয়ে ডুব দিচ্ছে। তার পর সমুদ্র হঠাৎ সরে গেল। খাড়া পাহাড়ের মাথা থেকে বিদ্যুৎ গতিতে নেমে এল অদ্ভুত সব প্রাণী, আধা-জন্তু আধা-পাখি। তারপর আবার কালো রাজ্যের গ্রানিটে তৈরী ফারাওরা যুদ্ধের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পান্দিওনের দিকে এগিয়ে এল।

টলতে টলতে সত্যিই কী ঘটছে দেখবার জন্য পান্দিওন চোখদুটো রগড়ে নিল, দুগালে চড় কষিয়ে দিল — সামনে রয়েছে কেবল চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া ধূসর-সোনালি আলোয় একটার উপর আরেকটা বালির ঢিবি, তাদের ঢালু থেকে প্রচণ্ড তাপ ঠিকরে বেরচ্ছে। কিন্তু আবার সেই রঙিন আগুনের ঘূর্ণি উঠল। ফের প্রলাপের ঘোরে পান্দিওন হারিয়ে গেল। একমাত্র মুক্তির প্রবল ইচ্ছার প্রেরণায় সে কিদগোর সঙ্গে একতালে

পা মিলিয়ে হাজার হাজার বালি পাহাড় পিছনে ফেলে রেখে এগোতে থাকে। আবার সামনে এসে দাঁড়াল নতুন পাহাড়ের শ্রেণী। তাদের মাঝখানে বিরাট বিরাট মসৃণ গা জ্বালামুখ। সেই জ্বালামুখের তলে কয়লা কালো মাটি।

ক্রীতদাসদের সারিতে অনুরোধে ভরা কাতরধ্বনি ক্রমে বেড়ে উঠছে; এখানে ওখানে ক্লান্ত লোকেরা হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে লাগল। সেই জ্বলন্ত বালির উপর অনেকে মুখ থুবড়ে গেল পড়ে। যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দেবার জন্য সঙ্গীদের অনুনয় করে চলেছে।

অন্যেরা তাদের ফেলে রেখে বিষণ্ণ চিত্তে এগিয়ে চলল। ফেলে আসা সঙ্গীদের কাতর অনুরোধ তাদের পিছনে, নরম বালির ঢিবির আড়ালে মিলিয়ে গেল। চারিদিকে শুধু বালি, জ্বলন্ত আগুনবালি। অজস্র বালি, অনন্ত অশেষ বালি। নীরব অমঙ্গলে ভরা বালি। সারা বিশ্বজগৎকে সে যেন দমবন্ধ করা ভয়াবহ আগুনে ডুবিয়ে দিয়েছে।

দূরে সূর্য রশ্মির সোনালি আগুনে এক টুকরো রুপোলি আভা দেখা দিল। উৎসাহে ক্ষীণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল লিবীয়ার লোকটি। খয়েরী পটভূমিকায় ক্রমশ নুনের দানায় ভরা মাটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। দানাগুলো থেকে বিকিরিত হচ্ছে প্রখর উজ্জ্বল নীল জ্যোতি।

বালির ঢিবিগুলো ক্রমে ছোট হয়ে এল। কিছু পরেই বালির ঢিবির জায়গায় দেখা দিল শক্ত বালির চাপ। ক্রীতদাসদের পা এবার বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে সুরু করল, নরম ভুসভুসে বালিতে আর হাঁটতে হচ্ছে না। ফাটলে ভরা শক্ত হলদে মাটি তাদের কাছে তখন কোন প্রাসাদ বীথির পাথরবাঁধান রাস্তার মতো মনে হতে লাগল।

বিদ্রোহী ক্রীতদাসরা যখন স্তরিত খয়েরী পাথরের পাহাড়ের মতো খাড়িতে উঠল সূর্য তখনো আকাশের মাথায় আসতে একহাত বাকি। সেখান থেকে তারা হঠাৎ বাঁয়ে, দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘুরে গেল। পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট্ট ফাঁক বড় কোণ করে দাঁড়িয়ে আছে, দূর থেকে দেখে মনে হয় বুঝি গুহার কালো মুখ। তার ভিতরে একটা বহু পুরনো কুয়ো, ঠাণ্ডা পরিষ্কার জলের ঝর্ণা।

পাছে তৃষ্ণায় পাগল লোকেরা জলের জন্য কাড়াকাড়ি সুরু করে দেয়, কাভি ফাঁকের মুখে সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রীতদাসদের পাহারায় দাঁড় করিয়ে দিল। সবচেয়ে দুর্বল যারা তারাই সবার আগে জল খেতে পেল।

সূর্য অনেকক্ষণ হল মাঝ আকাশ পার হয়ে গেছে, কিন্তু বিদ্রোহীরা তখনো জল খেয়ে চলেছে। সে জলখাওয়া যেন আর কখনোই থামবে না। পাহাড়ের ছায়ায় গুড়ি মেরে এসে লোকে কিছুক্ষণ পেট ফুলিয়ে শুয়ে থাকে, তারপর আবার জল খেতে যায়। ক্রমশ সবাই তাগদ ফিরে পেল। কিছুক্ষণ পরেই শক্ত সবল নিগ্রোদের দ্রুত আলাপ সেই সঙ্গে হাসি আর ব্যঙ্গবিদ্রূপ শোনা যেতে লাগল ... কিন্তু তবু কারো মনে আনন্দ নেই — বালি ঢিবির গোলকধাঁধায় অনেক মুমূর্ষু বিশ্বস্ত সঙ্গীকে তারা ফেলে এসেছে। সেই সঙ্গীরা সবে মুক্তির পথে পা দিয়েছিল, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বীরের মতো লড়েছিল। যারা রক্ষা পেল তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারাও পরম উত্তেজনায় সবার মুক্তির চেষ্টা করেছিল।

শেনেতে যাদের সঙ্গে পান্দিওন এতদিন একসঙ্গে থেকেছে, তাদের পরিবর্তন দেখে সে অবাক হয়ে গেল। পরিপার্শ্বের একঘেয়ে উদাসীনতা ক্রীতদাসদের সবার জীর্ণ শ্রান্ত মুখে সাধারণ একটা ছাপ ফেলেছিল, সেই ছাপ এখন আর নেই।

আগেকার নিষ্প্রভ নিষ্প্রাণ চোখগুলো এখন চারদিকে তাকাচ্ছে আগ্রহ আর ঔৎসুক্য নিয়ে। কঠোর বিষণ্ণ মুখগুলোয় এখন যেন তীক্ষ্ণতা এসেছে। এরা মানুষ হয়ে উঠেছে, আর ক্রীতদাস নেই। পান্দিওনের মনে পড়ল সঙ্গীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করার জন্য কাভি তাকে বকেছিল। কাভি ঠিকই বলেছিল। জীবনের অভিজ্ঞতা পান্দিওনের খুবই কম। তাই সে মানুষকে বুঝতে পারেনি। দীর্ঘ দাসত্বের যে জড়তা এদের মধ্যে সেটাকে পান্দিওন মনে করেছিল স্বাভাবিক।

পাহাড়ের ফাঁকের প্রাণদায়ী ছায়ার টুকরোটুকুতে ক্রীতদাসরা জমায়েৎ হল। কিছুক্ষণ পরেই সবাই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। সেদিন আর পিছু-ধাওয়া যোদ্ধাদের ভয় নেই — মুক্তির জন্য মৃত্যু বরণ করতে

যারা প্রস্তুত একমাত্র তারা ছাড়া দিনের বেলায় বালির সমুদ্রের ঐ জ্বলন্ত নরক পার হয়ে আর কে আসতে যাবে?

সূর্যাস্ত পর্যন্ত সবাই বিশ্রাম করল। সবার পা আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত। সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রীতদাসরা অল্প কিছু খাবার বয়ে এনেছিল। সে খাবার সবার মধ্যে সাবধানে ভাগ করে দেওয়া হল।

পরের কুয়োটা অনেক দূরে। লিবীয়ার লোকটি বলল, সারা রাত হাঁটতে হবে। তবে ভোর বেলা, গরম পড়ার আগেই জল পাওয়া যাবে। তারপর আবার বালি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে যেতে হবে। তারপরেই বড় মরূদ্যান। সৌভাগ্যবশত শেষ বালি পাহাড়ের মরুভূমিটা বেশি বড় নয় — যেটা তারা পার হয়ে এসেছে সেটার চেয়ে বেশি হবে না। সন্ধ্যাবেলার দিকে, সূর্য যখন দক্ষিণ-পশ্চিমে, তখন রওনা হলে রাত্রেই বড় মরূদ্যানে পৌঁছে যাবে। সেখানেই খাবার পাওয়া যাবে। সুতরাং কেবল চব্বিশ ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে হবে।

ক্রীতদাসরা এত কষ্ট সহ্য করেছে যে এই কষ্ট তাদের কাছে ভয়ানক মনে হল না। তাদের প্রধান উৎসাহ আর শক্তির উৎস হল তারা মুক্ত স্বাধীন, ঘৃণ্য কেম্‌ত রাজ্য থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, ধরা পড়ার সম্ভাবনা ক্রমেই কমে আসছে, এই চেতনা।

সূর্য অস্তে গেল। লাল আগুন রং ধূসর ছাই রঙে ঢাকা পড়ে গেল। শেষবারের মতো পেট ভরে জল খেয়ে নিয়ে পলাতকরা এগিয়ে চলল।

রাত্রির কালো ডানার ঘায়ে বিশ্রী গরম দেশছাড়া হয়েছে। মরুভূমির আগুনে পোড়া চামড়ায় অন্ধকার তার নরম হাত বোলাতে লাগল।

পথটা গেছে একটা ধারাল পাথরটুকরোয় ভরা নিচু সমান মালভূমি দিয়ে। অসাবধান হলেই পা কেটে যায়।

মাঝরাত্রে পলাতকরা ধূসর গোল পাথর ছড়ান এক চওড়া উপত্যকায় এসে পৌঁছল। এক থেকে তিন হাত ব্যাসের অদ্ভুত পাথরগুলো চারদিকে বলের মতো পড়ে আছে। যেন কোন অজানা দেবতারা খেলার পর ফেলে গেছে। ক্রীতদাসরা এবার সার ভেঙে ভীড় করে আড়াআড়িভাবে উপত্যকা হয়ে কিছু দূরের একটা উঁচু জায়গার দিকে এগোচ্ছে।

প্রচণ্ড সাংঘাতিক দিন নিষ্ঠুর নির্মম ভাবে মানুষের দুর্বলতা প্রকাশ করেছিল। এখন রাত্রির নিস্তব্ধ শান্তি ডেকে আনল গভীর ধ্যান। পান্দিওনের মনে হল অনন্ত মরুভূমিটা উঠে গেছে আকাশের পেয়ালার দিকে। কালো জ্যোতিতে ভরা স্বচ্ছ আবহাওয়ায় তারাগুলো যেন কাছে এসে গেছে। চাঁদ উঠল। অন্ধকার মাটির উপর ছড়িয়ে পড়ল রুপোলি আলোর গালিচা।

পলাতক ক্রীতদাসরা উঁচু জায়গাটার ঢালুতে পৌঁছল। পাহাড়ের ধীরে ধীরে নেমে আসা ঢালুটা চুনাপাথরে তৈরী। সূক্ষ্ম বালির আঘাতে পাথরের গা পালিশ করা। চাঁদের আলোর প্রতিফলনে মনে হচ্ছে যেন নীল কাচের সিঁড়ি আকাশে উঠে গেছে।

সেই ঠাণ্ডা পিছল গায়ে পা দিয়ে পান্দিওনের মনে হল আর একটু উপরে উঠলেই সে আকাশের ঘন নীল পেয়ালাটা ধরে ফেলতে পারবে।

উপরে ওঠা শেষ হল। সিঁড়ি মিলিয়ে গেল। নিচের কড়কড়ে বড়দানা বালিতে ঢাকা অন্ধকার সমতলে নামার দীর্ঘ পথ সুরু হল। সমতলের চারপাশে খাঁজকাটা বড় বড় পাথর বিরাট গাছের গুঁড়ির মতো বালি ভেদ করে যেরকম সেরকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ভোরের দিকে সবাই পাহাড়ের কাছে পৌঁছল। লিবীয়ার পথপ্রদর্শকের পিছন পিছন নানারকম ফাটলের গোলকধাঁধায় অনেকক্ষণ ঘুরে শেষ পর্যন্ত সেই কুয়ো খুঁজে পেল। পাথরের উপর থেকে দেখা যাচ্ছে নতুন বালির ঢিবির বাহিনী কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। শত্রুভাবাপন্ন তারা চারদিক থেকে পলাতকদের ঘিরে বসেছে। বালির গোলাপী ঢালুর মাঝখানে গভীর বেগুনী রঙা ছায়া। জলের কাছে থেকে বালির সমুদ্রকে আর এত ভয়ানক বলে মনে হয় না।

উত্তর দিকে খাড়া বালুস্তর দেয়ালের উপর একটা পাথরের ছায়া কিদগো খুঁজে পেল। যথেষ্টই ছায়া ছিল। ক্রীতদাসরা সকলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গড়িয়ে নিল।

ক্লান্তিতে সবাই মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। মাথার উপরের প্রচণ্ড সূর্য যতক্ষণ পর্যন্ত না শান্ত হচ্ছে ততক্ষণ কিছুই করার নেই।

রাত্রে আকাশটাকে খুব কাছে মনে হয়েছিল। এখন সে আবার বহু যোজন দূরে সরে গেছে। সেই অনেক উঁচু থেকেই সবাইকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে চোখ ধাঁধিয়ে উত্যক্ত করে তুলেছে, যেন অন্ধকারের হাঁপ ফেলার অবসরের প্রতিশোধ নিচ্ছে। সময় বয়ে চলল। পরম আরামে নিদ্রিত লোকেদের রোদের সমুদ্র ঘিরে ফেলল। এই সমুদ্র ক্রীতদাসদের তাদের মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই রোদ সেখানে প্রাণের সব চিহ্নকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয় না।

হঠাৎ এক ক্ষীণ বিষণ্ণ কাতরধ্বনিতে কাভির ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠে মাথা তুলে সে অবাক হয়ে শুনতে লাগল। মাঝে মাঝে নানা দিক থেকে কিছু একটা ফেটে যাওয়ার শব্দ আসছে, তার পর দুঃখভরা টানা কাতরধ্বনি। সে আওয়াজ বেড়ে উঠল। কাভি সভয়ে চারদিকে তাকাল। রৌদ্রে তেতে যাওয়া পাহাড়ে কোথাও কোন নড়াচড়ার চিহ্ন নেই। তার সঙ্গীরা সবাই নিজের নিজের জায়গায় শুয়ে হয় ঘুমোচ্ছে নয়ত কান পেতে শুনছে। কাভি গভীর নিদ্রামগ্ন আখ্‌মিকে জাগাল। আখ্‌মি উঠে বসে হাই তুলল, তারপর স্তম্ভিত ভীত এগ্রাস্‌কানটির মুখের উপর হেসে ফেলল।

'রোদের তাপে পাথরেরা কাঁদছে,' আখমি বলল, 'তার মানে তাপ কমে আসছে।'

পাথরফাটায় লোকে অসুস্থ বোধ করল। আখ্‌মি একটা উঁচু পাথরের মাথায় উঠে জোড়া হাতের ভিতর দিয়ে চারিদিক তাকিয়ে বলল শীগ্‌গিরই মরূদ্যানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া যাবে। সেই শেষ যাত্রার জন্য সবাইকে পেট ভরে জল খেয়ে নিতে হবে।

সূর্য পশ্চিমে অনেকখানি হেলে গেলেও বালি .পাহাড়ের গা থেকে তখনো তাপ ছড়াচ্ছে। ছায়ার আশ্রয় ছেড়ে সেই আগুন আর রোদের সমুদ্রে বেরিয়ে পড়া অসম্ভব ব্যাপার মনে হতে লাগল। তবু সবাই দুজন দুজন করে সার বেঁধে এগিয়ে চলল আখ্‌মির পিছন পিছন। কেউ কোন প্রতিবাদ করেনি — মুক্তির ডাকের এমনই শক্তি।

আখ্‌মির পিছনে তৃতীয় জুড়ি হল পান্দিওন আর কিদগো।

মরুভূমির শক্তির মুখোমুখি হলেই পান্দিওন নিজের উপর তার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। কেবল কিদগোর অফুরন্ত সহ্যশক্তি আর প্রফুল্লভাবই তাকে উৎসাহ জোগায়।

মরুভূমির জ্বলন্ত হিংস্র নিঃশ্বাসে সবাই আবার মাথা নোয়াতে বাধ্য হল। প্রায় পনের হাজার হাত পথ চলার পর পান্দিওন লক্ষ্য করল, তাদের পথপ্রদর্শক আখ্‌মি কেমন যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। দুবার সবাইকে থামিয়ে সে হাঁটু পর্যন্ত বালিতে ঢুকে ঢিবির মাথায় উঠেছে দিগন্ত দেখার জন্য। কিন্তু কারো কোন প্রশ্নের জবাব সে দিল না।

বালি পাহাড়গুলো বেঁটে হয়ে এল। পান্দিওন খুসি হয়ে আখ্‌মিকে জিজ্ঞেস করল, বালির সমুদ্র শেষ হয়ে আসছে কিনা।

'এখনো অনেকটা পথ যেতে হবে, আরো অনেক বালি পেরতে হবে,' আখ্মি গোমড়া মুখে একটু রুক্ষভাবে উত্তর দিয়ে উত্তর-পশ্চিমে ঘুরে তাকাল।

পান্দিওন আর কিদগোও সেদিকে তাকিয়ে দেখল, জ্বলন্ত আকাশ ওদিকে আবছা হয়ে এসেছে। একটা অন্ধকার দেয়াল সোজা উঠে দোর্দণ্ডপ্রতাপ সূর্যকেও জয় করে ফেলেছে, আকাশের দীপ্তি পরাস্ত হয়েছে।

হঠাৎ একটা সুন্দর সুরেলা শব্দ সবার কানে পেঁছিল — বেশ চড়া, ধাতব সুর, বালির ঢিবির আড়ালে কেউ যেন রুপোলি শিঙায় এক আশ্চর্য মোহন সুর বাজাচ্ছে।

সে শব্দ আবার শোনা গেল। ক্রমশ আরো ঘন ঘন আর জোরাল হয়ে উঠল। সবার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। কী অদ্ভুত এক রুপোলি সুর! পৃথিবীর কিছুর সঙ্গেই তার মিল নেই, মর্ত্যজগতের বহুদূরে তার বাস। সেই সুর কী এক অচেতন ভয় সবার মনে ডেকে আনল।

আখ্‌মি থেমে গিয়ে কাতর আর্তনাদ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। আকাশে হাত তুলে সে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানাল, এই ভীষণ দুর্যোগ থেকে আমাদের বাঁচাও। ভীত পলাতকরা সবাই মিলে তিনটে বালি পাহাড়ের মাঝখানে সংকীর্ণ জায়গায় ভীড় করে রইল। পান্দিওন

জিজ্ঞাসু চোখে কিদগোর দিকে তাকিয়ে ভয়ে অবাক হয়ে গেল — কিদগোর কালো চামড়া ধূসর হয়ে উঠেছে। কিদগোকে সে এই প্রথম ভয় পেতে দেখল। নিগ্রোরা যে ভয়ে ধূসর হয়ে যায় তা সে জানত না। কাভি পথপ্রদর্শকের কাঁধ চেপে ধরে তাকে সহজভাবে পায়ের উপর দাঁড় করাল। তারপর ধমকে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কী?

আখ্‌মি তার দিকে ফিরে তাকাল। ঘামের ফোঁটায় ভরা তার মুখ ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে।

'মরুভূমির বালিরা গান গাইছে। ওরা বাতাসকে ডাকছে। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও আসবে — আঁধি আসছে ...'

সবাই বিষণ্ন মনে চুপ করে গেল। গুমোট স্তব্ধতায় বালির গান ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

কাভি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল — কী করতে হবে কিছুই সে বুঝতে পারল না। আবার এই আঁধির মর্ম যারা জানে তারাও তার বিভীষিকা বুঝে চুপ করে রইল।

শেষ পর্যন্ত আখ্‌মি সম্বিৎ ফিরে পেল।

'এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, যত তাড়াতাড়ি পার এগিয়ে চল! একটা পাথুরে জায়গা আমার চোখে পড়েছে। সেখানে বালি নেই। ঝড় আসার আগেই ওখানে পেঁছতে হবে। এখানে থাকলে নিশ্চিত মৃত্যু। সবাই বালির কবরে ঢাকা পড়ে যাব ... ওখানে গেলে কয়েক জন বেঁচে যেতেও পারে ...'

সবাই প্রাণভয়ে আখ্‌মির পিছন পিছন ছুটতে লাগল।

সেই আবছা ধূসর পর্দাটা তখন আরক্ত হয়ে উঠে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। বালি পাহাড়ের মাথায় ধোঁয়ার মতো ধমকে ধমকে বালি উড়ছে। বাতাসের তপ্ত নিঃশ্বাস পলাতকদের জ্বলন্ত মুখে ছোট বালির কণা ছুঁড়ে মারতে লাগল। নিঃশ্বাস নেবার মতো এতটুকু সুযোগ নেই; হাওয়া যেন কোন প্রখর বিষে ভরে গেছে। বালি পাহাড় শেষ হল। পলাতকরা এসে পেঁছল কালো মসৃণ পাথুরে জমিতে। চারিদিকে ছুটে আসা বাতাসের গর্জন প্রচণ্ড হয়ে উঠল। লাল মেঘ নিচের দিকে

কালো হয়ে আকাশের গায়ে যেন পর্দা টেনে দিল। মেঘের উপর দিকটা তখন ঘন লাল, সূর্যের ক্ষীণ চাকাটা সেই ভয়াবহ মেঘে ঢাকা। অভিজ্ঞ সঙ্গীদের দেখাদেখি সবাই তাদের নেংটি আর মাথা ও ঘাড় ঢাকার ছেঁড়া কাপড় খুলে নিয়ে, মুখ ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

পান্দিওনের তৈরী হতে কিছু দেরী হয়ে গেল। শেষ যা সে দেখল তাতে ভয়ে তার প্রাণ উড়ে যাবার জোগাড়। তার চারদিকে সবকিছু তখন ঘুরছে। মুঠোর সমান এক একটা পাথর হেমন্তের বাতাসে শুকনো পাতার মতো কালো মাটির উপর গড়াচ্ছে। বালির ঢিবিগুলো পলাতকদের দিকে সরু সরু লম্বা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বালি পাক খেতে খেতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের চারদিকে ছুটতে লাগল। নিচু সৈকতে ঝড়ের মুখে জল যেমন করে ওঠে বালির ঘূর্ণিও তেমনি পান্দিওনের উপর এসে পড়ল। পান্দিওন মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল, আর কিছু দেখতে পেল না। দ্রুত হৃৎস্পন্দনের প্রতিটি স্পন্দন তার মাথায় ঘা মারতে থাকল। তার মুখ আর গলা যেন শুকিয়ে গেছে, দম প্রায় ফেলতেই পারছে না।

বাতাসের শীৎকার উঁচু পর্দায় ফেটে পড়ল, কিন্তু উড়ন্ত বালির গর্জনে সে শীৎকারও ডুবে গেল। পান্দিওনের চারপাশে মরুভূমি ফোঁস ফোঁস করতে লাগল, গর্জন করতে লাগল। পান্দিওনের মাথা গেল ঘুরে। হাঁপ ধরান শুকনো ঝড় তাকে অজ্ঞান করে দেবার চেষ্টা করল। পান্দিওনও প্রাণপণে যুঝতে লাগল। মরীয়া হয়ে কাশতে কাশতে সে গলার বালির দলাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার জোর জোর নিঃশ্বাস নিল। ক্রমেই তার প্রতিরোধে ছেদ পড়তে লাগল, শেষকালে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

ঝড় আরো ভয়ানক হয়ে উঠল। মরুভূমি জুড়ে তার গুমগুম আওয়াজ শুনে মনে হল বিরাট বিরাট কতগুলো তামার চাকা যেন ছুটে চলেছে। পাথুরে মাটিতেও ধাতুর পাতের মতো তুমুল আওয়াজ। বালির মেঘ মাটির বুকের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বালুকণার

নীল স্ফুলিঙ্গ মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া বালুরাশির গায়ে নীল আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে, আকাশ থেকে ঠাণ্ডা জল ঝরে পড়ে উত্তপ্ত হাওয়ায় শুকিয়ে যাওয়া, জ্ঞানহারা ক্রীতদাসদের জীবন রক্ষা করবে। কিন্তু একফোঁটা বৃষ্টি নেই, অথচ ঝড় বয়েই চলেছে। জড়ামড়ি করে পড়ে থাকা মানুষগুলোর শরীরের উপর বালির আচ্ছাদন ক্রমেই বেড়ে উঠছে, তাদের দুর্বল নড়াচড়া আর কাতরধ্বনি বালিতে চাপা পড়ে যাচ্ছে...

চোখ খুলে পান্দিওন দেখল, তারার পটভূমিকায় মুদ্রিত কিদগোর কালো মাথাটা। পরে সে শুনল, কিদগো অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেছে নিঃসাড় নিস্পন্দ পান্দিওন আর এত্রাস্কান দুজনের জ্ঞান ফেরাবার।

অন্ধকারে সবাই ব্যস্ত। বালি খুঁড়ে সঙ্গীদের বের করছে, তাদের শরীরে প্রাণের ক্ষীণ সাড়া অনুভব করছে, যারা শেষ হয়ে গেছে তাদের এক পাশে সরিয়ে রাখছে।

আখ্‌মি মরুভূমির সঙ্গে সুপরিচিত তার কয়েকজন দেশওয়ালী অনুচর আর নিগ্রোকে নিয়ে পাহাড়ের মধ্যে সেই জলের কুয়োর দিকে ফিরে গেছে। কিদগো তার বন্ধু পান্দিওনকে ছেড়ে যেতে পারেনি। পান্দিওনের তখন অল্প অল্প নিঃশ্বাস পড়ছে।

অবশেষে কিদগোর পিছন পিছন পঞ্চান্নটি অর্ধমৃত লোক একে অন্যকে ধরে বহু কষ্টে আগের দলের পথ ধরে চলতে লাগল। পিছিয়ে যাওয়ায় যে আবার ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সে কথা ভাববার অবস্থা তখন কারো নেই। প্রত্যেকের মনে তখন একটিমাত্র চিন্তা — জল। জলের চিন্তা তখন সংগ্রামের ইচ্ছাকে দাবিয়ে রেখেছে। তাদের আগুনে মাথার তাপের ঘোরের উপর ভারের মতো চেপে আছে জল।

পান্দিওন সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। কুয়ো ছাড়িয়ে যে তারা কুড়ি হাজার হাতের বেশি হেঁটে এসেনি, সে খেয়াল তার নেই। সবকিছু সে ভুলে গেছে। মনে রয়েছে কেবল একটা চিন্তা — সামনের লোকটির কাঁধ ধরে দলের সঙ্গে তাল রেখে পা টেনে টেনে চলতে হবে। অর্ধেক রাস্তা

পার হওয়ায় সামনে থেকে মানুষের গলা শোনা গেল। অস্বাভাবিক রকম জোরাল স্বর। আখ্‌মি আর তার সাতাশ জন অনুচর হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে তাদের ভেজা জব্‌জবে কাপড় আর কুয়োর ধারে পাওয়া দুটো পুরনো কুমড়োর খোলের তৈরী জলপাত্র।

সবাই শেষ শক্তি সঞ্চয় করে বলল, তাদের জলের দরকার নেই। যারা পিছনে দুর্যোগের জায়গাতেই পড়ে আছে তাদের কাছে আখ্‌মিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

কুয়ো পর্যন্ত যেতে হলে অমানুষিক পরিশ্রম প্রয়োজন। প্রতিপদে সবার শক্তি কমে আসছে, কিন্তু তবু সবাই নীরবে জলপাত্রগুলো ফিরিয়ে দিয়ে আবার চলতে সুরু করল।

হোঁচট-খাওয়া লোকগুলির চোখের সামনে কালো একটা পর্দা নাচছে। কেউ কেউ পড়ে গেল। অন্যরা তাদের উৎসাহ দিয়ে আবার খাড়া করে তুলল। শক্তসমর্থ সঙ্গীদের উপর ভর দিয়ে তারা এগোতে লাগল। দলের পঞ্চান্ন জন লোকের কারুরই এই যাত্রার শেষ ঘণ্টাটা মনে নেই — প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেই তারা হেঁটেছে, হোঁচট খেতে খেতে ধীরে ধীরে কোনরকমে এগিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে তারা পেঁৗছল। জল তাদের প্রাণ দিল, শরীর চাঙা করে তুলল। জল পেয়ে জমাট রক্ত আবার বইতে সুরু করল, শুকনো মাংসপেশীগুলো নরম হয়ে এল।

পলাতকরা সজীব হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনে ফেলে আসা সঙ্গীদের কথা মনে পড়ল। প্রথম দলের অনুসরণে তারাও কাপড় ভিজিয়ে নিল জলে — প্রাণের উৎস জল — তারপর মরুভূমির বুকে সেই দিশাহারাদের উদ্দেশে এগিয়ে চলল। ঠিক সময়টিতেই তাদের সাহায্য এসে পেঁৗছল। তখন সূর্য উঠেছে। বেঁচে থাকা শেষ দলটি আখ্‌মি আর তার সঙ্গীদের আনা জল খেয়ে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করেছে। বালির ঢিবির মাঝখানে তারা আবার বসে পড়েছে। শত অনুনয় আর ভয় সত্ত্বেও পথ চলার মতো জোর তারা পায়নি। ভেজা কাপড়গুলো তাদের আরো একঘণ্টা পথ চলার মতো শক্তি জোগাল। কুয়োর কাছে পেঁৗছনর পক্ষে যথেষ্ট।

এইভাবে আরো একত্রিশজন লোক জলের কাছে পৌঁছল। সব মিলিয়ে একশ চোদ্দ জন রক্ষা পেল। দুদিন আগে যে দলটা মরুভূমির পথে যাত্রা সুরু করেছিল তার অর্ধেকেরও কম। সবচেয়ে দুর্বল যারা তারা মরুভূমির ভিতর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে প্রথম দিনেই শেষ হয়ে যায়। তারপর এই ভীষণ আঁধি এসে ভাল আর শক্তিশালী যোদ্ধাদের অনেককে নিয়ে গেল। এখন ভবিষ্যৎ আগের চেয়ে অনেক বেশি অনিশ্চিত। কিছু করার নেই, বাধ্য হয়েই চুপ করে বসে থাকতে হবে — এই অবস্থায় সবাই আরো বেশি মুষড়ে পড়ল। পরিকল্পনা অনুযায়ী পথ চলার শক্তি এখন কারো নেই। অস্ত্রশস্ত্রগুলো ঝড়ের সময় সবাই ফেলে দিয়েছে। খাবার কিছু পেলে বিদ্রোহীরা কিছুটা চাঙা হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু যেটুকু খাবার ছিল তা আগের দিন রাত্রেই বিলি করে দেওয়া হয়ে গেছে।

মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে প্রচণ্ড সূর্যের তেজ। দুর্ঘটনার জায়গায় যারা পড়েছিল, তাদের মধ্যে কারো প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দন যদিও বা থেকে থাকত, এখন তারা নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে।

বাকিরা পাহাড়ের মাঝখানে ছায়ায় শুয়ে পড়ল। আগের দিনও এখানেই তারা আশ্রয় নিয়েছিল। যারা মারা গেল তারাও তখন সঙ্গে ছিল। আগের দিনের মতোই সবাই আবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল। শুধু তাই নয় — তারা অপেক্ষা করে রইল রাত্রির। তাদের আশা, রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়া এসে দুর্বলদের চাঙা করে তুলবে। তাহলে মাতৃভূমি আর তাদের মাঝখানে এই যে মরুভূমির ব্যবধান তার সঙ্গে যুঝবার শক্তি তারা ফিরে পাবে।

সে আশা কিন্তু পূর্ণ হল না।

রাত আসার পর পলাতকরা দেখল, এখন তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রওনা হতে যাবে এমন সময় দূর থেকে গাধার ডাক আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। পলাতকরা ভাবল বণিকদের কাফিলা বা খাজনাআদায়ীর দল বুঝি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সমতলের আধঅন্ধকারে ফুটে উঠল ঘোড়সওয়ারদের চেহারা। মরুভূমির বুকে প্রতিধ্বনি উঠল 'আআতু!' কোথাও পালাবার উপায় নেই, অস্ত্রশস্ত্রও

নেই যে লড়াই করবে। আর লুকনো তো অসম্ভব, — তীক্ষ্ণকান কুকুরগুলো ঠিক খুঁজে বের করবে। বিদ্রোহীদের কেউ কেউ মাটিতেই বসে পড়ল। যেটুকু শক্তি তাদের ছিল, তাও উবে গেল। অন্যেরা লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল পাহাড়ের পাথরের মধ্যে। কেউ কেউ মরীয়া হয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। লিবীয়ার লোকেদের একজন তো, একেবারে ছোকরা সে, সকাতরে কান্না জুড়ে দিল। আমু আর খেরিউশা দুজন মাথা নামিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েকজন দৌড়ে পালাতে গিয়ে কুকুরের তাড়া খেয়ে থেমে গেল।

যারা অপেক্ষাকৃত ধীরস্থির তারা সেইখানেই দশায় পাওয়ার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু মন তাদের দ্রুত কাজ করে চলেছে, খুঁজে চলেছে মুক্তির উপায়। কালো রাজ্যের যোদ্ধাদের ভাগ্য ভাল। পলাতকরা যখন একেবারে দুর্বল, ঠিক সেই সময়ই তারা তাদের খুঁজে পেয়েছে। আগের শক্তির অর্ধেকটা বজায় থাকলেও পলাতকরা দ্বিতীয়বার বন্দীদশার বদলে মৃত্যুকেই বরণ করে নিত। কিন্তু তখন বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ নির্জীব। তাই তীরধনুক বাগিয়ে ধরে যোদ্ধারা যখন এগিয়ে এল, তখন কেউ কোন বাধা দিল না। মুক্তির সংগ্রাম শেষ হয়ে গেল — পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্রের মাঝখানে যারা চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে তারা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি ভাগ্যবান।

জীর্ণক্লান্ত, মুক্তির আশাহত ক্রীতদাসরা নিঃশব্দে বশ্যতা মেনে নিল। ভাগ্যের প্রতি তারা তখন সম্পূর্ণ উদাসীন।

কিছুক্ষণ পরেই পিছমোড়া করে বাঁধা, গলায় শিকল আঁটা একশ চোদ্দ জন ক্রীতদাস চাবুকের ঘা খেতে খেতে চলতে সুরু করল মরুভূমির ভিতর দিয়ে পুবমুখে। কয়েকজন সৈন্য আবার দুর্যোগের জায়গাটা ঘুরে এল। দেখে এল কেউ বেঁচে আছে কিনা।

ফিরিয়ে আনা প্রতিটি ক্রীতদাসের জন্য যোদ্ধারা পুরস্কার পাবে। সেই কারণেই পলাতকরা নৃশংস মৃত্যুর হাত থেকে গেল বেঁচে। একসঙ্গে বেঁধে তাদের নিয়ে যাওয়া হল চাবুক মারতে মারতে,

খাওয়াদাওয়া কিছুই জুটল না, কিন্তু তবু কেউ মরল না। বালি এড়িয়ে কাফিলা রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

পান্দিওন কোনরকমে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গীদের দিকে তাকাবার সাহস তার নেই। কী হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই তার খেয়াল নেই। এমন কি চাবুকের ঘাও তার এই অসাড়তা ঘোচাতে পারল না। দাসত্বের রাজ্যে ফিরে আসার সময়কার একটিমাত্র কথা তার মনে আছে। নীল নদীর তীরে আবিদস সহরের কাছে পেঁছলে পর সৈন্যদলের অধিনায়ক সবাইকে থামিয়ে দেখতে লাগল নদীর ঘাটে বন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট বজরা আছে কিনা। উপত্যকায় নামবার জায়গাটায় বন্দীরা জমায়েৎ হয়েছিল। বন্দীদের কেউ কেউ মাটিতে পড়ে গেল। সকালের বাতাসে ঠাণ্ডা পরিষ্কার জলের গন্ধ।

পান্দিওন দাঁড়িয়েই ছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল একেবারে মরুভূমির ধারে ফুটে রয়েছে সুন্দর নীল ফুল। চারিদিকে সুন্দর গন্ধ ছড়িয়ে তারা তাদের সুদীর্ঘ বৃন্তে দুলছে। পান্দিওনের মনে হল, যে মুক্তি সে হারাল তারই শেষ উপহার এই ফুল।

পান্দিওনের ফাটা রক্ত ঝরা ঠোঁট কেঁপে উঠল। গলা দিয়ে একটা দুর্বল আওয়াজ বেরিয়ে এল। পথে থামার সময় কিদগো তার বন্ধুর দিকে চিন্তিত চোখে তাকাচ্ছিল, পথ চলার সময় তাকে অন্য দলের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। পান্দিওন কী বলল শোনার জন্য কিদগো ঘুরে তাকাল।

'...নীল।' কেবল শেষ কথাটাই কিদগোর কানে পেঁছল, তারপর পান্দিওন আবার যেন অসাড় হয়ে গেল।

পলাতকদের বাঁধন খুলে দিয়ে বজরায় তোলা হল। ঐ বজরাতেই তারা পেঁছল রাজধানীর উপকণ্ঠে। সেখানে সাংঘাতিক একগুঁয়ে বিদ্রোহী বলে কয়েদখানায় পুরে রাখা হল। পরে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে সোনার খনিতে।

কয়েদখানাটা হচ্ছে শক্ত শুকনো মাটিতে একটা বিরাট, ইঁট বাঁধান গহ্বর। খাড়া খাড়া কয়েকটা গম্বুজ দিয়ে ছাদটা তৈরী। ছাদের গায়ে চারটে সরু সরু ফুটো — সেগুলো জানলার কাজ করছে। ছাদের

গায়েই একটা ঢালু সুরঙ্গ-দরজা হল প্রবেশ পথ। খাবার দাবার আর জল সেখান দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়।

কয়েদখানা সারাক্ষণই অন্ধকার। পলাতকদের কাছে সেটা অবশ্য শাপে বর বলতে হবে। কারণ তাদের অনেকেরই চোখ মরুভূমির প্রচণ্ড রোদে ঝলসে গেছে। রোদ্দুরে থাকলে অনেকেই তারা অন্ধ হয়ে যেত।

কয়েকদিনের মুক্তির পর এই দুর্গন্ধ অন্ধকার গহ্বরে বন্দীদশা অসহ্য।

বাইরের জগৎ থেকে তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাদের অনুভূতি অভিজ্ঞতা ভাবনা চিন্তা নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নেই।

তাদের সেই অসহ্য অবস্থা সত্ত্বেও মরুভূমির সেই ভীষণ যাত্রার জের কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সবায়ের মনে কিছু একটার আশা ফিরে এল।

কাভি আবার বরাবরের মতো একটু রুক্ষভাবে সবার বোধগম্য পরিকল্পনা ছকতে লাগল। কিদগোর হাসি আবার শোনা গেল, সেইসঙ্গে আখ্মির তীব্র চীৎকার। পান্দিওনের কিন্তু সামলে উঠতে সময় লাগল, আশাভঙ্গ তার মনে গভীর ছাপ ফেলেছে।

তার নেংটিতে ইয়াখ্মসের দেওয়া সেই পাথরটা সে অনেকবারই অনুভব করেছে। কিন্তু তার মনে হয়েছে, এই অন্ধকার বিশ্রী গহ্বরে সেই সুন্দর উপহারটিকে বের করলে তার অমর্যাদা করা হবে। তাছাড়া পাথরটাও তাকে ঠকিয়েছে। তার কিছুই মন্ত্রশক্তি নেই। সে পান্দিওনকে পারেনি মুক্তি দিতে, সমুদ্রে পৌঁছে দিতে।

শেষ পর্যন্ত পান্দিওন লুকিয়ে নীলচে সবুজ স্ফটিকটা বের করে ছাদের গায়ের সেই ফুটো দিয়ে এসে পড়া আলোয় ধরল। সে আলো মাটি অবধি পৌঁছয় না। পাথরের সেই প্রফুল্ল আলোর ছটা চোখে পড়া মাত্রই পান্দিওনের মনে আবার সংগ্রামের উৎসাহ দেখা দিল, আবার বাঁচার ইচ্ছা জেগে উঠল। সবকিছু থেকেই সে বঞ্চিত। এমনকি তেস্সার কথা ভাবার সাহসও তার নেই, দেশের কথা মনে করতে তার ভয় হয়। একমাত্র এই পাথরটাই তার রয়েছে — এ পাথর যেন সমুদ্রের স্বপ্ন, অন্য জীবনের কথা। যে সত্যিকার জীবনের স্বাদ সে এককালে পেয়েছিল

তার স্বপ্ন। পান্দিওন ফিরে ফিরে পাথরটার দিকে তাকাতে লাগল। পাথরটার স্বচ্ছ গভীরতায় সে খুঁজে পেল এক মোহন আনন্দ যা না থাকলে জীবন ধারণ হয়ে পড়ে অসম্ভব।

পান্দিওন আর তার সঙ্গীদের মাটির নিচের এই কয়েদখানায় দিন দশেকের বেশি থাকতে হল না। কোন জিজ্ঞাসাবাদ বা বিচার না করেই উপরের জগতের কর্তারা পলাতক ক্রীতদাসদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিল। একদিন দুয়োরটা হঠাৎ খুলে গিয়ে কয়েদখানায় নেমে এল একটা কাঠের মই। ক্রীতদাসদের উপরের চোখধাঁধান আলোয় এনে তৎক্ষণাৎ ছ'জন করে একসঙ্গে বেঁধে ফেলা হল। তারপর নীল নদীতে পেঁৗছিয়ে দিয়ে একটা মস্ত বড় বজরায় তুলে উজানে নৌকো ভাসিয়ে দেওয়া হল। বিদ্রোহীদের নিয়ে বজরা চলল কালো রাজ্যের দক্ষিণে, দাক্ষিণাত্য-তোরণের* দিকে। সেখান থেকে তাদের শেষ যাত্রা সুরু হবে নুব রাজ্যের** সোনার খনির উদ্দেশে — সেখান থেকে কেউ কখনো ফেরে না।

মাটির নিচের কয়েদখানা ছেড়ে ভাসমান জেলখানায় ক্রীতদাসরা আসার একপক্ষকাল পরে, তা-কেমের রাজধানীর দক্ষিণে, নীল নদীর উজানে পাঁচলক্ষ হাত দূরে নেব দ্বীপে দাক্ষিণাত্য-তোরণের শাসকের বিরাট প্রাসাদে নিচের ঘটনাটি ঘটল।

দাক্ষিণাত্য-তোরণের শাসক, নেব প্রদেশেরই শাসক, নিষ্ঠুর অত্যাচারী কাবুয়েফ্‌তা সৈন্যদলের সেনাপতি, শিকারের অধিপতি আর দাক্ষিণাত্যের প্রধান কাফিলা সর্দারকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কাবুয়েফ্‌তা নিজেকে কালো রাজ্যের ফারাওয়ের পরেই বলে মনে করেন।

---

* দাক্ষিণাত্য-তোরণ — নেব ও সোয়ান সহর। বর্তমান এলিফেন্‌টাইন আর ফিলায়ে দ্বীপের সিয়েন আর আসোয়ান।

** নুব রাজ্য — (নুব — মিশরী ভাষায় সোনা) প্রথম চড়াইয়ের দক্ষিণে নীল তীরবর্তী রাজ্যগুলি। পরে নুবিয়া নামে পরিচিত।

কাব্য়েফ্তা তাঁর প্রাসাদের ঝুলবারান্দায় অতিথিদের নিয়ে বিরাট ভোজে বসেছেন। তাঁর প্রধান পেশকারও সেখানে উপস্থিত। গাঁট্টাগোঁট্টা কাব্য়েফ্তা ফারাওয়ের অনুকরণে আবলুস কাঠ আর গজদন্তের তৈরী একটা সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসে, চারপাশে অনুচরবর্গ।

নিমন্ত্রিত কর্মচারীদের মধ্যে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বিনিময়টা তাঁর চোখে কয়েকবার পড়ায় তিনি নিজের মনে হাসলেন।

প্রাসাদটি দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু জায়গায়। ঝুলবারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে বিরাট নদী চুনাপাথর আর লাল গ্রানিটে তৈরী কয়েকটা মন্দিরকে পাক দিয়ে চলে গেছে বহুদূরে। নদীতীরে তালগাছের ঘন সারি। নদীতীরের খাড়া পাথুরে পাহাড়ের পাদদেশে তাদের পালকের মতো ঘন পাতার রেখা ছড়িয়ে পড়েছে। দক্ষিণে উঁচু মালভূমির ধারে একটা খাড়া গ্রানিট পাথরের দেয়াল। মালভূমির পূব অন্তে নীলের প্রথম চড়াই। সেখানে এসে নদীর উপত্যকাটা হঠাৎ গেছে সরু হয়ে। শান্ত সুকর্ষিত ক্ষেতের উদার বিস্তৃতির উপর হঠাৎ এসে পড়েছে সোনার দেশ নুবের বিরাট মরুভূমি। পাহাড়ের গায়ের ধাপ থেকে দাক্ষিণাত্যের পূর্বতন শাসকদের সমাধি নিচের প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে আছে — কালো লোকদের রাজ্য আবিষ্কারে যে দুঃসাহসীরা বেরিয়েছিলেন তাঁদের সমাধি। তাঁদের অগ্রণী মহামতি হেরকুফ। ষষ্ঠ রাজবংশের* রাজত্বকালে তিনি দক্ষিণ দেশে কাফিলা নিয়ে আসেন।

দূর থেকে খাড়া রেখার মতো কি যেন লিপি দেখা যাচ্ছে। আসলে ওগুলো খুব লম্বা লম্বা করে খোদাই করা চিত্রলিপি। অভিজ্ঞ মরুযাত্রীদের চোখে তাদের নির্দিষ্ট রেখাগুলো ঠিক ধরা পড়বে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের শাসকের অবশ্য এসব পড়ার কোনই প্রয়োজন নেই। পুন্ত্ (পুওনি) রাজ্যে তাঁর যাত্রা সম্বন্ধে হেমু দর্পভরে যা লিখে গেছেন কাব্য়েফ্তার তা মুখস্থ হয়ে গেছে। "অষ্টম বছরে ... শীলমোহরের রক্ষক, যা কিছু আছে এবং না আছে তার রক্ষক, মন্দির

---

* খৃঃ পূঃ ২৬২৫ — ২৪৭৫।

গোলা আর সাদা বাড়ির পরিদর্শক, দাক্ষিণাত্য-তোরণের রক্ষক ...”* তার উপকথার পূর্বপুরুষের মতো কাবুয়েফ্‌তাও এতসব উপাধির অধিকারী।

গরমে দূরের দৃশ্য আবছা ধূসর পর্দায় ঢাকা পড়ে গেছে। দ্বীপটায় কিন্তু ঠাণ্ডা — দক্ষিণ থেকে আসা উত্তাপকে উত্তুরে হাওয়া রোদে-পোড়া নির্জন সমতলে ঠেলে ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছে।

দাক্ষিণাত্যের শাসক অনেকক্ষণ ধরে তাঁর পূর্বপুরুষদের সমাধির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হাতের ইশারায় একজন ক্রীতদাসকে শেষবারের মতো মদের পাত্র ভরে দিতে বললেন। ভোজ শেষ হল। অতিথিরা উঠে গৃহকর্তার পিছন পিছন প্রাসাদের ভিতরে একটা চৌকো ঘরে এল। ঘরটা খুব বেশি উঁচু নয়। তৃতীয় তুথ্‌মোসিসের** সময়কার রীতিতে সুন্দর কারুকাজ করা। মসৃণ সাদা দেয়ালগুলোর তলায় চওড়া নীল পাড়। তার উপর সাদা সরল রেখায় নানা জটিল নক্‌সা। সিলিংয়ের কাছে একটা সরু ডোরায় ম্লান সোনালি পটভূমিকার উপর নীল সবুজ কালো আর সাদা টানে আঁকা পদ্ম আর প্রতীকী মূর্তির ছক।

গাঢ় চেরি রঙের চারটে কাঠের বরগা দিয়ে সিলিংটা বিভক্ত, চারপাশে কালো আর সোনালি রঙের জালিকাটা। বরগাগুলোর মাঝের ফাঁকা জমিতে উজ্জ্বল রঙে রঙিন লাল নীল জালিকাজের উপর সোনালি ঘূর্ণি আর সাদা ফুল।

পালিশ করা দেবদারু কাঠের চওড়া দরজার ফ্রেমের ধারে সরু সরু কালো ডোরা, তার উপর জোড়ায় জোড়ায় অসংখ্য নীল রেখা।

সেই বড়, আলো বাতাসে ভরা ঘরটার আসবাব পত্রের মধ্যে রয়েছে একটা গালিচা, চিতাবাঘের চামড়ায় ঢাকা হাতির দাঁতের কয়েকটা ভাঁজকরা চেয়ার, দুটো সোনা বসান আবলুস কাঠের আরামকেদারা, পায়াওয়ালা গোটা কয়েক সিন্দুক — সেগুলো আবার টেবিলেরও কাজ করে।

---

* মূল মিশরী পাঠের গোলেনিশ্চেভকৃত রুশ-অনুবাদ থেকে উদ্ধৃতি।

** ফারাও তৃতীয় তুথ্‌মোসিস (খৃঃ পূঃ ১৫০১ — ১৪৪৭) — রাষ্ট্রনেতা ও যোদ্ধা। মিশরের অনেক যুদ্ধ বিজয় তাঁর হাতে ঘটেছিল।

কাবুয়েফ্‌তা ধীরে সুস্থে একটা আরামকেদারায় বসলেন। সাদা দেয়ালের পটভূমিকায় তাঁর তীক্ষ্ম মুখাবয়ব ফুটে উঠল। রাজকর্মচারীরা তাদের চেয়ার একটু কাছে টেনে আনল। সোনা আর হাতির দাঁতের কাজ করা আবলুস কাঠের উঁচু টেবিলটার কাছে দাঁড়াল প্রধান পেশকার।

পালিশ-করা টেবিলে রয়েছে প্যাপিরাস, তার উপর লাল সাদা শীলমোহর। দাক্ষিণাত্যের শাসকের ইশারায় প্রধান পেশকার পাকান প্যাপিরাসের তাড়া খুলে এক মিনিট শ্রদ্ধাভরে চুপ করে রইল।

লম্বা শরীর, টাকমাথা, পরচুলাহীন সৈন্যদলের সেনাপতি কাফিলার ছোট্টখাট্ট শক্তসমর্থ পরিচালককে চোখ টিপে জানাল — এবার কাজের আলোচনা চলবে।

কাবুয়েফ্‌তা মাথা হেলিয়ে রাজকর্মচারীদের উদ্দেশে বললেন:

'উত্তর ও দক্ষিণ কালো রাজ্যের শাসক, জীবন, স্বাস্থ্য, শক্তি, মহারাজাধিরাজ, আমায় একটা জরুরী চিঠি পাঠিয়েছেন। সে চিঠিতে মহারাজাধিরাজ আমায় এক অভূতপূর্ব কাজ করতে বলেছেন — ভাভাতের* ওদিকে যে শিংওয়ালানাক জন্তু পাওয়া যায়, সেই জন্তু একটা রাজধানীতে পাঠাতে হবে। জন্তুগুলো যেমন শক্তিশালী তেমনি হিংস্র। অতীতে দক্ষিণদেশ থেকে বহু জন্তু বড়বাড়িতে জ্যান্ত চালান দেওয়া হয়েছে। রাজধানী আর তা-মেরি-খেবের লোকেরা বিরাট বানর, জিরাফ, সেথের জন্তু** আর বিশেষ জাতের শুয়োর দেখেছে। হিংস্র সিংহ আর চিতাবাঘ মহামতি রামসেসের*** সঙ্গী হয়েছিল, এমনকি তা-কেমের শত্রুর সঙ্গে তারা লড়াইও করেছে। কিন্তু জ্যান্ত গণ্ডার কখনো ধরা যায়নি...

---

* ভাভাত — বর্তমান আসোয়ান আর খার্তুমের মাঝখানে নীল নদীর অংশ।

** সেথের জন্তু — ওকাপি। জিরাফ বংশের প্রাণী। এখন কেবল কঙ্গোর গভীর বনে পাওয়া যায়। আগে আফ্রিকার সবখানেই পাওয়া যেত। নীল নদীর বদ্বীপে অসংখ্য ওকাপি ছিল। অন্ধকারের দেবতা ভয়ানক সেথের মূর্তি ওকাপির আদর্শেই রচিত।

*** ২য় রামসেস (খৃঃ পূঃ ১২২৯ — ১২২৫), দিগ্বিজয়ী। হিত্তাইত্‌দের বিরুদ্ধে মিশরীদের হয়ে পোষা সিংহ লড়েছিল।

'স্মরণাতীত কাল থেকে দাক্ষিণাত্যের শাসকরা কালো রাজ্যে যা কিছু দরকার তা কালো লোকদের দেশ থেকে পাঠিয়েছে। কোন কিছুই তারা অসম্ভব বলে মনে করেনি। আমিও সেই গৌরবজনক ঐতিহ্য বজায় রাখতে চাই: তা-কেমকে জ্যান্ত গণ্ডার দেওয়াই চাই। তোমাদের ডেকেছি, কী করে অন্তত একটা গণ্ডারও তা-কেমে পাঠান যায় সে বিষয়ে পরামর্শ নিতে। নেহ্‌জি, তুমি তো অনেক বড় বড় শিকার দেখেছ, তুমি কী বল?' বিষণ্ণ, স্থূলবপু শিকারের অধিপতিকে জিজ্ঞেস করলেন। শিকারের অধিপতির ঢেউখেলান চুল, ময়লা রং আর টিয়াপাখি নাক দেখে বোঝা যায় লোকটি হিক্‌সোস।

'দক্ষিণ সমতলের গণ্ডার ভীষণ হিংস্র। গায়ের চামড়া বর্শা দিয়েও ফোঁড়া যায় না, গায়ে হাতির মতো জোর,' নেহ্‌জি মুরুব্বী চালে বলতে সুরু করল। 'ওখানকার গণ্ডাররা প্রথমেই আক্রমণ করে, যা কিছু সামনে পড়ে মাড়িয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেয়। খাদে ফেলে ধরবারও উপায় নেই, তাতে ভারী জন্তু জখম হয়ে যাবে। বেশ বড় আকারে শিকারের ব্যবস্থা করলে পরেই একটা মাদী আর তার বাচ্চার পিছনে ধাওয়া সম্ভব। মাটাকে মেরে বাচ্চাটাকে কেম্‌তে পাঠিয়ে দেওয়া যায় ...'

কাবুয়েফ্‌তা রেগে উঠে কুরসীর হাতলে ঘা মারলেন:

'আমি "বড়বাড়ির" অনুগত দাস, রাজার পায়ের তলে আমার স্থান, তোমার মুখে থুথু ফেলি,' স্তম্ভিত শিকারের অধিপতির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'মহারাজাধিরাজের বিরুদ্ধে তুমি অন্যায় কর। আধমরা বাচ্চা হলে চলবে না, বিরাট জন্তু চাই — নেফের-নেফেরু, সবচেয়ে ভাল তেজী গণ্ডার, যাকে দেখলেই ভয় করে। বাচ্চা ধরা পড়ে কবে বড় হবে ততদিন অপেক্ষা করাও চলবে না ... রাজার আদেশ তাড়াতাড়ি পালন করতে হবে, গণ্ডারদের আস্তানা আবার দাক্ষিণাত্য-তোরণ থেকে অনেক দূরে।'

কাফিলার পরিচালক পেখেনি বলল, গণ্ডার ধরার জন্য তিনশ সবচেয়ে সাহসী সৈন্য পাঠান হক। অস্ত্রশস্ত্রের বদলে দড়ি আর জাল নিলেই চলবে।

সৈন্যদলের সেনাপতি, সেনফ্রি, তা শুনে অসন্তোষে মুখ বাঁকাল। কাবুয়েফ্‌তাও ভুরু কোঁচকালেন।

তখন কাফিলার পরিচালক বলল, সৈন্যদের পাঠানর দরকার নেই, নুবিয়াবাসীদেরই বরং গণ্ডার ধরতে বাধ্য করা হক।

কাবুয়েফ্‌তা মাথা নেড়ে বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন:

'তুথ্‌মোসিস আর রামসেসের কাল আর নেই। নুব রাজ্যের হীন লোকগুলো আমাদের আর মোটেই তেমন মান্য করে চলে না। কত কলাকৌশল, কষ্ট করে এই ক্ষুধার্ত হতভাগাদের দাবী দাওয়া, খাঁই ইত্যাদি দাবিয়ে রাখতে হচ্ছে তা সেনফ্রি জানে... না, গণ্ডার আমাদের নিজেদেরই ধরতে হবে ...'

'আচ্ছা সৈন্যদের বদলে ক্রীতদাসদের পাঠালে কী রকম হয়,' সেনফ্রি সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

চিন্তিত কাবুয়েফ্‌তা হঠাৎ উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন।

'সর্বদ্রষ্টা, সত্যের দেবী মাআতের নামে শপথ করে বলছি, ঠিক বলেছ। কয়েদখানা থেকে বিদ্রোহী আর পলাতকদের বেছে নেব। এরাই ক্রীতদাসদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী। ওরাই পারবে।'

শিকারের অধিপতির মুখে একটা অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল।

'কুমার, তুমি তো সবই জানো, সবই বোঝো। যদি কসুর মাফ করো তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ক্রীতদাসদের তুমি গণ্ডারের হাতে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হতে কী ভাবে বাধ্য করবে? ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, মৃত্যুর বদলে মৃত্যুর ভয়ে কীই বা এসে যাবে?'

'নেহ্‌জি, তুমি মানুষের চেয়ে জন্তুদেরই ভাল চেন। ওদের আমার হাতে দাও। আমি ওদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেব। মুক্তির জন্য যারা একবার মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত হয়েছে, তারা আবার তাতে রাজী হবে। সেই জন্যই বিদ্রোহীদেরই ডাক পাঠাব।'

'তারপর তোমার প্রতিশ্রুতি রাখবে?' নেহ্‌জি আবার জিজ্ঞেস করল।

কাবুয়েফ্‌তা তাঁর তলের ঠোঁটটা উদ্ধত ভঙ্গীতে ফোলালেন।

'দাক্ষিণাত্যের শাসকের মর্যাদাবোধ তাকে ক্রীতদাসদের কাছে মিথ্যা কথা বলার মতো নীচ কাজ কখনো করতে দেবে না। তবে গণ্ডার শিকারের পর কেউই ফিরবে না... যা হক সে ভার আমার উপর। এখন তুমি বল গণ্ডার ধরতে কত লোক তোমার দরকার। আর গণ্ডারের আস্তানা কতদূরে।'

'অন্তত দুশলোক চাই। অর্ধেক গণ্ডারের হাতে মারা পড়বে, বাকি সবাই তাদের সংখ্যার জোরে জন্তুকে ঘায়েল করে বেঁধে ফেলবে। আর দুমাস পরে নুব দেশে বন্যার সময় সুরু হবে। সমতলে ঘাস গজাবে। গণ্ডাররা তখন উত্তরে ঘাসের সন্ধানে আসবে। তখন নদীর ষষ্ঠ ধাপের জায়গায় ওদের দেখা যাবে। নদীর কাছাকাছি ধরতে পারা চাই। তা না হলে সাতটা ষাঁড়ের সমান ভারী জ্যান্ত গণ্ডার ওরা বইতে পারবে না। নদীর কাছে হলে খাঁচায় পুরে একেবারে সহরে নিয়ে যাওয়া যায়...'

দাক্ষিণাত্যের শাসক তখন একমনে কী যেন হিসাব করে চলেছেন, তাঁর ঠোঁটদুটো কাঁপছে।

'হেত্!' অবশেষে তিনি বললেন। 'তাই হবে। দেড়শ ক্রীতদাস যদি ভালভাবে লড়াই করে, তবে যথেষ্ট হবে। একশ যোদ্ধা, কুড়ি জন শিকারী আর পথপ্রদর্শক... নেহ্জি, তুমি এদের দলপতি হবে! যাও এক্ষুনি গিয়ে সব জোগাড়যন্তর সুরু করে দাও। সেনফ্রি নির্ভরযোগ্য যোদ্ধা আর শান্তিপ্রিয় নিগ্রোদের* বেছে নেবে।'

শিকারের অধিপতি মাথা নুইয়ে আদেশ মেনে নিল।

নেহ্জির নতুন কাজ নিয়ে একটু হেসে রাজকর্মচারীরা চলে গেল।

কাবুয়েফ্তা পেশকারকে বসিয়ে মুখে মুখে বলে যেতে লাগলেন দাক্ষিণাত্য-তোরণের নেব আর সোয়ান সহরের কয়েদখানার পরিচালকদের চিঠি।

---

* সৈন্য আর পুলিশবাহিনীতে কর্মরত নিগ্রোদের মিশরীরা এই নামেই ডাকত।

সোনার প্রান্তর

নেব দ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তে পাহাড়ের গা থেকে একটা সিঁড়ি নেমে এসেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একদল ক্রীতদাস, নিচের ধাপের উপরের গ্রানিটের স্তম্ভগুলো থেকে ঝোলানো ব্রোঞ্জের বিরাট আংটায় তারা বাঁধা। পালানর পর ফিরে আসা একশ চোদ্দ জনই আছে, সেই সঙ্গে আরো চল্লিশ জন নিগ্রো আর নুবীয়। তাদের মুখে হিংস্র ভাব, সারা শরীর

পুরনো ক্ষতচিহ্নে ভরা। সবাই অনেকক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ভাগ্যে কী আছে তাই জানার।

অবশেষে সাদা পোষাক পরা একজন লোক সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কপালে, বুকে আর হাতের কালো দণ্ডে সোনার ঝলক। দুটি নুবীয় যোদ্ধার হাতের পাখার ছায়ায় মন্থর গতিতে তিনি এলেন। ইনিই হচ্ছেন দাক্ষিণাত্যের শাসক কাবুয়েফ্‌তা। কয়েকজন তাঁকে ঘিরে আছে। সাজপোষাক দেখে বোঝা গেল, তারা সবাই উঁচুদরের রাজকর্মচারী।

যোদ্ধারা তাড়াতাড়ি ক্রীতদাসদের ঘিরে দাঁড়াল। বন্দীদের সঙ্গে কয়েদখানার এক পেশকার ছিল। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে শাসকের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করল।

কাবুয়েফ্‌তা ধীরস্থির শান্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ক্রীতদাসদের কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর স্থিরমুখে এতটুকু ভাব পরিবর্তন দেখা গেল না। উপস্থিত সকলের দিকে তিনি একবার দ্রুত ঘৃণার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। একজন রাজকর্মচারীর দিকে ঘুরে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে কী একটা যেন বললেন, তাঁর গলায় সন্তোষের সুর ফুটে উঠল। দাক্ষিণাত্যের শাসক মাটিতে তাঁর দণ্ড ঠুকলেন। পাথরের পথের উপরে দণ্ডের তামার মুঠির তীব্র আওয়াজ শোনা গেল।

'সবাই এদিকে তাকিয়ে আমার কথা শোন! যারা কেম্‌তের ভাষা জানে না তাদের একপাশে সরিয়ে দেওয়া হক; তাদের সবকিছু পরে বুঝিয়ে বলা হবে।'

যোদ্ধারা তাড়াতাড়ি শাসকের হুকুম মতো কেম্‌তের ভাষা না-জানা পনের জন নিগ্রোকে একপাশে সরিয়ে দিল।

কাবুয়েফ্‌তা ধীরে ধীরে, জোরে জোরে প্রাকৃত ভাষায়, সযত্নে শব্দ চয়ন করে বলতে সুরু করলেন। বোঝা গেল কাবুয়েফ্‌তা প্রায়ই বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলে অভ্যস্ত।

কাবুয়েফ্‌তা ক্রীতদাসদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। অনেককেই যে মরতে হবে, সেকথা তিনি চেপে রাখলেন না, কিন্তু যারা বেঁচে থাকবে তাদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিলেন। বন্দীদের অধিকাংশ চেঁচিয়ে

উঠে তাদের সম্মতি জানাল। অন্যেরা গোমড়া হয়ে রইল। কিন্তু কেউ 'না' বলল না।

'হেত্!' কাবুয়েফ্তা আবার হাড় বের করা নোংরা শরীরগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে চললেন। 'তবে তাই হক। তোদের ভাল খাবার দাবার আর স্নান করার সুযোগ দেওয়ার কথা আমি বলে দেব। হাপির পাঁচটা চড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দুর্গম পথে যেতে হবে। ছোট ছোট হালকা নৌকো নিয়ে যাওয়াই ভাল। তোরা যদি শপথ করে বলিস পালাবি না, তবে তোদের ছেড়ে দিতে বলব...' আনন্দের চীৎকারে তাঁর কথায় বাধা পড়ল। চীৎকার থামা পর্যন্ত তিনি চুপ করে রইলেন, তারপর বলে চললেন, 'শপথ ছাড়াও এ কথাও জানান রইল — যদি কেউ পালায় তাহলে তার দশজন সবচেয়ে বড় বন্ধুকে ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে নুবের নদীতীরের বালিতে ফেলে রাখা হবে। গণ্ডার ধরার সময় যারা ভয় পেয়ে পালাবে তাদের জন্য ভীষণ অত্যাচার তোলা থাকবে। নুবের অধিবাসীদের আমি সাবধান করে দিয়েছি। শাস্তির ভয়ে তারা পলাতকদের ঠিক খুঁজে বের করবে।'

কাবুয়েফ্তার শেষ কথাগুলো শুনে সবাই বিষণ্ণ মুখে চুপ করে রইল। কাবুয়েফ্তা সে সব খেয়াল না করে আবার ক্রীতদাসদের সবাইকে দেখে নিলেন। অভিজ্ঞ লোক, নির্বাচনে এতটুকু ভুল হল না।

'এখানে এস,' কাবুয়েফ্তা কাভিকে ডাকলেন। 'ফাঁদপাতিয়েদের ভার তোমার উপর। সেই সঙ্গে তোমার সঙ্গীদের সঙ্গে আমার শিকারীদের মধ্যস্থতার ভারও নেবে।'

কাভি ধীরেসুস্থে মাথা হেলিয়ে কাবুয়েফ্তাকে নমস্কার করল। তার মুখে ফুটে উঠল গোমড়া হাসি।

'কুমার, খুব চড়া দামেই তুমি আমাদের কাছে মুক্তি বেচছ, কিন্তু তবু আমরা তা কিনতে প্রস্তুত,' একথা বলে কাভি সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'সোনার খনির চেয়ে বুনো গণ্ডার খারাপ নয়, আমাদের আশা বরং বাড়ল...'

কাবুয়েফ্তা চলে গেলেন। ক্রীতদাসরাও কয়েদখানায় ফিরল। কাবুয়েফ্তা তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখলেন। বিদ্রোহীদের খাবার দাবারের ভাল

ব্যবস্থা হল। শিকল আর পাত থেকেও তারা মুক্ত হল। দিনে দুবার করে তাদের নীল নদীতে স্নান করার জন্য নিয়ে যাওয়া হতে লাগল কুমীরের হাত থেকে বাঁচানর জন্য বেড়া দেওয়া বিশেষ স্নানের জায়গায়। দুদিন পরে একশ চুয়ান্নজন ক্রীতদাসকে যোদ্ধা আর শিকারীদের সঙ্গে নলখাগড়ার হালকা নৌকোয় তোলা হল। নৌকোগুলো ভেসে চলল উজানে।

দীর্ঘ পথ। কালো রাজ্যের লোকেদের হিসাব অনুযায়ী দাক্ষিণাত্য-তোরণ থেকে নীল নদীর ষষ্ঠ চড়াইটা হচ্ছে ৪০ লক্ষ হাত দূরে। ভাভাত আর ইয়ের্তেত্ দেশের ভিতর নদীটা সোজা গেছে। কিন্তু অনেক উজানে কুশ রাজ্যে* এসে নদীটা দুটো বিরাট বাঁক নিয়েছে, একটা পশ্চিমে, একটা পূবে।

শিকারের অধিপতির তখন মহাতাড়া: পেঁছতেই দুমাস লাগবে। অথচ নসপ্তাহের মধ্যে জল বেড়ে উঠবে। স্রোত বেড়ে গেলে উজানে নৌকো চালান আরো কঠিন হয়ে উঠবে। তাছাড়া, বন্যা যখন প্রবল, তখন শুধু চড়াইয়ের ভিতর দিয়ে বিরাট গণ্ডারকে ভারী নৌকোয় নিয়ে আসা সম্ভব। তাই ফিরে আসার জন্য খুব কমই সময় পাওয়া যাবে।

দীর্ঘযাত্রায় ক্রীতদাসরা ভাল খেতে পেয়ে বেশ সুস্থ সবল হয়ে উঠল, যদিও প্রতিদিন নৌকো বাওয়ার ভীষণ খাটুনি ছিল, চড়াইয়ের কাছে স্রোত আবার খুবই জোরাল হয়ে ওঠে।

আগামী শিকার নিয়ে কারো তেমন দুশ্চিন্তা নেই। সে তো এখনো পরের কথা। তাছাড়া প্রত্যেকেরই স্থির ধারণা যে, সে বেঁচে যাবে, মুক্তি পাবে। অজানা বিস্তৃত বুনো দেশের মধ্যে দিয়ে তারা চলেছে। আগে তাদের ভীষণ শাস্তির অপেক্ষায় অন্ধকূপের মধ্যে বসে থাকতে হয়েছে — কী বিরাট তফাৎ। এখন সবাই দেহে মনে পুরোপুরি চাঙা হয়ে উঠে প্রাণপণে কাজ করে চলেছে। শিকারের অধিপতি তাদের কাজকর্ম দেখে

---

* কুশ রাজ্য — দ্বিতীয় আর পঞ্চম চড়াইয়ের মধ্যবর্তী নীল উপত্যকার মিশরী নাম। জাম আর কারোই — এই দুটি প্রাচীন রাজ্য এর অন্তর্ভুক্ত। ইয়ের্তেত্ ছিল দ্বিতীয় চড়াইয়ের দক্ষিণস্থ প্রদেশ। ভাভাত ছিল দাক্ষিণাত্য-তোরণ আর ইয়ের্তেতের মাঝখানে।

খুসী, তাই ক্রীতদাসদের খাবার দিতে তার আপত্তি নেই — পথে যে যে সহর আর গ্রাম পড়ল সেখান থেকে খাবার দাবার সব এল।

নেব দ্বীপ ছাড়ার পরেই পান্দিওন আর তার সঙ্গীরা নীলের প্রথম চড়াই দেখতে পেল। পাথরের সংকীর্ণ ফাঁকের মধ্যে দিয়ে আলাদা আলাদা খাতে প্রচন্ড বেগে নদী বয়ে চলেছে। ফুঁসে ওঠা সাদা জল কালো পাথরের জঞ্জাল ভেদ করে সগর্জনে পাগলের মতো ছুটে চলেছে। পান্দিওনদের শত শত বছর আগে হাজার হাজার ক্রীতদাস তা-কেমের সবচেয়ে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের তদারকীতে গ্রানিট পাথর কেটে বড় বড় খাল তৈরী করেছে। সে খাল দিয়ে বড় বড় যুদ্ধজাহাজও সহজে চড়াই পার হয়ে যেতে পারে। শিকার অভিযানের হালকা নৌকোগুলো একরকম অনায়াসেই চড়াইগুলো পার হয়ে গেল। ক্রীতদাসরা কোমর জলে নেমে এক পাথর থেকে আরেক পাথরে নৌকো ঠেলে নিয়ে চলতে লাগল। একেক সময় তারা বন্যার জলে কাটা তীরের খাঁজ দিয়ে নৌকো ঘাড়ে করে নিয়ে চলল। দিনের পর দিন শিকারীরা ক্রমশ দক্ষিণের দিকে এগোতে থাকল।

নদীর বাঁ তীরে একটা পাহাড়-কাটা মন্দির তারা পার হল। পান্দিওনের নজরে পড়ল একটা বিরাট কুলুঙ্গীতে দাঁড় করান ত্রিশ হাত উঁচু চারটি বিরাট মূর্তি। দিগিবজয়ী ফারাও দ্বিতীয় রামসেসের মূর্তি যেন মন্দিরের দ্বাররক্ষার কাজ করছে।

দ্বিতীয় চড়াই পার হতে একটা পুরো দিন লাগল। আরো উজানে গিয়ে তারা উরোনার্তু দ্বীপে পৌঁছল। সেখানে সেম্‌নের খরস্রোত। জলে ক্ষয়ে যাওয়া পাথুরে তীরের উপর নশতাব্দীর পুরনো একটা দুর্গ। নুব বিজয়ী ফারাও'র তৈরী।* দুর্গটার নাম 'বন্যজয়ী'।

রোদে পোড়া ইঁটের তৈরী কুড়ি হাত উঁচু মোটা দেয়ালগুলো এখনো চমৎকার অবস্থায় আছে। প্রতি ত্রিশ বছর অন্তর তাদের মেরামত করা হয়।

---

* তৃতীয় সেনুস্রেৎ (উপকথার সেসোস্‌ত্রিস), খৃঃ পূঃ ১৮৮৭ — ১৮৪৯, দ্বাদশ বংশের (খৃঃ পূঃ ২০০০ — ১৭৮৮) এক ফারাও, তাঁর বিরাট সব নির্মাণকার্যের জন্য বিখ্যাত।

পাহাড়ের গায়ে পাথরের ফলক বসান। তাতে লেখা রয়েছে, তা-কেম রাজ্যে নিগ্রোদের প্রবেশ নিষেধ।

বিষণ্ণ ধূসর দুর্গটার কোণে কোণে চৌকো মিনার, তাছাড়া নদীর দিকেও আরো কতগুলো মিনার। সরু সিঁড়ি নদী থেকে এসে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে দুর্গে চলে গেছে। চারপাশের সবকিছু ছাপিয়ে রয়েছে দুর্গটা — কেম্‌তের দর্প ও বলের প্রতীক। ক্রীতদাসরা কেউ সন্দেহ করতে পারেনি যে, কেম্‌তের গৌরবের যুগ শেষ হয়ে গেছে; অসংখ্য নিপীড়িতদের শ্রমে গঠিত কেম্‌ত অনবরত বিদ্রোহের ফলে ভেঙে পড়েছে। তাছাড়া নতুন যে জাতির শক্তি ক্রমেই বেড়ে উঠছে কেম্‌ত এখন সেই শক্তির সম্মুখীন।

যেতে যেতে নদীতীরের পাথুরে তীরে বা দ্বীপে আরো চারটে দুর্গ দেখা গেল। তারপর নৌকোটা নদীর মাঝখানের একটা বাঁক ফিরে এগিয়ে গেল। বাঁকের মাঝখানে হেম-আতন সহর। এই সহর যাঁর সৃষ্টি, সেই ধর্মদ্রোহী ফারাও'র রাজধানীর ভগ্নাবশেষেই পান্দিওন সেই রহস্যময় মেয়ের মূর্তি খুঁজে পেয়েছিল। সহরের অধিবাসীরা মিশরী। তারা হয় অনেক কাল আগে কালো রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছে, নয়ত নির্বাসিত হয়েছে। বাঁকের শেষে নদীটা সমকোণে ঘুরে ময়লা রং বালিপাথরের উঁচু পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। এইখানেই সুরু প্রায় এক লক্ষ হাত লম্বা খরস্রোতের সংকীর্ণ খাত। এই খাত পার হতে চার দিন লাগল।

নুবের রাজাদের রাজধানী নাপাতার ওপারে নীলের চতুর্থ অংশটি আরো লম্বা — পার হতে লাগল পাঁচ দিন। শিকারের অধিপতি আর কুশের রাজাদের মধ্যে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনায় কাটল আরো দু দিন। চতুর্থ চড়াইয়ে নুবীয়দের নিয়ে তিনটে নৌকো শিকারীদের ছাড়িয়ে গেল। নৌকো তিনটেকে গণ্ডারের সন্ধানে আগে পাঠান হয়েছিল।

তা-কেমের চেয়ে এখানে নদীতীরের বসতি অনেক কম আর দূরে দূরে ছড়ান। উপত্যকাটাই এখানে অনেক সংকীর্ণ। মরুভূমির মালভূমি ঘিরে রাখা পাথরগুলোকে তাপের কুজ্‌ঝটিকা সত্ত্বেও পরিষ্কার দেখা যায়। অসংখ্য কুমীর, তাদের একেকটা প্রকাণ্ড আকারের, ঝোপঝাড়ের

মধ্যে লুকিয়ে আছে, নয়ত খর সূর্যে কালচে-সবুজ পিঠ মেলে বালুতীরে শুয়ে আছে। নিঃশব্দ খল কুমীরদের হাতে কয়েক জন অসাবধান ক্রীতদাস আর যোদ্ধা সঙ্গীদের চোখের সামনেই মারা পড়ল।

নদীতে জলহস্তীর সংখ্যাও কম নয়। এই কুশ্রী জন্তুগুলো পান্দিওন, এগ্রাস্‌কান প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের ক্রীতদাসরা আগেও দেখেছে। মিশরী ভাষায় এদের বলা হয় 'খ্‌তে'। জলহস্তীগুলো মানুষ দেখে ভয় পেল না, আবার অকারণে আক্রমণও করল না। সবাই তাই প্রায় ওদের গা ঘেঁষেই নির্বিবাদে নৌকো নিয়ে চলে গেল। দূরে সবুজ নলখাগড়ার সামনে নদীর বুকে বড় বড় নীল ছাপ, উপত্যকার চওড়া অংশে নদী ছড়িয়ে পড়ে শান্ত হ্রদের মতো হয়েছে। সেইখানেই জলহস্তীদের আস্তানা। তাদের ভেজা চামড়ায় নীলচে রং। বিশ্রী স্থূলকায় জন্তুগুলো জলের উপর অদ্ভুত ভোঁতা মাথাগুলো বের করে নৌকোগুলো দেখতে লাগল। দেখে মনে হল ওদের নাকগুলো যেন কেউ কেটে নিয়েছে। প্রায়ই তারা চৌকো মুখগুলো জলে ডুবিয়ে রাখাতে হলদে ঘোলা জলে কেবল তাদের কানতোলা বিরাট কপাল দেখা যাচ্ছিল। মাথার ফুলোর উপরে বসান চোখগুলো তাদের চেহারায় হিংস্রতা এনেছে, চোখগুলো বোকার মতো একদৃষ্টে নৌকোগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

গ্রানিট পাহাড়গুলো যেখানে চড়াই আর খরস্রোত সৃষ্টি করে সোজা নদীর বুক থেকে উঠেছে সেখানে পাথরের মাঝে মাঝে শান্তস্বচ্ছ জলে ভরা গভীর গর্তেও তাদের দেখা গেল। একবার একটা গ্রানিট পাথরের ধার দিয়ে নৌকো বয়ে নিয়ে যাবার সময় ক্রীতদাসরা হঠাৎ দেখে একটা গর্তের তলে বেঁটে বেঁটে পায়ে ভর দিয়ে একটা বিরাট জলহস্তী হেঁটে আসছে। জলের ভিতর জলহস্তীর নীলচে চামড়া গভীর নীল হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞ নিগ্রোরা বলল 'খ্‌তেরা' জলের গাছগাছড়ার শিকড়ের সন্ধানে প্রায়ই নদীগর্ভে হেঁটে বেড়ায়।

নদীর উপত্যকা শেষবারের মতো দিকপরিবর্তন করল — একটা বড় জনাকীর্ণ উর্বর দ্বীপে এসে প্রায় সরাসরি দক্ষিণের দিকে বাঁক নিল। লক্ষ্যে পৌঁছতে আর অল্প একটু বাকি।

নদীর খাড়া পাড় নিচু হয়ে এল। শুকনো চওড়া খাত তাদের বুকের উপর দিয়ে চলে গেছে। সেখানে কাঁটা গাছের কুঞ্জ। পঞ্চম চড়াই পার হতেই দুটো নৌকো গেল উল্টে। এগার জন লোক ডুবে গেল। তারা কেউই ভাল সাঁতার জানত না।

পঞ্চম চড়াই পার হবার পর নীলের প্রথম উপনদী দেখা দিল। সুগন্ধী নদীর* বিরাট মোহানা নলখাগড়া আর প্যাপিরাসের বিরাট ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে পড়েছে নীলের বুকে। নদীর প্রবেশ পথ বার হাত লম্বা নলখাগড়ার সবুজ দেয়ালে বন্ধ, তার মাঝখানে একাধিক আঁকাবাঁকা জলধারা আর আবদ্ধজল। নদীর তীর এখন পৃথক পৃথক ছোট পর্বতমালায় পরিণত হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে কুঞ্জও ক্রমশ বেশি হয়ে উঠছে। তাদের কাঁটাওয়ালা কান্ড লম্বায় আরো বেড়েছে, ঘন ফিতের আকারের ঝোপঝাড় এক অজানা, জনহীন দেশে গিয়ে পেঁাছেছে। পাহাড়ের ঢালু শুকনো খোঁচা খোঁচা ঘাসে ভর্তি, বাতাসে তাদের মর্মর শোনা যাচ্ছে। মুক্তিযাত্রার মূল্য দেবার সময় এসে যাচ্ছে। শিকল আর কয়েদখানা থেকে মুক্তিযাত্রা। ক্রীতদাসদের মনের চাপা ভয় বাড়ছে। শীগ্‌গীরি সেই সাংঘাতিক পরীক্ষা সুরু হবে: সঙ্গীদের রক্ত আর যন্ত্রণার মূল্যে কেউ কেউ রক্ষা পাবে। অন্যেরা মুক্তির বলি হয়ে চিরকালের মতো এই অজানা দেশেই থেকে যাবে। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের গর্ভে কী জমা আছে তাই কল্পনা করতে করতে কাভি এই কথাই ভাবতে লাগল।

আরো উজানে যেতে ক্রমশ বেশি সমতল দেখা দিল। কালো ঘাসের সুস্পষ্ট রেখায় জলাতীর শান্ত জলের উজ্জ্বল চারপাশে পাড় বুনেছে। যতদূর চোখ যায় সে পাড় চলে গেছে। নিচু সমান তীরের একঘেয়েমি ভেঙে দিয়ে তারার আকারের প্যাপিরাস নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছে। ঘাসে ঢাকা ছোট ছোট দ্বীপ সংকীর্ণ পথের গোলকধাঁধায় নদীর বুক চিরে দিয়েছে। সবুজগুল্মের দেয়ালের ফাঁকে সেখানে কালো গভীর

---

* সুগন্ধী নদী — আতবারা নদী, পূব থেকে এসে নীলের সঙ্গে মিলেছে।

রহস্যময় জল। তীরে যেখানে শক্ত জমি সেখানে অনেক জন্তুর পায়ের ছাপওয়ালা শুকনো শক্ত ফাঁক ধরা মাটি। একধরনের পাখি দেখে ক্রীতদাসরা অবাক হয়ে গেল। পাখিগুলো সারসের মতো দেখতে, কিন্তু এক মানুষ লম্বা, আর অসাধারণ লম্বা ঠোঁট। পাখিগুলোকে দেখে মনে হল যেন উপর দিকে বাঁকা ঢাকনাওয়ালা সিন্দুকের উপর তাদের মাথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাখিগুলো হিংস্র হলদে চোখ নিয়ে বড় বড় কোটরের ভিতর থেকে ক্রীতদাসদের দিকে চেয়ে রইল।

সুগন্ধী নদী আর নীলের সঙ্গম পার হয়ে নদী বর্শার ফলার মতো সোজা বয়ে গেছে। সেই পথে দুদিন যাত্রার পর নদী পুবে দিকে বাঁক নিল, তীরে নির্দেশী দুটো আগুনের ক্ষীণ ধোঁয়া দেখা গেল। একদল শিকারী আর নুবীয় পথপ্রদর্শক আগেই চলে এসে ওখানে অপেক্ষা করে রয়েছে। আগুনের ইশারায় বোঝা গেল গণ্ডারের খোঁজ পাওয়া গেছে। সেদিন রাত্রেই একশ চল্লিশ জন ক্রীতদাসকে নিয়ে নব্বই জন সৈন্য নদীর পশ্চিমে গেল। উত্তপ্ত মাটির বুকে তখন প্রবল ধারে উষ্ণ বৃষ্টি পড়ে চলেছে। আর্দ্রতায় সবার ঘোর লেগেছে। কারণ তা-কেমের মেঘমুক্ত আকাশে সব সময় থেকে বৃষ্টি জিনিসটা তারা ভুলে গেছে।

কোমর পর্যন্ত উঁচু খসখসে ঘাস ভেদ করে শিকারীরা চলেছে। মাঝে মাঝে পার হয়ে যায় গাছেদের কালো রেখা। সারাক্ষণ চারদিক থেকে হায়েনার হাসি আর শেয়ালের হুক্কাহুয়া কানে আসছে। সেই সঙ্গে বনবেড়ালের জোর চীৎকারে বাতাস ভরা। বিশেষ ভয়াবহ মনে হল রাতের পাখির একের অন্যের প্রতি তীব্র কর্কশ চীৎকার। এশিয়া আর উত্তর তীরের লোকেদের কাছে অন্ধকারে এক রহস্যে ভরা অনির্দিষ্ট নতুন দেশ খুলে গেল। সে দেশে অসংখ্য প্রাণীর বাস, মানুষের কোন কর্তৃত্ব তাদের উপর নেই।

শিকারীদের ঠিক সামনেই একটা বিরাট গাছ। ডালপালায় ঢাকা প্রকাণ্ড মাথা আকাশের আধখানা দিয়েছে ঢেকে। কাণ্ডটা কালো রাজ্যের যে কোন স্তম্ভের চেয়ে বেশি মোটা। শিকারীরা সেই গাছের তলেই

ছাউনি ফেলে রাত কাটাল। অনেকের পক্ষে এইটেই শেষরাত্রি। পান্দিওন অনেকক্ষণ ঘুমতে পারল না — আসন্ন লড়াইয়ের চিন্তায় উত্তেজিত হয়ে সে শুয়ে শুয়ে আফ্রিকার প্রান্তরের নানা রকম শব্দ শুনতে লাগল।

কাভি আগুনের ধারে বসে শিকারীদের সঙ্গে পরের দিনের কাজ ঠিক করছিল। তারপর সেও শুয়ে পড়ল। সঙ্গীদের অশান্ত ঢুলুনি বা ঘুমহীন ভাব দেখে তার গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। কিদগোকে দেখে সে বোঝে না। পান্দিওন আর রেম্‌দের মাঝখানে শুয়ে কিদগো দিব্যি ঘুমচ্ছে — সারা পথ এরা চার বন্ধু একসঙ্গে থেকেছে। কিদগোর এই নির্বিকার ভাব তার কাছে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা বলে মনে হল। কাভি নিজেও যোদ্ধা হিসাবে বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে, কিন্তু এরকম বীরত্ব কখনো দেখাতে পারেনি।

সকাল হল। ক্রীতদাসদের তিনটে দলে ভাগ করে দেওয়া হল। প্রতি দলে পাঁচ জন করে শিকারী আর দুজন করে স্থানীয় পথপ্রদর্শক। প্রত্যেক ক্রীতদাসকে ফাঁস লাগান লম্বা দড়ি বা দড়ির মতো পাকান চামড়া দেওয়া হল। প্রত্যেক দলে চার জন করে লোক বিশেষ জাতের শক্ত দড়ি দিয়ে তৈরী বড় জাল বয়ে নিয়ে চলল। জালের ফাঁকগুলো এক হাত চওড়া। ক্রীতদাসদের কাজ হল দড়ি দিয়ে গণ্ডারটাকে ধরে জালে পুরে মাটিতে পেড়ে বেঁধে ফেলা।

প্রতিটি দল কিছুটা ফাঁক রেখে নীরবে সমতলের বুকের উপর দিয়ে এগোতে লাগল। সৈন্যরা ধনুকে তীর লাগিয়ে রেখে পিছনে লম্বা সারে ছড়িয়ে পড়ল — ক্রীতদাসদের বিশ্বাস নেই। পান্দিওন আর তার সঙ্গীদের সামনে কোমর পর্যন্ত উঁচু ঘাসে ভরা একটা সমতল, তার এখানে ওখানে ছাতার মতো ডালপালা ছড়ান গাছ*। তাদের ধূসর কাণ্ডের প্রায় গোড়া থেকেই মোটা ডালপালা বেরিয়েছে। তার ফলে গাছগুলোর চেহারা হয়েছে বিরাট ফানেলের মতো, হালকা অনুজ্জ্বল পাতাগুলো যেন আকাশে ভাসছে।

---

* আফ্রিকার একেসিয়া আর একজাতীয় মিমোসা।

গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট পাতাওয়ালা লম্বা ঝোপ। একেক সময় ছড়িয়ে গেছে প্রায় অদৃশ্য সাময়িক জলখাত বরাবর। কখনো কখনো আবার দূর থেকে তাদের ঘন ঢিপির মতো দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে পথে এক ধরনের খুব বিরাট মোটা কাণ্ডওয়ালা গাছ পড়ল। গাছগুলোর বিরাট গাঁটওয়ালা ডালগুলো কচি পাতা আর সাদা ফুলের গুচ্ছে* ঢাকা। সমতলের বুকে স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে বিরাট গাছগুলো। ডালপালা ছড়ান মাথাটা লম্বা কালো ছায়া ফেলেছে। তাদের তন্তুময় বাকলের রং দস্তার মতো। ডালগুলো যেন সীসের তৈরী। ফুলের গন্ধটা অনেকটা বাদামের মতো।

প্রায় অনড় রুক্ষ ঘাসগুলো রোদের ছোঁয়ায় উঠল সোনালি হয়ে। তার উপরে যেন ভাসতে থাকল গাছের সবুজ লেসের কাজ।

ঘাস ফুঁড়ে এক সার কালো বর্শা বেরিয়ে এল। এক পাল হরিণ — ওরিক্স্ — একবার শিংগুলো দেখিয়েই এক সার ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। ঘাস তখনো খুব কম। চারদিকেই ফাঁকা ফাটা মাটি চোখে পড়ছে। বর্ষা তো সবেমাত্র সুরু হয়েছে। বাঁয়ে দেখা গেল এক ঝাঁক গাছ। তাদের পালকের আকারের পাতাগুলো তালপাতার মতো দেখতে। কিন্তু কাণ্ডটার মাথাটা দুটো ডালে বিভক্ত আঙুলছড়ান হাতের মতো। উপরে এই দুটো ডাল থেকে আবার অন্য আরো ডাল বেরিয়েছে।

এইখানেই শিকারীরা আগের দিন গণ্ডার দেখেছে। ক্রীতদাসদের যেখানে ছিল সেখানেই ইশারায় দাঁড়াতে বলে শিকারীরা সাবধানে গাছগুলোর দিকে লুকিয়ে এগিয়ে গিয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে কুঞ্জের ভিতরে উঁকি মারতে লাগল। বাইরের আলোর পর কুঞ্জের ভিতরটা অন্ধকার ঠেকছে। কোন জন্তুই সেখানে নেই। শিকারীরা ক্রীতদাসদের নিয়ে গেল ঘন ঝোঁপে ভর্তি একটা শুকনো জলখাতের দিকে। জায়গাটায় একটা ঝর্ণা রয়েছে। গণ্ডাররা দিনের বেলা সবচেয়ে গরমের সময় তাতে শুয়ে কাদাভরা গর্ত বানিয়েছে। তিনটে ছাতার মতো মাথা একেসিয়ায় ঘেরা

---

* বাওবাব — আফ্রিকার সমতলের গাছ।

একটা ফাঁকা জায়গায় শিকারীরা এসে দাঁড়াল। শুকনো জলখাতের থেকে তারা তখনো দু হাজার হাত দূরে, এমন সময় সামনের নুবীয় পথপ্রদর্শকটি দাঁড়িয়ে পড়ে দুদিকে হাত ছড়িয়ে ইশারায় অন্যদেরও থামতে বলল। চারদিক এমন চুপচাপ হয়ে গেল যে, পোকাদের গুঞ্জনও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। পান্দিওনের কাঁধ ছুঁয়ে কিদগো হাত দিয়ে কাঁটাওয়ালা বেঁটে গাছগুলো দেখিয়ে দিল। পান্দিওন দেখল দুটো মসৃণ বড় পাথরের মতো কী যেন। দক্ষিণের সমতলের ভয়াবহ সেই জন্তু। গণ্ডারদুটো প্রথমে শিকারীদের দেখতে পায়নি। শিকারীদের দিকে পিছন ফিরে তারা মাটিতে শান্তভাবে শুয়েই ছিল। জন্তুদুটোকে পান্দিওনের তেমন বড় বলে মনে হল না। মাদীটা আবার অন্যটার চেয়ে ছোট। ওদিকে শিকারীরা যে মোটা পুরস্কারের লোভে ফিকে রঙের* অসাধারণ রকম বড় মদ্দা গণ্ডার খুঁজে বের করেছে ক্রীতদাসরা কেউ তা জানে না। গণ্ডারটা তার দক্ষিণের কালো জাতভাইদের চেয়ে অনেক বড়, অনেক উঁচু। চওড়া চোয়াল। গায়ের রং ফিকে ধূসর। মাদীটা মাঝখানে পড়ে যাতে গণ্ডগোল না বাধায় তাই শিকারীরা আক্রমণের পরিকল্পনা পাল্‌টে ফেলল।

শিকারের অধিপতি আর যোদ্ধাদের অধিনায়ক লম্বা কাঁটাগুলোর মুণ্ডপাত করতে করতে একটা গাছে উঠল। সৈন্যরা লুকল ঝোপের আড়ালে। ক্রীতদাসরা দল বেঁধে নানা সারে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর শিকারীদের সঙ্গে দল বেঁধে দড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে, নিজেদের সাহস জোগাবার জন্য কান ফাটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে গেল খোলা প্রান্তর পার হয়ে। গণ্ডারদুটো বিস্ময়কর বেগে লাফিয়ে উঠল। বিরাট মদ্দাটা ছুটে আসা লোকগুলোর দিকে স্থিরদৃষ্টে চেয়ে এক সেকেণ্ডের জন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, মাদীটা কিন্তু ভয় পেয়ে একপাশে পালিয়ে গেল। শিকারীরা সেটাই ভেবেছিল। তারা ডান দিকে ছুটে গিয়ে মাদীটাকে তার সঙ্গীর কাছ থেকে আলাদা করে ফেলল।

---

* উত্তর সুদানে প্রাচীন কালে সাদা গণ্ডারই বেশি পাওয়া যেত।

গাছের ডগা থেকে শিকারের অধিপতি দেখল, বিরাট শরীর গণ্ডারটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, পাহাড়ের মতো মাথার দু পাশে কালো কানদুটো খাড়া হয়ে রয়েছে। কানের পিছনে তার মস্ত কাঁধের কুঁজ। সামনে ধারাল শিংয়ের প্রান্তটা। মিশরীর মনে হল, গণ্ডারটার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটো বোকা বোকা ভাব করে কিছুটা ক্ষুব্ধভাবে মাটির দিকে চেয়ে আছে।

এক মিনিট পরেই গণ্ডারটা ঘুরল। মাঝখানে অদ্ভুতভাবে বাঁকা লম্বা মাথাটা শিকারের অধিপতির চোখে পড়ল। সেই সঙ্গে কাঁধের খাড়া ঢালু, হাড়ের ধারগুলো, গাছের গুঁড়ির মতো মোটা মোটা পা আর যুদ্ধং দেহি ভাব করে খাড়া হয়ে থাকা ছোট্ট ল্যাজটাও।

বিরাট চকচকে শিংটা তিন হাতের কম লম্বা নয়। ঠিক নাকের উপর দাঁড়িয়ে আছে। গোড়ার কাছটা খুব মোটা, ডগাটা ছুঁচলো। সেটার পিছনে আরেকটা ছোট গোল-চওড়া-গোড়াওয়ালা শিং। সেটাও ছুঁচলো।

গণ্ডারের দিকে ছুটে আসা লোকগুলোর হৃৎস্পন্দন ভীষণ দ্রুত হয়ে উঠল। সামনাসামনি থেকে জন্তুটা ভয়াবহ দৈত্যের মতো মনে হতে লাগল। প্রকাণ্ড দেহটা আট হাতের কম লম্বা নয়। জোরাল কাঁধটা মাটি থেকে চার হাত উঁচুতে উঠে রয়েছে। গণ্ডারটা নাক দিয়ে জোর ঘোঁৎঘোঁৎ সুরু করল, সে আওয়াজ সবার কানে পৌঁছল, তারপর ছুটে আসা লোকগুলোর দিকে সবেগে তেড়ে গেল। গণ্ডারটা অমন বিরাট শরীর নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে যে কী করে দলের একেবারে মাঝখানে এসে পড়ল, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কেউ দড়ি তোলার সময়ই পেল না। পান্দিওনের কাছ দিয়েই গণ্ডারটা ঝড়ের বেগে ছুটে গেল। সে কেবল গণ্ডারটার চামড়ার ভাঁজে ঢাকা ফোলান নাকের ফুটো, ছেঁড়া ডান কানটা আর যেন পরগাছায় ঢাকা ঢিবির মতো বন্ধুর গাটা দেখতে পেল। তারপর পান্দিওনের মাথার ভিতরে সবকিছু গুলিয়ে গেল। একটা তীব্র আর্তনাদে সারা সমতল ভরে উঠল, একটা মানুষের শরীর অদ্ভুতভাবে পাক খেয়ে আকাশে উঠে গেল। কয়েকটি ক্রীতদাসকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে দল ভেদ করে গণ্ডারটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। তারপর আবার ঘুরে ফিরে হতভাগ্য লোকগুলোর দিকে তেড়ে এল। এবার লোকগুলো দ্রুত

ছুটে আসা মাংসপিণ্ডের উপর ঝুলে পড়ল। কিন্তু গণ্ডারের মাংসপেশীগুলো লোহার মতো শক্ত, হাড়গুলো মোটা মোটা, গায়ের চামড়াটাও বর্মের মতো দুর্ভেদ্য। লোকগুলো তাই চারিদিকে পড়ল ছিটকে। আবার দৈত্যটা ভাগ্যহীন ক্রীতদাসদের মাড়িয়ে পিষে তছনছ করে ফেলতে লাগল। পান্দিওন আর আরো কয়েকজন লোক ছুটে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রচণ্ড একটা ঘা খেয়ে পান্দিওন মাটিতে পড়ে গেল। মাঠের চারিদিকে আর্তনাদ আর তীব্র চীৎকার। ধুলোর মেঘে ভরে গেল বাতাস। শিকারের অধিপতি এতক্ষণ গাছের মাথা থেকে ক্রীতদাসদের চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছিল। কিন্তু লড়াইয়ের অবস্থা দেখে সেও অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেল। দৈত্যের গায়ে একটা দড়িও বাঁধা যায়নি অথচ এর মধ্যেই জনা ত্রিশেক লোক হয় মারা গেছে নয় ঘায়েল হয়েছে। ভয়ে বিবর্ণ যোদ্ধারা কাঁপতে কাঁপতে গাছের আড়াল নিয়ে তা-কেমের ঠাকুর দেবতাদের শরণ করে মুক্তি চাইছে। গণ্ডার তৃতীয় দফা ক্রীতদাসদের আক্রমণ করল। সবাই পালালেও গণ্ডার নবীন এত্রাস্‌কান রেম্‌দ্‌কে শিং দিয়ে ফুঁড়ে দিল। ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে ক্ষ্যাপার মতো তেড়ে উঠে ক্রীতদাসদের মাড়িয়ে পিষে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে লাগল। নাক দিয়ে তার ফেনা বেরচ্ছে। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখগুলো রাগে জ্বলছে।

কাভি ভীষণ জোর গর্জে উঠে গণ্ডারটার দিকে ছুটে এল। কিন্তু দড়িটা শিংয়ে আটকাল না। ফস্‌কে গেল। এত্রাস্‌কান নিজে রক্তাক্ত দেহে একদিকে ছিটকে পড়ল। গণ্ডারের খসখসে চামড়ায় তার কাঁধের কাছ থেকে বুক পর্যন্ত ছাল উঠে গেছে।

কাভি অসহায় রাগে গোঙাতে গোঙাতে বহু কষ্টে উঠে দাঁড়াল। জন্তুর জোরের ভয়ে সবাই তখন গণ্ডারটার কাছ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে। ভীতুরা আবার অন্যদের পিছনে লুকিয়েছে।

মনে হল, আর বেশি বাকি নেই, এবার সবাই মুক্তির আশা জলাঞ্জলি দিয়ে চারদিকে পালাবে।

গণ্ডারটা আবার ক্রীতদাসদের দিকে ফিরল, আবার আর্তনাদে চারিদিক ভরে গেল। কিদগো এবার এগিয়ে এল। নাকের ফুটোদুটো তার

ফুলে গেছে। মৃত্যুর মুখে মানুষ যখন সবকিছু ভুলে যায়, মাথায় ঘোরে শুধু বাঁচার জন্য লড়াই'এর কথা, সেই সংগ্রামের আগুন জ্বলে উঠেছে কিদগোর মনে। নিশ্চিত মৃত্যুর নিশানা সেই ভীষণ শিংয়ের সামনে থেকে লাফ মেরে সরে গিয়ে কিদগো গণ্ডারের পিছনে ছুটে নিজের কথা ভুলে গিয়ে তার ল্যাজটা ধরে ফেলল। পান্দিওনও মারাত্মক ধাক্কার জের কাটিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে থাকা একটা জাল তুলে নিল। পান্দিওন বুঝল, এবার তার সামনে এগিয়ে যাওয়া চাই — মাটির উপর ধাঁধাগ্রস্ত অবস্থায় সে যখন পড়েছিল তখন সঙ্গীদের শরীর তাকে আড়াল করে রেখেছিল। তার স্মৃতিপটে আবছা ছবি ফুটে উঠল — ক্রীটের প্রান্তর, ষাঁড়ের সঙ্গে বিপজ্জনক খেলা। গণ্ডার অবশ্য ষাঁড়ের মতো নয়, কিন্তু তবু পান্দিওন ঠিক করল সেই একই কৌশল প্রয়োগ করবে। গুটনো জালটা কাঁধে ফেলে সে গণ্ডারটার দিকে ছুটে গেল। গণ্ডারটা তখন থেমে গিয়ে পিছনের পাদুটো দিয়ে মাটি খুঁড়ছে আর ধুলো ওড়াচ্ছে। কিদগো কোথায় ছিটকে পড়েছে। লিবীয়ার দুজন পান্দিওনের মৎলব বুঝতে পেরে গণ্ডারটার মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল। পান্দিওন এক লাফে এসে গণ্ডারটার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। গণ্ডারটা বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে গেল। তার কর্কশ চামড়ায় পান্দিওনের গা কেটে গেল। দারুণ যন্ত্রণায় সবকিছু ভুলে গিয়ে পান্দিওন গণ্ডারটার কান ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর ক্রীটে যেরকম দেখেছে সেইভাবে একটা হ্যাঁচকা ঝাঁকানি দিয়ে গণ্ডারের চওড়া পিঠে চড়ে বসল। গণ্ডারটা মোচড় দিয়ে ঘুরতে লাগল। পান্দিওন প্রাণপণ জোরে আঁকড়েই রইল। তার মাথায় তখন কেবল একটিই চিন্তা — যদি ধরে থাকতে পারি।

গণ্ডারটার মাথায় জাল পরাতে যে কয় সেকেণ্ড প্রয়োজন পান্দিওন ততক্ষণ ঠিক আঁকড়ে রইল। জালের ফাঁকে শিংটা ফুঁড়ে গেল। পান্দিওন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের সবকিছু ভুলে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। কী যেন ভাঙল, একটা বিরাট ভারী কিছু তার উপর এসে পড়ল। চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল।

লড়াইয়ের গণ্ডগোলে পান্দিওন দেখতে পায়নি যে কিদগো সিংহের মতো গরজাতে গরজাতে আবার গণ্ডারটার ল্যাজ চেপে ধরেছে আর দশ জন লিবীয়ার আর ছ' জন আমু তার পরান জালটা ধরেছে চেপে। লোকদের হাত ছাড়ানর চেষ্টায় গণ্ডারটা এক পাশে গড়িয়ে পড়ে গেল। মাটির উপর আছড়ে পড়ায় পান্দিওনের কণ্ঠাস্থি আর একটা হাত ভেঙে গেল। গণ্ডারটা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসরা চীৎকার করতে করতে তার উপর লাফিয়ে পড়ল। গণ্ডারের মাথায় আরেকটা জাল জড়ান হল, পিছনের একটা পায়ে দুটো আর সামনের একটা পায়ে একটা ফাঁস পরান হল। গণ্ডারের ঘোঁৎঘোঁৎ গম্ভীর গর্জনে পরিণত হল। প্রথমে বাঁয়ে গড়িয়ে গিয়ে পরে গণ্ডারটা পিঠের উপর ভর দিয়ে শুল। তাতে অনেকেরই হাড়গোড় গেল ভেঙে। গণ্ডারটার জোর যেন কিছুতেই শেষ হবার নয়। ছবার উঠে দাঁড়িয়ে দড়িদড়ায় জড়াজড়ি করে আবার পড়ে গেল। ফলে পঞ্চাশ জন লোক মারা পড়ল। গণ্ডারের পায়ের দড়িদড়ার বাঁধন ক্রমেই বেড়ে উঠল। জোরাল ফাঁসগুলোকে শিকারীরা আঁট করে বেঁধে দিল। তিনটে জাল গণ্ডারটার মাথা পা সব মুড়ে ফেলল। শীগ্‌গীরি ঘাম-কাদা-রক্ত-মাখা এক দঙ্গল লোক গণ্ডারটাকে চেপে ধরল। গণ্ডারটা পাগলের মতো ছটফট করছে। মানুষের রক্তে গণ্ডারটার চামড়া পিছল হয়ে উঠেছে, ক্রীতদাসদের বাঁকা আঙুল আর ধরে রাখতে পারছে না। কিন্তু তবু দড়িগুলো ক্রমশই বেশি আঁট হয়ে উঠছে। গণ্ডারটার গায়ের ভারে যারা বিধ্বস্ত তারাও মৃত্যু-কঠিন-মুঠোয় দড়ি চেপে পড়ে রইল।

কাৎ হয়ে পড়া গণ্ডারটার কাছে এগিয়ে এসে শিকারীরা নতুন দড়ি দিয়ে তার থামের মতো পাগুলোকে বেঁধে ফেলল। শিঙের উপর দড়ি বেঁধে গণ্ডারের মাথাটাকে সামনের দুপায়ের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হল।

শেষ হল সেই ভয়ানক সংগ্রাম।

উন্মত্ত লড়াইয়ে আত্মহারা লোকগুলো ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে এল। তাদের ক্ষতবিক্ষত শরীরের পেশী যেন জ্বরের ঘোরে কাঁপছে, দৃষ্টিহীন চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে কালো পর্দা।

অবশেষে পাগলের মতো হৃৎস্পন্দন শান্ত হয়ে এল। এখানে ওখানে শোনা গেল স্বস্তির নিঃশ্বাস। সবাই বুঝল, মৃত্যু তাদের পার হয়ে চলে গেছে। রক্ত আর কাদা মাখা কাভি টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল; কিদগো এগিয়ে এল তার কাছে। তার নিজের সারা শরীর তখন কাঁপছে, কিন্তু হাসিটি মুখে ঠিক লেগে রয়েছে। কিন্তু তার হাসি মিলিয়ে গেল, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে এল — সে দেখল, যারা বেঁচে আছে তাদের মধ্যে পান্দিওন নেই।

তিয়াত্তর জন লোক বেঁচে গেছে। অন্যেরা হয় মারা পড়েছে নয়ত মারাত্মক জখম হয়েছে। দলিত ঘাসে মৃতদেহের মধ্যে কাভি আর কিদগো পান্দিওনকে খুঁজে পেয়ে তাকে ছায়ায় নিয়ে গেল। কাভি তাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল, এমন কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেল না যার ফলে মারা যেতে পারে। রেম্‌দ্‌ মারা গেছে। আমুদের সেই দুর্ধর্ষ সর্দারও শেষ হয়ে গেছে। সাহসী লিবীয়ার আখমিও মৃতপ্রায়, তার পাঁজরাগুলো গেছে গুঁড়িয়ে।

ক্রীতদাসরা যখন কে কে মারা গেল তার খোঁজ নিচ্ছে, মৃতদের ছায়ায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সৈন্যরা ততক্ষণে নদী থেকে একটা মস্ত কাঠের পাটা নিয়ে এসেছে — গণ্ডারের খাঁচার মেঝেটা। বাঁধা গণ্ডারটাকে তার উপর গড়িয়ে দিল। তারপর পাটাটাকে গুঁড়ির উপর বসিয়ে নদীর দিকে টেনে নিয়ে চলল।

কাভি শিকারের অধিপতিকে গিয়ে বলল:

‘ওদের বলো, আহতদের নিয়ে যাওয়ায় আমাদের সাহায্য করুক।’ কাভি সৈন্যদের দেখিয়ে দিল।

‘ওদের নিয়ে গিয়ে কী হবে?’ শিকারের অধিপতি জিজ্ঞেস করল। ধুলো-কাদা-মাখা, মুখে কঠোর দুঃখের ছাপ বলিষ্ঠ কাভিকে দেখে নিজের অজান্তেই শিকারের অধিপতির চোখে একটা সম্ভ্রমের ভাব ফুটে উঠল।

‘নদী হয়ে ওদের নিয়ে যাব: কয়েকজন হয়ত তা-কেম পর্যন্তও বেঁচে থাকতে পারে। সেখানে ভাল ডাক্তার...’ কাভি গম্ভীর বিষণ্ণভাবে বলল।

'তোমরা তা-কেমে ফিরে যাবে, একথা কে তোমায় বলল?' শিকারের অধিপতি কাভিকে বাধা দিয়ে বলে উঠল।

কাভি শিউরে উঠে একপা পিছিয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল:

'দাক্ষিণাত্যের শাসক কি আমাদের মিথ্যে কথা বললেন? আমরা কি মুক্তি পাইনি?'

'না, শাসক মিথ্যে কথা বলেননি হতভাগা ছোটলোক! ছাড়া তোমরা পেয়েছ!' শিকারের অধিপতি একটা পাকান ছোট্ট প্যাপিরাস বাড়িয়ে দিল। 'এই তাঁর আদেশপত্র।'

ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়ার সেই মহামূল্য আদেশপত্র কাভি সাবধানে হাতে তুলে নিল।

'তাই যদি হয়, তবে কেন ...' সে বলতে সুরু করল।

'চুপ কর,' শিকারের অধিপতি দর্পভরে বলল, 'আমার কথা শোন। তোমরা মুক্ত এখানে,' শেষ কথাটার উপর জোর দিল শিকারের অধিপতি, 'যেখানে ইচ্ছে যেতে পার, এদিকে বা ওদিকে,' সে হাত বাড়াল পশ্চিমে, দক্ষিণে, পূবে, 'কিন্তু তা-কেমে বা আমাদের অধীনস্থ নুব দেশে নয়। এর যদি অন্যথা হয় তবে আবার দাস হয়ে থাকতে হবে। আমার মনে হয়,' কঠোরভাবে সে বলে চলল, 'স্বাধীন হয়ে সবকিছু ভেবে চিন্তে তোমরা আবার ফিরে গিয়ে আমাদের শাসকের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে, তোমাদের কপালে যা লেখা আছে তাই মেনে নেবে — কালো রাজ্যের ঈশ্বরের নির্বাচিত লোকেদের দাসত্ব।'

কাভি দুপা এগিয়ে গেল। চোখ তার জ্বলছে। একঝটকায় এক যোদ্ধার কোমর থেকে তলোয়ার টেনে নিল — সৈন্যটি অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে শিকারের অধিপতির দিকে তাকাল — তারপর তলোয়ারটা উঁচুতে তুলে চুমু খেয়ে নিজের ভাষায় কী যেন বলল, অন্যেরা তার কিছুই বুঝল না।

'বিদ্যুতের মহা দেবতার নামে শপথ করছি, শপথ করছি মৃত্যুর দেবতার নাম নিয়ে, যাঁর নামে আমার নাম, এই ঘৃণ্য লোকদের শত কুকর্ম সত্ত্বেও আমি আমার জন্মভূমিতে প্রাণ নিয়ে ফিরব। তারপর শক্তিশালী

সৈন্যদল নিয়ে তা-কেমে আসব সব কুকাজের প্রতিশোধ নেবার জন্য। আজ থেকে এ চেষ্টায় আমি এক ঘণ্টার জন্যও বিরত থাকব না — এই আমার পণ।'

খোলা জায়গায় আহত আর মৃত ক্রীতদাসরা যত্রতত্র পড়ে ছিল, সেদিকে হাতটা ঘুরিয়ে ভীষণ জোরে কাভি তলোয়ারটা পায়ের কাছে ফেলে দিল। অস্ত্রটা মাটির অনেক নিচে ঢুকে গেল। তারপর তার সঙ্গীদের কাছে যেতে যেতে হঠাৎ আবার সবেগে ঘুরে দাঁড়াল।

'তোমাকে কেবল একটা অনুরোধ করব,' শিকারের অধিপতিকে সে বলল, শিকারের অধিপতি তখন শেষ সৈন্যদল নিয়ে চলে যাচ্ছিল, 'ওদের বলো, আমাদের কয়েকটা তীরধনুক বর্শা আর ছোরা দিয়ে যাক। আহতদের রক্ষা করতে হবে।'

শিকারের অধিপতি নীরবে মাথা নেড়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। গণ্ডার টেনে নিয়ে যাওয়া পাটাটায় দলিত ঘাসের উপর চওড়া পথ ধরে নদীর দিকে এগিয়ে গেল।

কাভি তার সঙ্গীদের সব কথা জানাল। রাগের চীৎকার, চাপা গালাগাল আর অসহায় আস্ফালন মিশে গেল মুমূর্ষুদের নীচু স্বরের কাতর গোঙানিতে।

'কী করা যায় সে কথাই পরে ভেবে দেখব,' কাভি চেঁচিয়ে বলল। 'প্রথমেই ঠিক করতে হবে আহতদের নিয়ে কী করা যায়। নদী অনেক দূরে। আমরাও অত্যন্ত ক্লান্ত — আহতদের অত দূরে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একটু বিশ্রাম করে নিই। তারপর পঞ্চাশ জন নদীতে যাবে, কুড়ি জন এখানে পাহারায় থাকবে — চারদিকে নানারকম হিংস্র জন্তু রয়েছে।'

লম্বা ঘাসে হায়েনাদের ছিটকাটা পিঠগুলো কাভি দেখিয়ে দিল। রক্তের গন্ধে তারা ছুটে এসেছে। লম্বা, পালকহীন গলা বিরাট বিরাট পাখিরা আকাশে চক্কর মেরে নেমে আবার উড়ে যায়।

রোদে পোড়া শুকনো মাটি থেকে তাপ উঠছে। গাছের নিচে আলোর ফোঁটার জাল অল্প অল্প কাঁপছে। উত্তপ্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে বেজে উঠছে

বুনো ঘুঘুর বিষণ্ণ ডাক। লড়াইয়ের উন্মাদনা কেটে গেছে, গায়ের অজস্র চোটগুলো ভালভাবে জানান দিতে সুরু করেছে, ছড়ে যাওয়া চামড়ায় সুরু হয়েছে জ্বলুনি আর ব্যথা।

রেম্‌দের মৃত্যুতে কাভি ভীষণ আঘাত পেয়েছে — ঐ তরুণটিই ছিল দূর জন্মভূমির সঙ্গে তার একমাত্র সংযোগ। সে পাৎলা যোগসূত্র আজ ছিন্ন হয়ে গেল।

নিজের ব্যথা যন্ত্রণা ভুলে কিদগো পান্দিওনের পাশে বসে আছে। পান্দিওনের নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু জখম হয়েছে, এখনো সে অজ্ঞান। তবে নিঃশ্বাস পড়ছে যদিও শুকনো ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে তার শিস প্রায় শোনা যায় না। ছায়ায় শুয়ে থাকা সঙ্গীদের দিকে কয়েক বার তাকিয়ে কিদগো হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আহতদের জন্য জল আনতে নদীতে যাবার জন্য ডাক দিল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোঙাতে গোঙাতে সবাই উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গেই অসহ্য তৃষ্ণায় তাদের গলা জ্বলে উঠল। যারা রক্ষা পেয়েছে তাদেরই যখন এরকম সাংঘাতিক তৃষ্ণা, তখন আহতদের না জানি কী অবস্থা! বেচারীরা চুপ করে পড়ে আছে, গোঙাবার মতো শক্তিও তাদের নেই। সোজা নাকবরাবর তাড়াতাড়ি হেঁটে গেলেও নদীতে পেঁছতে পাকা দুটি ঘণ্টা লাগবে।

হঠাৎ ঝোপের আড়ালে মানুষের গলা শোনা গেল। প্রায় পঞ্চাশ জন সৈন্য জল আর খাবার ভরা পাত্র নিয়ে উপস্থিত। মিশরী কেউ নেই। সবাই নুবীয় আর নিগ্রো। সঙ্গে দুজন পথপ্রদর্শক।

লড়াইক্ষেত্রটা দেখেই সৈন্যরা চুপ হয়ে গেল। একটা গাছের নিচে কাভি দাঁড়িয়ে ছিল। যোদ্ধারা সোজা সেখানে গিয়ে তার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল মাটি আর কাঠের পাত্রগুলো, দশটা বর্শা, ছটা ধনুক আর ভর্তি তূণ, চারটে বড় ছোরা, আর পিতলের পাত বসান জলহস্তীর চামড়ার চারটে ছোট ঢাল। তৃষিত লোকেরা জলের পাত্রগুলোর উপর পাগলের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ল। একটা বড় ছোরা তুলে নিয়ে কিদগো সক্রোধে বলে উঠল, যে জল ছোঁবে তাকে তার হাতে মরতে হবে।

আহতদের শুষ্ক মুখে তাড়াতাড়ি জল ঢেলে দেওয়ার পর অন্যদের জল খেতে দেওয়া হল। সৈন্যরা একটিও কথা না বলে চলে গেল।

ক্রীতদাসদের মধ্যে দুজন ছিল ক্ষতের চিকিৎসায় দক্ষ। কাভি আর তারা দুজন সঙ্গীদের ক্ষত বাঁধাছাঁদা করতে লাগল। পান্দিওনের ভাঙা হাড় ঠিকভাবে জুড়ে দিয়ে উপরে মোটা বাকল লাগিয়ে তার নেংটি ছিঁড়ে বেঁধে দেওয়া হল। পান্দিওনের নেংটিটা খোলার সময় কাপড়ের ভাঁজে লুকিয়ে রাখা উজ্জ্বল পাথরটা কিদগোর হাতে পড়ল। মন্ত্রপূত কিছু ভেবে কিদগো পাথরটা সাবধানে লুকিয়ে ফেলল।

আরো দুজনের গাছের শক্ত বাকল বাঁধা হল। একজন হল হাতভাঙা লিবীয়ার, অন্য জন ছিপছিপে পাৎলা, পেশীবহুল একটি নিগ্রো। ঠিক হাঁটুর তলে পা ভেঙে সে অসহায় অবস্থায় পড়ে ছিল। অন্যদের অবস্থা সাধ্যের বাইরে। গণ্ডারের মারাত্মক শিং তাদের ভিতরটা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। কেউ কেউ গণ্ডারের প্রচণ্ড ভারে থেঁতলে গেছে, কেউ বা গুঁড়িয়ে গেছে গণ্ডারের গাছের মতো মোটা মোটা পায়ের চাপে।

আহতদের সবার চিকিৎসার ব্যবস্থা কাভি করে ওঠার আগেই হলদে ঘাসের গায়ে ফুটে উঠল ছুটে-আসা একটি লোকের ছায়া। যে স্থানীয় লোক খাবার আর জল নিয়ে আসা সৈন্যদের পথ দেখিয়ে এনেছিল এ লোকটি তাদেরই একজন। নিজে থেকেই ফিরে এসেছে।

ছুটে আসার ফলে হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটি কাভির কাছে এসে সামনে হাত উঠিয়ে তেলোদুটো উপরে তুলল। কাভি বুঝল, এ হল বন্ধুত্বের ভঙ্গী। সেও ঐভাবেই সাড়া দিল। লোকটি তখন ছায়ায় লম্বা বর্শায় ভর দিয়ে উবু হয়ে বসে তড়বড় তড়বড় করে কথা বলতে সুরু করল। থেকে থেকেই নদী আর দক্ষিণ দিকটা দেখিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু মহামুশকিল, নুবীয় লোকটি তা-কেমের ভাষার গোটা দশেক শব্দের বেশি জানে না, কাভিও নুবভাষার একটি কথাও বুঝতে পারছে না। ক্রীতদাসদের মধ্যে অবশ্য দোভাষী পাওয়া গেল।

জানা গেল, যোদ্ধাদের ছেড়ে দিয়ে লোকটি ক্রীতদাসদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। লোকটি বলল, মুক্ত ক্রীতদাসদের তা-কেমের

অধীনস্থ অঞ্চল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তাই নদীর দিকে ফিরলে বিপদ, আবার ধরা পড়ার ভয় আছে। পথপ্রদর্শক কাভিকে পশ্চিমে যেতে বলল। সেদিকে গেলে কিছু পরেই একটা শুকনো বড় উপত্যকা পড়বে। সেই উপত্যকার ভিতর দিয়ে চার দিন দক্ষিণমুখে হাঁটলে পর শান্তিপ্রিয় যাযাবর পশুপালকদের সঙ্গে দেখা হবে।

'তাদের এটা দিও,' আড়ভাবে ফেলা কাঁধের কাপড়টার তল থেকে বিশেষ আকারে বাঁকান আর পাকান লাল কচি ডালের তৈরী একটা জিনিস সে বের করল, 'ওরা তাহলে যত্ন-আত্তি করবে, আহতদের নিয়ে যাবার জন্য গাধার ব্যবস্থা করে দেবে। আরো দক্ষিণে একটা সমৃদ্ধ দেশ, সেখানকার লোকেরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। কেম্‌তদের তারা দেখতে পারে না। আহতদের সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারবে। যত দক্ষিণে যাবে ততই জল আর বৃষ্টি পাবে। প্রথমে শুকনো জলের খাত ধরে যাবে, খাতের বালি হাতদুয়েক খুঁড়লেই জল মিলবে...'

তাড়াতাড়ি যাবার জন্য লোকটি উঠে পড়ল। কাভি তাকে ধন্যবাদ জানাতে যাবে এমন সময় হঠাৎ এক লাফে এগিয়ে এল একজন লম্বা জটপাকান নোংরা দাড়িওয়ালা এশীয় ক্রীতদাস, একমাথা জটা।

'পশ্চিম আর দক্ষিণে যেতে বলছ কেন? আমাদের দেশ হল ঐদিকে!' আঙুল দিয়ে সে পুবে নদীর দিকটা দেখিয়ে দিল।

পথপ্রদর্শক কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে প্রতিটি কথা আলাদা করে বলল:

'নদী পার হলেই তোমরা পড়বে পুব দিকের জলশূন্য পাথুরে মরুভূমিতে। মরুভূমি আর উঁচু পাহাড় পার হতে পারলে পড়বে সমুদ্র তীরে, জায়গাটা তা-কেমের অধীনে। সমুদ্র পার হয়ে অন্য তীরে যদিই বা যেতে পার, তবু সেখানে লোকে বলে আরো ভয়ানক মরুভূমি। এদিকে সুগন্ধী নদীর তীরে আর পাহাড়গুলোয় যারা বাস করে তারা অস্ত্রের বদলে তা-কেমে ক্রীতদাস চালান দেয়। এবার নিজেই ভেবে দেখ কী করবে!'

'আচ্ছা, উত্তরে যাবার কোন পথ নেই?' খোশামোদের স্বরে জিজ্ঞেস করল লিবীয়ার লোকদের একজন।

'উত্তরে দুদিন হাঁটলে পর একটা অন্তহীন মরুভূমিতে এসে পড়বে: প্রথমে কেবল শুকনো মাটি আর পাথর, তারপর বালি। ওদিকে যাবেই বা কিসের জন্য? হয়ত পথঘাট সেখানে আছে, কিন্তু ওদিকটা আমার মোটেই জানা নেই। আমি তোমাদের সবচেয়ে সহজ পথ বাতলে দিয়েছি। ও পথ আমার খুব ভাল করেই জানা...' আলাপটা যে এইখানেই শেষ হল তা ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়ে পথপ্রদর্শক গাছের ছায়া ছেড়ে চলে গেল।

কাভি সঙ্গে এসে তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে তাকে মিশরী আর এত্রাস্কান শব্দ মিশিয়ে ধন্যবাদ জানাতে লাগল। তারপর একজন দোভাষীকে ডেকে বলল:

'দেবার মতো তো কিছুই আমার কাছে নেই, কেবল এইটেই আছে...' নোংরা নেংটিতে কাভি হাত দিল, 'কিন্তু তোমায় চিরকাল মনে রাখব।'

'সাহায্যের জন্য কোন মজুরী আমি চাই না, আমার মন যা বলেছে তাই করেছি,' পথপ্রদর্শক হেসে বলল। 'তা-কেমের অত্যাচার হাড়ে হাড়ে আমরা জানি, তোমাদের মতো সাহসী বীরদের সাহায্য না করেই আমাদের কেউ পালাবে কি করে! কী ভীষণ মূল্য দিয়েই না তোমরা মুক্তি পেয়েছ! শোন, আমার কথামত কাজ কর। যে প্রতীকটা দিলাম সেটা সঙ্গে রেখ... আরো একটা কথা: এখান থেকে হাজার দুয়েক হাত দূরে ডান দিকে ঝর্ণা পাবে। কিন্তু আজ রাত্রের আগেই তোমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া ভাল। আচ্ছা তবে বিদায় সাহসী বিদেশী। তোমার বীরসঙ্গীদের আমার শুভেচ্ছা জানিও। আমায় তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

পথপ্রদর্শক অদৃশ্য হয়ে গেল। কাভি তার দিকে চেয়ে একমনে কী যেন ভাবতে লাগল।

না, মুমূর্ষু সঙ্গীদের হায়েনার মুখে ফেলে রেখে তারা কিছুতেই যেতে পারে না। আজ যাওয়া হবে না। কাছাকাছি যদি জল থাকে তবে তো এখানে আরোই থাকা উচিত।

কাভি সঙ্গীদের কাছে ফিরে এল। তারা তখন কী করা উচিত সে কথাই আলোচনা করছিল। পেটে জলটল খাবার দাবার পড়ার ফলে সবাই বেশ ঠাণ্ডা মাথায় ভাবী কর্তব্য বিচার করে দেখতে লাগল।

উত্তরে যাওয়া অসম্ভব, একথা সবাই মেনে নিল — নদীর কাছ থেকে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সরে যেতে হবে, কিন্তু কোনদিকে যাওয়া যায়, পূবে না দক্ষিণে, তাই নিয়েই মতভেদ।

যারা রক্ষা পেয়েছে তাদের প্রায় অর্ধেকই এশিয়ার লোক। তারা কালো লোকদের দেশের আরো ভিতরে যেতে চায় না। পূবদিকে যাওয়ার জন্যই তারা জোর করতে লাগল। নুবীয়রা বলল, তিন সপ্তাহের মধ্যেই তারা এশিয়া আর নুব দেশের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ সমুদ্রের তীরে পেঁছতে পারবে। এশিয়ার লোকেরা তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি পেঁছবার জন্য আবার মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যেতে প্রস্তুত।

কাভি ধরা পড়ে এক সামরিক অভিযানে। দেশে তার বউছেলেমেয়ে আছে। সে একটু ইতস্তত করতে লাগল: তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার সম্ভাবনাটা খুবই লোভনীয়। কেম্‌ত থেকে নির্বাসনে সে বড় দুঃখিত। কেম্‌তের ভিতর দিয়ে নদীর ভাঁটার মুখে নৌকো চালিয়ে সমুদ্রে পড়লেই তার সবচেয়ে সোজা হবে। কিন্তু সে অভিজ্ঞ যোদ্ধা। জীবনের অনেকটাই তার কেটেছে বিদেশে। সে বুঝতে পারল, অজানা দেশে একটা ছোট দলের পক্ষে একমাত্র অলৌকিক উপায়েই রক্ষা পাওয়া সম্ভব। বিশেষ করে মরুভূমির মধ্যে, জলকূপ যেখানে খুব কম আর সবায়ের জানা। এতদিন পর্যন্ত কাভির জীবনে অলৌকিক কিছুই ঘটেনি, তাই অলৌকিকে তার বিশ্বাসও কম।

আলোচনায় যোগ দেবার জন্য কিদগো পান্দিওনকে ছেড়ে উঠে এসেছিল। এবার সে প্রথম নিজের কথা বলতে সুরু করল। কথায় কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ল, কিদগো কুমোরের ঘরের ছেলে। কালো লোকেদের দেশের পশ্চিম সীমান্তে, সমুদ্রতীরের এক সমৃদ্ধ জাতের লোক সে। জনসংখ্যাতেও তার জাতি বেশ বড়। শুকনো মাটিকে

সেখানে বিভক্ত করেছে দক্ষিণের শিং* নামের একটা মস্ত উপসাগর। নুব দেশ থেকে বাড়ি ফেরার পথ তার জানা নেই। সে বাড়ি ছেড়ে রওনা হয় কেম্‌তের অলৌকিক শিল্প সম্ভার দেখার প্রবল বাসনায়। পথে মহা মরুভূমির কাছে বন্দী হয়। তবে তার বিশ্বাস গণ্ডার ধরার জায়গা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে তার বাড়ি খুব বেশি দূরে হবে না। কিদগো বলল, পথপ্রদর্শক যে যাযাবরদের কাছে যাবার পরামর্শ দিয়েছে তারা ঠিক পথ বাতলে দিতে পারবে। দেশে পৌঁছলে তার জাতি সবাইকে খুব আদর আপ্যায়ন করবে। এগ্রাস্‌কানকে বলল, ছোটবেলায় সে শুনেছে, কাভি আর পান্দিওনের মতো লোকেরা উত্তর সাগর থেকে নাকি তার দেশে আসত। কিদগোর কথা শুনে কাভির কালো লোকেদের দেশটাকে তেমন ভয়ানক বলে মনে হল না। সব ভেবে চিন্তে সে সঙ্গীদের নুবীয় পথপ্রদর্শকের পরামর্শই মেনে নিয়ে দক্ষিণে যেত বলল। সমুদ্র সেখানে ঘৃণ্য তা-কেমের শাসনমুক্ত। জলপথে তারা সবাই বাড়ি পৌঁছতে পারবে। মরুভূমির চেয়ে কাভির সমুদ্রকেই বেশি বিশ্বাস। এশিয়ার লোকেরা প্রতিবাদ করতে লাগল। লিবীয়ার লোকেরা কিন্তু কাভির প্রস্তাব সমর্থন করল। নিগ্রোদের কথা তো বলাই বাহুল্য— তারা সবাই দক্ষিণ আর পশ্চিমে যেতে প্রস্তুত। তাদের বাড়ির পথ এ দিকেই।

এশিয়ার লোকেরা বলতে লাগল, পথপ্রদর্শক যে যাযাবর আর বিশেষ করে সমৃদ্ধ জনবহুল জাতির কথা বলে গেল তারা তাদের কী ভাবে নেবে কে জানে। ঐ প্রতীকটাও হয়ত তাদের আবার বন্দী করার কোন ফাঁদ।

ঠিক সেই সময় পা ভেঙে-পড়ে-থাকা নিগ্রোটি চেঁচিয়ে হাত নেড়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল। মুখে হাসি টানতে টানতে, বুক চাপড়ে তাড়াহুড়ো করে থুথু ছিটিয়ে অর্ধেক কথা গিলে ফেলে সে কী যেন সব বলতে লাগল। তার সেই সোৎসাহ কথা আর অজানা শব্দের তোড়

---

* দক্ষিণের শিং — গিনি উপসাগর।

শুনে কাভি এটুকু বুঝল যে, যাযাবরদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে পথপ্রদর্শক তাদের যাদের কাছে যেতে বলেছে নিগ্রোটি সে জাতেরই লোক। সে শপথ করে বলছে, তার জাতের লোকেরা সত্যিই শান্তিপ্রিয়। কাভি তখন মনস্থির করে লিবীয়ার লোকদের আর নিগ্রোদের পক্ষ নিল। এশীয়রা তখনো কিছুতেই রাজী হয় না। সূর্য ওদিকে অস্তে নেমেছে। জল আর রাতের আস্তানার কথা ভাবতে হবে। কাভি তাই সবাইকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলল। সবাই তখন সঙ্গীদের মৃত দেহ ছড়ান সেই ভয়াবহ মাঠটা ছেড়ে চলে যেতে চায়, কিন্তু সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টায় মুমূর্ষুদের শুধু শুধু আরো কষ্ট দিতেও চায় না, তাই সবাইকে থেকে যেতেই হল। দশ জন লোক পথপ্রদর্শকের নির্দিষ্ট ঝর্ণার জায়গায় গিয়ে পাত্রভরে গরম ঘোলাটে, কাদার গন্ধওয়ালা জল নিয়ে এল। নিগ্রোদের পরামর্শ অনুসারে হায়েনাদের আক্রমণ ঠেকাবার জন্য গাছের মাঝখানে কাঁটাডালের বেড়া বাঁধা হল। খোলা জায়গার দিকটায় জ্বালান হল তিনটি অগ্নিকুণ্ড। তিন জন লোক রইল আহতদের তদারকীতে, দশ জন লোক বর্শা নিয়ে বসল আগুনের ধারে। এসব অঞ্চলে রাত্রি আসে তাড়াতাড়ি। উত্তর আর পূব থেকে যখন অন্ধকারের ঢেউ গাছের মাথা ডুবিয়ে দিয়ে আকাশে অজস্র তারার দীপ জ্বালিয়ে ছুটে আসছে, পশ্চিমে তখনো অস্ত সূর্যের আলোয় রঙা মেঘ দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ দেশের সঙ্গে অপরিচিত কাভি একটু পরেই বুঝতে পারল, পথপ্রদর্শক কেন তাদের তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলেছিল। শেয়ালের হুক্কাহুয়ায় আকাশ বাতাস ভরে গেছে। চারদিক থেকে ভেসে আসছে হায়েনার পাগলের মতো হাসি। মনে হল শত শত জন্তু যেন শুধু মৃতদের নয় জীবিতদেরও খাবার জন্য চারিদিক থেকে ছুটে এসেছে। মাঠের বুকে তখন ভয়াবহ ব্যাপার চলেছে। ঘোঁৎঘোঁৎ আওয়াজ, হাড় চেবানর আর দাঁত খিঁচুনির শব্দ। গরমে পচধরা মৃতদেহগুলির অদ্ভুত বিশ্রী গন্ধ দেখতে দেখতে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, মাটির চাঙ্গড় আর পাথর ছুঁড়ল, আগুনধরান কাঠ নিয়ে ছুটে গেল কিন্তু সবই বৃথায় — মাংসলুব্ধদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে উঠল।

হঠাৎ কাঁটাবেড়ার ওপারে শোনা গেল একটা চাপা একটানা গোঁ-গোঁ শব্দ। এক বজ্রগম্ভীর গর্জন মাটির বুকে পাক খেয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে যেন ভেসে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে গেল খোলা জায়গার অন্যান্য লড়ুয়ে জীবজন্তু। ঘুমন্ত ক্রীতদাসরা লাফিয়ে উঠে পড়ল। চারিদিক নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে আহতদের গোঙানি আরো জোর হয়ে উঠল। গর্জনটা এগিয়ে এল। ভীষণ শক্তির নীচু স্বরের আওয়াজ। যেন বিরাট এক শিঙা বাজছে। শেষ গাছটার ধারে একটা বিরাট মাথাওয়ালা শরীর আবছা দেখা গেল। বিরাট এক সিংহ এগিয়ে আসছে ভীত ক্রীতদাসদের দিকে। পিছনে একটা সিংহীর লম্বা নিঃশব্দ ছিপছিপে নিচু শরীর। জন্তুগুলোর দিকে বর্শা তুলে ধরা হল, চাপা আগুনে চক চক করে উঠল তামার ফলা। শুকনো ঘাসে আগুন ধরে যাবার ঝুঁকি নিয়ে সবাই চেঁচাতে চেঁচাতে সিংহদুটোর দিকে ছুঁড়তে লাগল জ্বলন্ত কাঠ। সিংহদুটো থতমত খেয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে চলে গেল মাঠের দিকে। ক্রীতদাসরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বর্শা বাগিয়ে ধরে রইল। কিন্তু জন্তুদুটো আক্রমণ করল না।

এর পর যাদের বিশ্রাম করার পালা, তারা ঘুমিয়ে পড়ার আগে আবার সিংহের গর্জন শোনা গেল, পর পর তিনবার। ছাউনির চারপাশে তখন তিনটে সিংহ ঘোরা ফেরা করছে সেই সঙ্গে আগেকার সিংহীটাও। সবাই বুঝতে পারল অমন ছোট পলকা বেড়ায় সন্তুষ্ট থাকাটা ভীষণ বোকামো হয়েছে। পিছন থেকে আক্রমণ ঠেকাবার জন্য চার জন লোক বর্শা বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আরো ছ জন বর্শাধারী দাঁড়াল আগুনের কাছে। কেউ আর ঘুমল না। যে যা পারল তাই নিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল। আবার একটা ভীষণ গর্জনের পর আগুনের শেষ কুন্ডটার কাছে দেখা গেল একটা বিরাট বালিরং কেশরওয়ালা সিংহ। আগুনের কম্পিত শিখায় তাকে আরো অনেক বড় দেখাচ্ছে। ক্রীতদাসদের

দিকে তাকিয়ে থাকা চোখদুটো থেকে ঠিকরে পড়ল সবুজ আলো। দুর্ভাগ্যবশত উত্তর এশিয়ার এক আনাড়ী শিকারী কাছেই তীরধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সিংহের গর্জন শুনে ভয় পেয়ে সে সোজা তার মুখে এক তীর চালিয়ে দিল। গর্জন থেমে গিয়ে প্রথমে শোনা গেল দীর্ঘ গোঙানি। তারপর এক ঘড়ঘড়ে কাশি। তারপর কিছুই না।

'সাবধান!' নুবীয়দের একজন মরীয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

সিংহের শরীরটা শূন্যে পাক খেয়ে উঠল। এক লাফে আগুন পার হয়ে এসে পড়ল লোকেদের মাঝখানে। কিন্তু সাদা গণ্ডারকে যারা ঘায়েল করেছে তাদের ঘাবড়ে দেওয়া অত সহজ নয়। বর্শাগুলো সিংহের বুক আর দুপাশ ফুঁড়ে দিল। চারটে তীর গেঁথে ফেলল তার দীঘল শরীর। সিংহের প্রচণ্ড থাবায় দুটো বর্শার দণ্ড মট করে ভেঙে গেল। ঠিক সেই সময় তিনটি দীর্ঘকায় নিগ্রো ঢালের আড়ালে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখে সিংহের বুকে লম্বা ছোরা বসিয়ে দিল... সিংহটা বিষণ্ন সুরে গুঙিয়ে উঠল। সিংহের রক্তে নেয়ে ওঠা ক্রীতদাসরা লাফিয়ে পিছিয়ে গেল।

মুহূর্তের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল কানে তালা ধরিয়ে দেওয়া জয়ধ্বনিতে। সারা সমতল সেই চীৎকারে ভরে গেল। মরা সিংহটাকে আগুনের সামনে ফেলে রেখে সবাই সদ্য আহত দুটি লোকের পরিচর্যা সুরু করল। লোকদুটি তখনো লড়াইয়ের উত্তেজনায় কাঁপছে।

অন্য সিংহগুলো সূর্যোদয় পর্যন্ত ছাউনির চারপাশে ঘুরে বেড়াল, থেকে থেকে গর্জন করে উঠল। কিন্তু আর আক্রমণ করল না।

হঠাৎ সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে সূর্য উঠল নতুন দিনের। সেই সঙ্গেই সাংঘাতিক আহতদের মধ্যে পাঁচ জন ফেলল শেষ নিঃশ্বাস। দেখা গেল আরো সাত জন রাত্রেই মারা গেছে। সিংহের গোলমালে কেউ খেয়ালই করেনি। আখ্‌মি তখনো নিঃশ্বাস নিচ্ছে, তার ফ্যাকাশে ঠোঁটদুটো মাঝে মাঝে অল্প নড়ছে।

পান্দিওন চোখ মেলে শুয়ে। বুকটা শান্তভাবে উঠছে নামছে। নিঃশ্বাস সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কিদগো তার উপর ঝুঁকে পড়ে

ভয় পেয়ে গেল, পান্দিওন তাকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু জল এনে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই পান্দিওন তা খেয়ে ধীরে ধীরে চোখ বুজে ফেলল।

আগের দিনের বাড়তি খাবারে সকালের জলখাবার সেরে নেওয়ার পর কাভি সবাইকে রওনা হতে বলল। এশীয়রা আগের দিন রাত্রে নিজেদের মধ্যে একটা কী বোঝাপড়া করেছে। তারা আপত্তি জানাল। বলতে লাগল, যে দেশে এত সব হিংস্র জীবজন্তু সে দেশে গেলে তাদের নির্ঘাৎ মৃত্যু ঘটবে। এই ভীষণ সমতল ছেড়ে পালান উচিত, মরুভূমি অনেক বেশি নিরাপদ আর পরিচিত। কাভি আর নিগ্রোরা তাদের অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল. কিন্তু তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

'ঠিক আছে, তোমরা যা ইচ্ছে তাই কর,' কাভি দৃঢ়তার সঙ্গে বলল। 'আমি কিদগোর সঙ্গে দক্ষিণে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে যারা যেতে চাও তারা এদিকে চলে এস। পূবমুখে যারা যেতে চাও তারা সরে দাঁড়াও বাঁয়ে।'

কালো আর ব্রোঞ্জ রংয়ের লোকেদের একটা দল সঙ্গে সঙ্গে কাভিকে ঘিরে দাঁড়াল — নিগ্রো, লিবীয়ার লোকেরা আর নুবীয়রা। সবশুদ্ধ সাঁইত্রিশ জন। অবশ্য পান্দিওন আর সেই ভাঙা পা নিগ্রোটিকে বাদ দিয়ে। সে নিগ্রোটি এক কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে একটু উঠে সবার কথাবার্তা মন দিয়ে শুনছিল।

বত্রিশ জন লোক গোঁয়ারের মতো মাথা নুইয়ে বাঁ দিকে সরে দাঁড়াল।

অস্ত্রশস্ত্র আর জলপাত্রগুলো দুদলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হল, এশীয়রা যাতে পরে মুশকিলে পড়লে অন্যদের দোষ দিতে না পারে।

জিনিসপত্র ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এশীয়দের লম্বা দাড়িওয়ালা নেতা তার দলবল নিয়ে পূবমুখে নদীর দিকে চলতে সুরু করল, যেন তার ভয় সঙ্গীদের প্রতি প্রীতির ফলে তাদের দৃঢ়তায় চিড় ধরতে পারে। যারা রয়ে গেল তারা অনেকক্ষণ ধরে অন্যদের দিকে চেয়ে রইল -- ঠিক মুক্তির মুখে এসে দুদলে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল — তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তারা নিজেদের কাজে মন দিল।

কাভি আর কিদগো ভাল করে পরীক্ষা করে পান্দিওন আর আহত নিগ্রোকে আরেকটা পাৎলা ডাল গাছের নিচে নিয়ে গেল। আখ্মিকে তোলার চেষ্টা করা মাত্রই তার গলা দিয়ে একটা ভীষণ চীৎকার বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গেই নির্ভীক মুক্তি সংগ্রামী শেষ নিঃশ্বাস ফেলে প্রাণত্যাগ করল।

কাভি লিবীয়ার লোকদের আখ্মির মৃতদেহটাকে গাছের উপর তুলে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে বলল। তক্ষুনিই তাই করা হল, যদিও সবাই জানে মাংসলোলুপ পাখিরা আখ্মির শরীর ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে। তবু হায়েনার মুখে ফেলে যাওয়ার চেয়ে সেটাই ভাল মনে হল।

কাভি আর কিদগো একটিও কথা না বলে কতগুলো ডাল কেটে নিল।

দীর্ঘকায় নিগ্রোদের একজন এগিয়ে এসে কাভিকে জিজ্ঞেস করল: 'এটা কী করছ?'

পান্দিওনকে দেখিয়ে কাভি বলল, 'খাটিয়া। কিদগো আর আমি ওকে বয়ে নিয়ে যাব, তোমরা নিয়ে যাবে পা ভাঙা নিগ্রোটিকে। লিবীয়ার লোকের হাত বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে সে নিজেই হেঁটে যেতে পারবে।'

'গণ্ডারের উপর ও প্রথম লাফিয়ে উঠেছিল, আমরা সবাই মিলে ওকে বয়ে নিয়ে যাব,' সঙ্গীদের দিকে ঘুরে নিগ্রোটি বলল। 'ঐ সাহসী বীরই তো আমাদের বাঁচিয়েছে, ওকে কি আমরা ভুলতে পারি। দাঁড়াও আরো ভাল খাটিয়া আমরা তৈরী করছি।'

চার জন নিগ্রো কিছুক্ষণের মধ্যেই সুন্দর একটা খাটিয়া বানিয়ে ফেলল। গণ্ডারের সঙ্গে লড়াইয়ের জায়গাটায় অনেক দড়ি পড়ে ছিল। লম্বা লম্বা লাঠির সঙ্গে সেগুলো বেঁধে দেওয়া হল। ডালগুলো শক্ত রাখার জন্য দুটো করে মোটা কাঠের ঠেকা দেওয়া হল। ঠেকার মাঝখানে শক্ত বাকল দিয়ে তৈরী বালিশ বসান হল। এক টুকরো সিংহের চামড়া দিয়ে সেটা মোড়া। পা ভাঙা নিগ্রোটি আনন্দে হাসিমুখে অন্যদের কাজ দেখতে লাগল। তার কালো চোখদুটো কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে।

আহতদের খাটিয়ায় তোলা হল। যাত্রার জন্য সবই প্রস্তুত। দুজন করে নিগ্রো খাটিয়াগুলো টানা হাতে তুলে ধরে দাঁড়িয়ে মাথার উপর বালিশ দিয়ে নিল। তারপর পায়ে পা মিলিয়ে হালকাভাবে আগে বেরিয়ে পড়ল।

অচেতন পান্দিওনের যাত্রা সুরু হল এ ভাবে। দুজন নুবীয় আর একজন নিগ্রো বর্শা আর তীরধনুক নিয়ে আগে আগে গেল, পথপ্রদর্শক হিসাবে। বাকি ত্রিশজন একজন করে সার বেঁধে চলতে লাগল খাটিয়াদুটোর পিছন পিছন। সবার শেষে বর্শা হাতে দুজন আর তীরধনুক হাতে আর একজন লোক। খোলা জায়গার ধার দিয়ে যাত্রীরা এগিয়ে গেল পশ্চিমে। সবার তখন এক প্রচেষ্টা, পরিত্যক্ত সঙ্গীদের দিকে যাতে না তাকাতে হয়। রাত্রে মাংসলুব্ধদের অত্যাচার থেকে সঙ্গীদের দেহ রক্ষা করতে পারেনি বলে সবার মনেই অপরাধের একটা তিক্ত ভাব।

দিনের বিশ্রামের কিছু পরেই যাত্রীরা একটা চওড়া শুকনো জলখাতে এসে পড়ল। অনেক দূর থেকেই সেটা দেখা গিয়েছিল। মাঠের হলদে ঘাসের গায়ে পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল তীরের ঝোপগুলো।

জলখাতের ধার দিয়ে যাত্রীরা চলল দক্ষিণমুখে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তারা আর থামল না। জলের জন্য সেদিন আর বালি খুঁড়তে হল না, খসখসে ভঙ্গুর পাথরের ফাটল দিয়ে একটা ছোট্ট জলের ধারা বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু ছাউনি ফেলা আর চারপাশে শক্ত প্রাচীর বাঁধার জন্য তাদের বেশ খাটতে হল। সে রাত্রে সবাই শান্তভাবে ঘুমল। দূর থেকে ভেসে আসা সিংহের গর্জন আর অন্ধকারে হায়েনাদের ঘোরাঘুরিতে যাত্রীদের ঘুমের কোন ব্যাঘাত হল না।

দ্বিতীয় আর তৃতীয় দিনও পার হয়ে গেল নির্ঝঞ্ঝাটে। একবার কেবল ঘাসের মধ্যে মাথা নিচু করে একটা কালো গণ্ডারকে ঘুরতে দেখা গেল। গণ্ডার দেখে সবাই ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল — কয়েকদিন আগেকার অভিজ্ঞতার স্মৃতি তখনো তাদের মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। সবাই শুয়ে পড়ল ঘাসের মধ্যে। গণ্ডারটা মাথা তুললে আবার, সেই ভীষণ দিনের মতো, তার দূরে দূরে বসান বাঁকা কান আর মাঝখানে শিঙের ডগাটা

সবাই দেখতে পেল। মোটা চামড়ার ভাঁজগুলো কাঁধ জড়িয়ে ঘাসে ঢাকা মোটা মোটা পাগুলোর কাছে ঝুলে পড়েছে। বিরাট জন্তুটা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিজের পথে চলে গেল।

মাঝে মাঝে হলদে-ধূসর ক্ষুদে হরিণের ছোট ছোট পালও দেখা গেল। শিকারীরা তীর মেরে দুএকটাকে খতম করল। তার ফলে সবার কপালে জুটল সুস্বাদু মাংস। চার দিনের দিন জলের শুষ্ক খাতটা প্রথমটা চওড়া হয়ে পরে মিলিয়ে গেল। হলদে মাটির জায়গায় দেখা দিল গুঁড়ো গ্রানিটের উপর অদ্ভুত রকমের লাল মাটির পাতলা স্তর*। সেই একঘেয়ে লাল সমতলের বুকে গ্রানিট পাহাড়ের কালো ঢিপি। ঘাস নেই। তার বদলে মাটি থেকে বেরিয়ে রয়েছে তীক্ষ্ন সরু তলোয়ারের ফলার গুচ্ছের মতো শক্ত পাতা**। ক্ষুরের মতো ধারাল পাতা এই গাছগুলোকে এড়িয়ে পথপ্রদর্শকরা অনেক ঘুরে ঘুরে এগোতে থাকল।

সামনে ছড়ান সেই লাল সমতল। সমান আকারের ধুলোর মেঘ স্তম্ভের মতো উঠে সূর্যের চোখ ধাঁধান আলো ঢেকে দিয়েছে। অসম্ভব গরম। যাত্রীরা তবু হেঁটে চলেছে। জলহীন এই সমতল কত বড় তা তারা জানে না, তাই তারা ভয় পেয়েছে। সেই ফল্গুধারা জলখাত অনেক পিছনে পড়ে আছে। কে জানে আবার কখন পাওয়া যাবে জল, এদেশে যা একান্তই প্রয়োজনীয়!

গ্রানিটের একটা টিলার মাথায় উঠে যাত্রীরা দেখতে পেল সামনে একটা সোনালি কিসের রেখা। লাল মাটি তবে ওখানেই শেষ হয়ে আবার ঘাসের সমতল সুরু হয়েছে। সত্যিই তাই। যাত্রীরা যখন আগের চেয়ে বেঁটে কিন্তু অনেক ঘন ঘাসের ভিতর দিয়ে চলতে সুরু করল, তাদের ছায়া তখন দুপুরের চেয়ে কেবল অর্ধেক দীর্ঘতর। রাস্তার এক ধারে দেখা গেল একটা মস্ত সবুজ মেঘ, তার নীলচে-কালো ছায়া মাটির উপর

---

* ল্যাটেরাইট — লাল লৌহ আকর মিশ্রিত মাটি দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলিতে পাওয়া যায়, আগ্নেয় শিলার ক্ষয়ের ফলে তার উৎপত্তি।

** সানসেভেরিয়া — শুকনো ল্যাটেরাইট সমতলে প্রাপ্ত এক জাতের গাছ।

আকাশে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। বিরাট 'অতিথি বৃক্ষ' তার ছায়ায় বিশ্রাম নেবার জন্য ডাকছে। পথপ্রদর্শকরা গাছটার দিকে এগিয়ে যেতে ক্লান্ত যাত্রীরা গতি বাড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরেই খাটিয়াদুটো নামান হল গাছের ছায়ায়। গাছটার গুঁড়ি যেন কয়েকটি অর্ধবৃত্ত স্তম্ভ গায়ে গায়ে জুড়ে তৈরী।

এক দল নিগ্রো সিঁড়ির মতো করে দাঁড়াল। অন্যেরা তাই বেয়ে উঠে গেল গাছের বিরাট ডালগুলোয়। উপর থেকে সোল্লাস চিৎকার শুনে বোঝা গেল ওদের অনুমান ভুল হয়নি। পনের হাত ব্যাসের ফাঁকা গাছের গুঁড়িতে কয়েক দিন আগের বৃষ্টির জল ধরা রয়েছে। জলপাত্রগুলো ঠাণ্ডা কালো জলে ভরে ফেলা হল। নিগ্রোরা উপর থেকে কতগুলো ফল ছুঁড়ে দিল। মানুষের মাথার সমান বড় লম্বাটে ফল। দুদিক ছুঁচলো। পাৎলা শক্ত খোলার ভিতর ফোলা ফোলা হলদে রঙের এক রকম জিনিস। খেতে মিষ্টি মিষ্টি টক টক। তৃষিত যাত্রীরা তা খেয়ে বেশ চাঙা হয়ে উঠল। দুটো ফল ভেঙে কিদগো কতগুলো ছোট ছোট বীচি বের করে নিল। তারপর সেই ফোলা জিনিসটাকে পিষে অল্প জলের সঙ্গে মিশিয়ে পান্দিওনকে খাওয়াতে লাগল।

পান্দিওন বেশ আগ্রহভরেই খেল, তারপর এই প্রথম মাথা তুলে চারদিকটা দেখবার চেষ্টা করল (যাত্রার সময়, খাটিয়ায় শোয়া পান্দিওনের মুখ সাধারণত জলাশয়ের পাড়ের ঝোপ থেকে বড় বড় পাতা ছিঁড়ে এনে ঢেকে রাখা হয়েছিল)। কিদগো তা দেখে মহাখুসি। বহু কষ্টে পান্দিওন হাত বাড়িয়ে দুর্বল আঙুলগুলো দিয়ে কিদগোর হাতে চাপ দিল। কিন্তু তার চোখদুটো কেমন যেন নিষ্প্রভ করুণ।

কিদগো খুব উত্তেজিত হয়ে পান্দিওনকে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছে সে। কিন্তু কোন উত্তর পেল না। আহত পান্দিওনের চোখদুটো বুজে গেল আবার যেন ফিরে আসা প্রাণের ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গ তাকে অত্যন্ত ক্লান্ত করে তুলেছে। বন্ধুকে শান্তিতে বিশ্রাম করতে দিয়ে কিদগো কাভিকে সুখবরটা দিতে ছুটল। সেই ভীষণ লড়াইয়ের দিন থেকে কাভি আরো কঠোর বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে। খাটিয়ার কাছে বসে সে বন্ধুর মুখের দিকে

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। পান্দিওনের বুকে হাত রেখে হৃৎস্পন্দনটা দেখে নিতে চাইল।

কাভি যখন পান্দিওনের কাছে বসে, নুবীয়দের একজন তখন একটা উঁচু গাছের মাথায় চড়ে চারপাশের দেশটা দেখছিল। গাছের মাথা থেকেই লোকটি জোরে চেঁচিয়ে উঠল। বলল, সামনে প্রায় দিগন্তের কাছে কাঁটাঝোপের কালো বেড়া দেখা যাচ্ছে। পালিত পশুকে হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যাযাবর পশুপালকরা এরকম বেড়া দিয়ে রাখে।

ঠিক হল রাত্রিটা ঐ গাছের তলাতেই কাটিয়ে ভোর ভোর আবার রওনা হবে। যাযাবরদের ছাউনিতে তবে বেশ সকাল সকালই পেঁছিন যাবে। সূর্যাস্তের দিকে সারা আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। তারাহারা রাত্রি অস্বাভাবিক রকম নিঃশব্দ আর কালো। মখমলের মতো সেই অন্ধকার এতই গভীর যে মুখের সামনে হাত ধরলেও হাত দেখা যায় না।

কিছুক্ষণ পরেই সারা আকাশ চিরে ফেলল আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ। দূর থেকে শোনা গেল অনবরত বাজের গর্জন। বিদ্যুতের চমক বেড়ে উঠল। আকাশ ভরে ফেলল বিরাট গাছের শুকনো ডালপালার মতো শত শত আগুনে সাপ। মেঘের গর্জনে সবার কানে তালা লেগে গেল। আশ্রয় ছেড়ে যারা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল বিদ্যুতের চমকে তাদের চোখ গেল ধাঁধিয়ে। বহুদূর থেকে ছুটে এসে একটা আওয়াজ ক্রমশ প্রচণ্ড গর্জনে পরিণত হল। বৃষ্টি। ভীষণ বৃষ্টি। গাছটা প্রাণপণে হেলছে দুলছে, তার উপর ঝরে পড়ছে জলের মহাসমুদ্র। প্রবল শব্দে মাটির উপর আছড়ে পড়ছে ঠাণ্ডা বৃষ্টির জলপ্রপাত। দেখতে দেখতে সেই বড় গাছটার মোটা মোটা শিকড়ওয়ালা গোড়া জলে ডুবে গিয়ে হ্রদের সৃষ্টি হল। কখনো কখনো সর্বগ্রাসী ভীষণ অন্ধকার, পর মুহূর্তে আবার ঘন আগুনে দেয়ালের আলো। মনে হচ্ছে সারা প্রান্তর যেন অনিবার্যভাবেই বৃষ্টির জলে ভেসে যাবে। কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু বিদ্যুতের চমক থেমে গেল। বৃষ্টি ধরে এল। সমতলের উপর ছড়িয়ে পড়ল তারার আলোয় আলোকিত আকাশ। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ভেসে এল অন্ধকারে অদৃশ্য ঘাস আর ফুলের সুগন্ধ।

লিবীয়ার লোকেরা আর কাভি তো এই প্রবল বর্ষণ দেখে স্তম্ভিত। তাদের কাছে এই বর্ষণ প্রলয়েরই সমান। নিগ্রোদের মুখে কিন্তু আনন্দের হাসি। তারা বলল, এ তো অতি সাধারণ ব্যাপার, বর্ষাকালে এরকম আকছার হয়ে থাকে, তার উপর এ তেমন কিছু জোর বৃষ্টিও নয়। কাভি মাথা নেড়ে মনে মনে বলতে লাগল, এই যদি হয় সাধারণ বৃষ্টির নমুনা তাহলে কালো লোকেদের রাজ্যে তাদের অনেক অদ্ভুত সব ব্যাপার দেখতে হবে।

সে ঠিকই ভেবেছিল।

পরের দিন হঠাৎ কুকুরের ঘেউঘেউ'এ তাদের যাত্রায় বাধা পড়ল। আগের দিনের বৃষ্টির জল উপে গিয়ে কুয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কাঁটাঝোপের লম্বা বেড়া। বেড়ার ওপারে যাযাবরদের ছোট ছোট কুঁড়েঘর।

চামড়ার এপ্রন পরা একদল লোক যাত্রীদের ঘিরে ফেলল। উঁচু গালের হাড়। মুখ দেখে মনের ভাব বোঝা অসম্ভব। চেরা কালো চোখগুলো যাত্রীদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে, কারণ হাতে তাদের মিশরী অস্ত্র। নুবীয় পথপ্রদর্শকের সেই প্রতীকটা দেখে অবশ্য ওরা খুবই সন্তুষ্ট হল। দল থেকে পাঁচ জন কালো আর সাদা পালক পরা লোক বেরিয়ে এল। চুলগুলো মাথার উপর তুলে বেঁধে সবুজ পাতার বৃন্তের বুনুনির সাহায্যে খাড়া করে রাখা হয়েছে।

নুবীয়রা যাযাবরদের ভাষা বুঝত। কিছুক্ষণ পরেই অতিথিরা বসে বসে দইয়ে চুমুক মারতে লাগল, তাদের ঘিরে বসল শ্রোতার দল। নুবীয় ক্রীতদাসরা সুরু করল তাদের গল্প। এ ওকে বাঁধা দিয়ে উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে তারা গল্প বলে চলল। শ্রোতারা তা শুনে সমস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকল। পালকে সজ্জিত সর্দাররা কেবল নিজেদের ঊরুতে চাপড় মেরে চলল।

যাযাবররা যাত্রীদের ছজন পথপ্রদর্শক দিল আর দশটা গাধা। পথপ্রদর্শকরা সর্বদা জলপূর্ণ নদীর ধারের একটা বড় গ্রামে যাত্রীদের

পেঁছে দেবে। সে গ্রামে যে জাতির বাস তারা যাযাবর নয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে যেতে সাতদিনের পথ।

খাটিয়াগুলো ফিরে তৈরী করে চারটে গাধার উপর বসিয়ে দেওয়া হল। বাকি গাধার উপর চাপান হল শক্ত চামড়ার থলেতে ভরা জল দই আর শক্ত পনির। সবাই এখন ঝাড়া হাত পা বলে অনেক দূর এগোবারও সুবিধা হল। দিনে এখন একশ কুড়ি হাজার হাত তো নিশ্চয়ই হাঁটা যাবে।

দিনের পর দিন যায়। প্রচণ্ড রোদে পুড়ছে অপার সমতল, কখনো গরমে ক্লান্ত নীরব, কখনো বা হাওয়ায় লম্বা লম্বা ঘাসের গায়ে সমুদ্রের মতো ঢেউ ওঠে। যাত্রীরা ক্রমশই দক্ষিণের বন্য অঞ্চলে ঢুকতে লাগল। সেখানে অসংখ্য হিংস্র জন্তু। লম্বা ঘাসের মধ্যে ছুটে পালিয়ে যায়, যাত্রীদের অনভ্যস্ত চোখে প্রথমে তাদের পরিচয় ধরা পড়ে না। কেবল ঘাসের উপর তাদের পিঠ দেখা যায় কখনো, কখনো শিং — ছোট বাঁকা, লম্বা খাড়া, কিম্বা পাকান। ক্রমশ যাত্রীরা শিং দেখে প্রাণীদের জাত চিনতে শিখে গেল। লম্বা শিং ওরিক্স্। লালচে বেঁটে মোটা ষাঁড়-হরিণ। নাকে কুঁজ, বিশ্রী লোমওয়ালা গ্নু। তাছাড়া লম্বা কান হরিণ, আকারে বাছুরের সমান, গাছের তলে দাঁড়িয়ে পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে নাচে*।

এক মানুষ লম্বা খসখসে শক্ত ঘাস সীমাহীন শস্যক্ষেতের মতো যাত্রীদের চারদিকে ঢেউ খেলিয়ে চলেছে। ঘাসের সমুদ্রে রোদ পড়ে সোনালি হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে এখন জলে ভরা শুকনো জলখাত আর ডোবার কাছে কচি সবুজের ছোপ। দিগন্তের বুকে নীল আর লাইলাক রংয়ের বিরাট পর্বতমালা ঘাসে ঢাকা প্রান্তর কেটে বসে গেছে।

গাছগুলো কখনো খুবই কাছাকাছি এসে হলদে ঘাসের বুকে কালো দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। কখনো আবার ভয়-পাওয়া পাখির ঝাঁকের মতো ছড়িয়ে পড়েছে যত্রতত্র। বেশির ভাগই ছাতার আকারের গাছ। সোনালি

---

* গেরেনুক বা ওয়েলার হরিণ — লম্বাগলা, পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে গাছের পাতা ছিঁড়ে খায়।

সমতলে প্রথম এসে কাভি এই জাতের গাছ দেখে অবাক হয়েছিল। কাঁটাওয়ালা কাণ্ডটা তল থেকে উপরে উঠে ছড়িয়ে পড়েছে ফানেলের মতো। কোন কোন গাছের কাণ্ড আবার মোটা আর বেঁটে, সেগুলোও অজস্র ডালে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের ঘন সবুজ পাতার আবরণ দেখে মনে হয় যেন একটা সবুজ গম্বুজ দাঁড় করান রয়েছে। তালগাছগুলোকে তাদের দুমুখো ডাল, ডালের মাথায় ঝুঁটি করে বাঁধা ছুরির মতো, অবিন্যস্ত পাতার জন্য বহুদূর থেকেই দেখা যায়।

কিছুদিন যেতে কাভির চোখে পড়ল, তা-কেম আর মহানদীতে যে নবীয় আর নিগ্রোরা বোকার মতো জবুথবু হয়ে থাকত তারা ক্রমশই দৃঢ়তায় আত্মপ্রত্যয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তার নেতৃত্ব অবিসংবাদিত, কিন্তু তবু সে এই অজানা দেশের দুর্বোধ্য জীবনযাত্রায় নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে সুরু করেছে।

লিবীয়ার লোকেরা মরুভূমিতে তাদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল অথচ এখানে এসে তারা অসহায় হয়ে পড়ল। শ্বাপদসংকুল ঘাসের সমতল দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল। তাদের কাছে ঘাসের মধ্যে অসংখ্য বিপদের সম্ভাবনা। তাদের ধারণা, প্রতি পদেই নিশ্চয় কোন দুর্যোগ লুকিয়ে আছে।

পথটা সত্যিই যাত্রার পক্ষে দুর্গম। একরকম ঘাস পথে পড়ল, তার মাথায় লক্ষ লক্ষ ছুঁচের মতো কাঁটা*। গায়ে ফুটে চুলকুনি আর ভীষণ পুঁজ হয়। দিনের বেলা গরম যখন সবচেয়ে বেশি, হিংস্র জন্তুরা তখন গাছের তলে লুকিয়ে থাকে। ছায়া পড়ে ঝলমলে রোদে ঘাসের ঝোপের মধ্যে গুহার মতো দেখায়, সেখান থেকে একেক সময় বেরিয়ে আসে চিতাবাঘের দীঘল শরীর।

নিগ্রোরা আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে লাল হরিণ মেরে চমৎকার সুস্বাদু পুষ্ঠিকর মাংস জুগিয়ে চলেছে। তা খেয়ে ছাড়া পাওয়া ক্রীতদাসরা হয়ে উঠেছে বেশ শক্তসমর্থ। দূরে যখন নিচের দিকে বেঁকে নেমে আসা লম্বা

---

* এস্‌কেনাইট ঘাসের কাঁটা।

শিংওয়ালা ধূসর-কালো বিরাট বিরাট মহিষের পাল দেখা যায়, নিগ্রোরা তখন সবাই সাবধান করে দেয়। সবাই তখন আফ্রিকার সমতলের এই সবচেয়ে মারাত্মক জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছের আড়ালে আশ্রয় নেয়।

নদিন ধরে পথ চলেও কোথাও জনবসতির চিহ্ন দেখা গেল না। পথের দূরত্বটা আঁচ করতে পথপ্রদর্শকদের নিশ্চয়ই ভুল হয়েছিল। লিবীয়ার লোকটির হাত সেরে গেছে। ভাঙা-পা নিগ্রোটি এখন খাটিয়ায় উঠে বসতে পারে। এমন কি রাত্রে সে আগুনের চার ধারে থপ থপ করে লাফায়, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। তা দেখে সঙ্গীরা সবাই খুশি। সে সেরে ওঠায় তারা সবাই আনন্দিত। কেবল পান্দিওন তখনো একইভাবে পড়ে আছে। কাভি আর কিদগো জোর করে তাকে আরো পুষ্টিকর খাবার খাওয়ায়।

বর্ষাকাল। সমতলে তখন জীবনের পূর্ণ সম্ভার।

ঘাসের মধ্যে লক্ষ লক্ষ পোকা গান আর গুনগুন করে চলেছে। রংচঙে সব পাখিরা নীল হলদে পান্নাসবুজ আর কালো-মখমল রঙের চমক দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাকান ধূসর ডালের জঙ্গলে। দিনের বেলা গরম যতই বেড়ে ওঠে ছোট্ট বাস্টার্ড পাখির সুরেলা ডাক ততই বেড়ে যায় — 'মাক্-হার, মাক্-হার'।

জীবনে এই প্রথম কাভি আফ্রিকার দৈত্যদের দর্শন পেল।

প্রায়ই দেখা যায় ঘাসের উপর দিয়ে নিঃশব্দে শান্ত ভঙ্গীতে ভেসে চলেছে হাতিদের বিরাট ধূসর শরীর। কানদুটো পালের মতো যাত্রীদের দিকে বাড়ান। উজ্জ্বল সাদা দাঁতগুলো সর্পিল কালো শুঁড়ের গায়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। হাতি দেখে কাভির বড় ভাল লাগল। বিরাট জন্তুদের হাবভাব চালচলনে বেশ একটা শান্তশিষ্ট, জ্ঞানগম্ভীর ভাব। চঞ্চল হরিণ, ক্রুদ্ধ গণ্ডার আর গুটনো স্প্রিংয়ের মতো দ্রুতগতি শিকারী জন্তুদের সঙ্গে তাদের কোনই মিল নেই। এই রাজকীয় জন্তুটিকে যাত্রীরা কয়েকবার বিশ্রামরত অবস্থায়ও দেখতে পেয়েছে — গাছের ছায়ায় সারাটা পাল ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছে। বিরাট বুড়ো মদ্দা হাতিগুলো

মস্ত দাঁতের ভারে ভারী গোল মাথাগুলো নুইয়ে রেখেছে। মাদীগুলো তুলে রেখেছে তাদের একটু চ্যাপ্‌টা মাথা। একবার আলাদা একটা বুড়ো মদ্দা হাতির সঙ্গে তাদের দেখা হয়। হাতিটা রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেজায় ঘুমচ্ছিল। নিশ্চয়ই ছায়ায় দাঁড়িয়েই ঘুমচ্ছিল, কিন্তু রোদ ক্রমশ সরে গেছে। এমন ঘুমই ঘুমচ্ছিল হাতিটা যে গরম টরম কিছুই টের পায়নি। বিরাট হাতিটা কাভি অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দেখেছিল।

হাতিটা পিছনের পাদুটো একটু ফাঁক করে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল। নামান শুঁড়টা গুটনো, ক্ষুদে চোখগুলো বোজা, সরু ল্যাজটা পিছনের ঢালু বেয়ে ঝুলে আছে। মোটা দাঁতদুটো ভয়াবহভাবে সামনে ওঁচান, তাদের ছুঁচলো ডগাদুটো দুদিকেই অনেক দূরে ছড়ান।

গাছ যেখানে কম, সেখানে এক জাতের অদ্ভুত আকারের জন্তু দেখা গেল। লম্বা পা, ছোট্ট খাড়া শরীর, অনেকটা ঢালু পিঠ, সামনের পাদুটো আবার পিছনের চেয়ে অনেক লম্বা। শক্তিশালী কাঁধ আর চওড়া বুক থেকে উঠে গেছে মস্ত লম্বা গলা। গলাটা সামনের দিকে বাঁকান, তার উপর ছোট ছোট শিং আর গোলচে কানওয়ালা ক্ষুদে মাথা। এ হল জিরাফ। পাঁচ থেকে একশটা পর্যন্ত জিরাফ একসঙ্গে দল বেঁধে থাকে। খোলা প্রান্তরের বুকে জিরাফের বড় দল — সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। মনে হয় যেন হাওয়ার চাপে একদিকে ঝুঁকে পড়া একটা বন উজ্জ্বল রোদে অদ্ভুত ছায়া ফেলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যাচ্ছে। জিরাফরা কখনো চলে দুলকি চালে, কখনো জোর কদমে। চলার ভঙ্গীটাও অদ্ভুত, সামনের পাদুটো মুড়ে পিছনের পাদুটো বহুদূর ছড়িয়ে। গায়ে উজ্জ্বল হলদে রংয়ের ডোরা। মাঝে মাঝে বড় বড় কালো পোঁচ, দেখে মনে হয় যেন গাছের ছায়া, জন্তুগুলো তার আড়ালে একেবারে অদৃশ্য। তারা সাবধানে ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে পেট পুরে খায়, কিন্তু বিনা লোভে, বড় বড় সজাগ কানদুটো এদিক ওদিকে নড়তে থাকে।

লম্বা লম্বা ঘাসের ঢেউয়ের উপরে প্রায়ই তাদের গলার দীর্ঘ রেখা যাত্রীদের চোখে পড়ে — দলটা ধীর পায়ে চলে, উজ্জ্বল কালো চোখ, দর্পভরে মাথাটা মাটি থেকে দশ হাত উঁচুতে তুলে ধরে।

শান্ত নিরীহ জিরাফদের ধীরস্থির চালচলন এত সুন্দর যে দেখা মাত্র তাদের ভাল না লেগে পারে না।

ঘাসের ঘন দেয়ালের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে গণ্ডারের ভয়াবহ ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দও যাত্রীদের কানে আসে। কিন্তু এই ক্ষীণদৃষ্টি দৈত্যকে কী ভাবে এড়িয়ে যেতে হয়, তা তারা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে। গণ্ডারের সঙ্গে মোলাকাতে তারা আর ভয় পায় না।

একের পর এক সার বেঁধে যাত্রীরা এগিয়ে চলেছে। সংকীর্ণ পথের দলিত ঘাসের উপর দেখা যাচ্ছে কেবল তাদের বর্শার ফলা আর রোদ আটকানর জন্য ছেঁড়া কাপড় আর পাতায় ঢাকা মাথাগুলো। চারপাশে ছড়ান ঘাসে ঢাকা অন্তহীন একঘেয়ে প্রান্তর। দিনের বেলা যাত্রীদের অনুসরণ করে ঘাস আর জ্বলন্ত আকাশ। রাত্রে স্বপ্নে দেখা দেয় আবার ঘাস। মনে হল সেই হাঁপ-ধরান, সরসর আওয়াজ তোলা অন্তহীন ঘাসের সমুদ্রে তারা বোধহয় চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে। দশদিনের দিন সামনে একটা পাহাড় দেখা গেল, তার সামনে টাঙান আবছা নীলচে পর্দা। পাহাড়ে উঠে যাত্রীরা এসে পেঁৗছল একটা পাথুরে মালভূমিতে। চারদিকে ঝোপঝাড় আর শূন্যে পাতাহীন ডালপালার হাত বিষণ্ণভাবে মেলে দেওয়া কতগুলো গাছ*। গাছের গুঁড়ি আর ডালপালা সেই একই বিষাক্ত সবুজ রঙের। গাছগুলো ছোট হাতলওয়ালা বুরুশের মতো দেখতে, খোঁচা খোঁচা ছোট চুল, বেঁটে খুঁটির উপর বসান। তীব্র গন্ধ। পল্‌কা ডালগুলো অল্প হাওয়াতেই ভেঙে যায়। তখন দুধের মতো একরকম ঘন রস বেরিয়ে লম্বা লম্বা ফোঁটায় দানা বেঁধে জমে যায়। পথপ্রদর্শকরা এই অদ্ভুত বন ছুটে পার হয়ে গেল। তাদের ধারণা, বেশি হাওয়া উঠলে গাছগুলো চারদিকে ভেঙে পড়বে। সকলেই তাহলে চাপা পড়ে মরতে পারে।

গাছপালা পেরিয়ে আবার সমতল। এবার অবশ্য যত্রতত্র কচি সবুজ

---

* ইউফোর্বিয়া ক্যান্ডেলেব্রাম — ইউরোপীয় ইউফোর্বিয়া গোষ্ঠীজাত এক ধরনের গাছ। বাইরে থেকে ফণিমনসার মতো দেখতে।

ঘাসে ঢাকা ঢিবি ছড়ান। ঢিবির মাথায় পেঁছে যাত্রীরা হঠাৎ দেখল সামনে পড়ে আছে বিস্তৃত চষা ক্ষেত, একেবারে উঁচু গাছের ঘন বনের ধার ঘেঁষে। বনের অনেক ভিতরে, খোলা জায়গায় একটা টিলা। তার গায়ে চোঙার মতো চালাওয়ালা অনেকগুলো কুঁড়েঘর। টিলার চারপাশে লম্বা খোঁটার বেড়া। মোটা মোটা অসমান কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী তোরণ যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার উপর থেকে অলংকরণ হিসাবে ঝুলছে সিংহের খুলির মালা।

দীর্ঘকায় কঠোর চেহারার একদল যোদ্ধা তোরণ পেরিয়ে এগিয়ে এল ছাড়া পাওয়া ক্রীতদাসদের দিকে। তারা তখন ধীরে ধীরে টিলায় উঠছে। স্থানীয় লোকেদের চেহারা অনেকটা নুবীয়দের মতোই, কেবল গায়ের রংটা একটু ফিকে তামাটে।

হাতে তাদের সরু তলোয়ারের মতো বিরাট ফলা লাগান বর্শা আর কালো সাদায় আঁকা বড় বড় ঢাল। জিরাফের চামড়ার বন্ধনী থেকে ঝুলে আছে আবলুস্ কাঠের গদা।

পাহাড়ের মাথা থেকে চারদিকটা ছবির মতো দেখতে। সমতলের সোনালি ঘাসের বুকে জেগে উঠেছে নদীতীরের তাজা পান্না-সবুজ গাছপালা। মাঝখানে চমকে উঠছে সরু নদীর নীল জল। মাথায় ফোলা গোলাপী বল বসান ঝোপগুলো অল্প অল্প কাঁপছে। গাছের ডাল থেকে ঝুলে আছে হলদে আর সাদা ফুলের গুচ্ছ।

স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আগন্তুকদের প্রাথমিক আলাপে অনেকটা সময় গেল। ভাঙা-পা নিগ্রোটি আগেই বলেছিল সে এই জাতেরই লোক। দোভাষীর কাজ সেই করল। ইশারায় অন্যদের সঙ্গে আসতে বারণ করে লাঠিতে ভর দিয়ে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে যোদ্ধাদের কাছে এগিয়ে গেল।

কাভি, ভাঙা-পা নিগ্রো, কিদগো, একজন নুবীয় আর যাযাবর পথপ্রদর্শকদের একজনকে তোরণ পেরিয়ে সর্দারের বাড়িতে যাবার অনুমতি দেওয়া হল।

তোরণের বাইরে যারা রইল তারা অনিশ্চিত অবস্থায় অধীর হয়ে উঠল। পান্দিওন কেবল চুপচাপ, সবকিছুতে নিস্পৃহ বীতরাগ ভাব

করে গাধার পিঠ থেকে নামান খাটিয়ায় শুয়ে। অবশেষে যেন এক যুগ পরে কাভি একদঙ্গল লোক জন ছেলেমেয়ে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আবার তোরণের কাছে দেখা দিল। গ্রামবাসীরা তখন বড় বড় পাতা দুলিয়ে অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে হাসছে আর কী যেন বলছে। ভাষাটা দুর্বোধ্য, কিন্তু তাতে বন্ধুত্বের সুর ফুটে উঠেছে।

তোরণ খুলে গেল। যাত্রীরা ভিতরে ঢুকল। পথের দুপাশে গোল মাটির দেয়াল বড় বড় বাড়ি। রুক্ষ লম্বা ঘাসে ছাওয়া সরু চোঙার মতো খাড়া চাল।

খোলা জায়গায় দুটো গাছের নিচে দাঁড়িয়ে একটা খুব বড় বাড়ি। তার চালাটা একেবারে প্রবেশদ্বার পর্যন্ত বাড়ান। সর্দাররা সবাই আগন্তুকদের সঙ্গে দেখা করার জন্য এই বাড়িতেই জমায়েৎ হয়েছে। এমন একটা অসাধারণ ঘটনায় উত্তেজিত গ্রামবাসীরা প্রায় সবাই আগন্তুকদের ঘিরে ভীড় করে দাঁড়িয়ে।

প্রধান সর্দারের অনুরোধে ভাঙা-পা নিগ্রোকে আবার সেই ভীষণ গণ্ডার শিকারের গল্প বলতে হল। গল্প বলতে বলতে সে বার বার খাটিয়ায় চুপ করে শুয়ে থাকা পান্দিওনকে দেখিয়ে দিল।

তা-কেমের ফারাওয়ের আদেশে সংঘটিত এরকম একটা অবিশ্বাস্য কাজের বর্ণনা শুনে গ্রামবাসীরা নানা রকম চিৎকার করে তাদের আনন্দ বিস্ময় আর আতঙ্ক প্রকাশ করতে লাগল।

প্রধান সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে গ্রামবাসীদের উদ্দেশে নিজের ভাষায় কী যেন বলল। গ্রামবাসীরা তাতে সমস্বরে সম্মতি জানাল। তারপর অপেক্ষারত যাত্রীদের কাছে এসে সর্দার হাত ঘুরিয়ে সারা গ্রামটা দেখিয়ে মাথা নোয়াল।

দোভাষীর সহায়তায় কাভি সর্দার আর গ্রামবাসীদের আতিথেয়তায় ধন্যবাদ জানাল। সন্ধ্যাবেলা যাত্রীদের সম্মানার্থে এক ভোজে তাদের নিমন্ত্রণ করা হল।

একদল গ্রামবাসী পান্দিওনের খাটিয়ার চারপাশে ভীড় করে দাঁড়াল। পুরুষদের চোখে ফুটে উঠেছে পান্দিওনের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব, মেয়েদের

চোখে দরদ। নীল জোব্বায় গা ঢাকা একটি মেয়ে বেশ সাহসভরে ভীড় ছেড়ে বেরিয়ে এসে তরুণ গ্রীকটির উপর ঝুঁকে পড়ল। এতদিন ধরে তা-কেম আর নুবের রোদে-ভরা গরম রাজ্যে যাত্রার ফলে পান্দিওনের রংও তার সঙ্গীদের মতোই হয়ে উঠেছে। কেবল একটু ফিকে সোনালি এইটুকুই যা তফাৎ। চুলগুলো অবশ্য তার খুবই বেড়ে গেছে। সেই জটপড়া কোঁকড়ান চুল আর রোগা নিখুঁৎ মুখাবয়ব দেখে বোঝা যায় সে বিদেশী।

খাটিয়ার উপর শুয়ে থাকা সুদর্শন অসহায় তরুণ বীরটিকে দেখে মেয়েটির বড় মায়া হল। সাবধানে হাত বাড়িয়ে সে পান্দিওনের কপালের উপর থেকে এক গোছা চুল সরিয়ে দিল।

ভারী চোখের পাতা ধীরে ধীরে খুলে গিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ল অদ্ভুতরকম সোনালি চোখদুটি। মেয়েটি একটু শিউরে উঠল, অমন চোখ সে কখনো দেখেনি। কিন্তু বিদেশী তাকে দেখতে পেল না। তার নিষ্প্রভ চোখদুটো মাথার উপরে দুলে ওঠা গাছের ডালের দিকে নিস্পৃহভাবে নিবদ্ধ।

'ইরুমা!' মেয়েটির বান্ধবীরা তাকে ডাকল।

কাভি আর কিদগো এসে আহত বন্ধুকে খাটিয়াশুদ্ধ তুলে নিয়ে চলল। মেয়েটি কিন্তু তখনো দাঁড়িয়ে। চোখদুটি নামান। তার মন কেড়ে নেওয়া তরুণ গ্রীকটির মতোই সে তখন নিশ্চল নিস্পন্দ।

অন্ধকার পথ

কিদগো আর কাভির সেবাযত্নে পান্দিওনের ভাঙা হাড় জোড়া লাগল। কিন্তু আগেকার বল সে আর ফিরে পেল না। নিরুৎসাহ মনমরা হয়ে সে দিনের পর দিন বড় বাড়ির আধ-অন্ধকারে চুপ করে বিছানায় পড়ে থাকে। বন্ধুদের ডাকে 'হু' 'হাঁ' করে সাড়া দেয় নেহাৎ অনিচ্ছা ভরে। খাওয়ায় তার কোন আগ্রহ নেই। বিছানা ছেড়ে একবারও ওঠার চেষ্টা করেনি।

খুবই রোগা হয়ে গেছে, গাল বসে যাওয়া মুখে অল্প নরম দাড়ি, চোখদুটো অধিকাংশ সময়ই বন্ধ।

ওদিকে সময় এসে গেল। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে পেঁছতে হবে সমুদ্রে। তারপর বাড়ি। স্থানীয় লোকদের কিদগো অনেকবার সবিস্তারে জিজ্ঞেস করেছে 'দক্ষিণ শিঙের' সমুদ্রতীরে কী করে যেতে হয়।

যে উনচল্লিশ জন একসঙ্গে গ্রামে এসেছিল তাদের মধ্যে বারজন বাড়ির পথে নানা দিকে চলে গেছে। এককালে তারা এই দেশেরই বাসিন্দা ছিল, তাই বাড়ি পেঁছতে তাদের তেমন কষ্ট বা বিপদ আপদ হবার সম্ভাবনা নেই।

বাকিরা কিদগোকে তাড়া দিতে লাগল বেরিয়ে পড়ার জন্য। সবাই তখন মুক্ত সুস্থ সবল। তাই দূর বাড়ির ডাক আরো জোরাল হয়ে উঠেছে। প্রতি দিনের নিষ্ক্রিয়তা তাদের কাছে অপরাধের মতো মনে হচ্ছে। বাড়ি ফেরার ব্যাপারটা কিদগোর উপর নির্ভর করে বলে থেকে থেকে সবাই তাকে অনুরোধ করতে লাগল, তাগাদা দিতে থাকল।

কিদগো "আজ যাচ্ছি, কাল যাচ্ছি" করে কোন রকমে সবাইকে বুঝ দেয়, কারণ পান্দিওনকে ছেড়ে সে তখন কিছুতেই বেরতে পারে না। জাতের অন্যদের সঙ্গে আলাপের পর নিগ্রোটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধুর পাশে বসে বসে ভাবে — কবে এই রুগ্ন লোকটির অবস্থা ভালর দিকে ফিরবে? কাভির পরামর্শে পান্দিওনকে রোজ গরম কমলে পর বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাতেও বিশেষ কোন উন্নতি দেখা গেল না। কেবল বৃষ্টি হলে পান্দিওন একটু উৎসাহিত বোধ করে — মেঘের গর্জন আর মুষলধারে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ শুনে সে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঠে কান খাড়া করে শুনতে থাকে, মেঘ গর্জনে আর বৃষ্টির শব্দে সে যেন বিশেষ একটা ডাক শুনতে পায়; অন্যদের কানে সে ডাক ধরা পড়ে না। কাভি গ্রাম থেকে দুজন বদ্যিকে ডেকে আনে। তারা পান্দিওনের উপরে ঘাস ধরে আগুন জ্বালায়, ঝাঁঝাল ধোঁয়ায় সে ঢাকা পড়ে যায়। একজাতের শিকড়বাকড়শুদ্ধ একটা ঘটি তারা মাটিতে পুঁতে দেয়। কিন্তু তবু কোন উন্নতি দেখা যায় না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা পান্দিওন তার কুঁড়েঘরের কাছে শুয়ে আছে। কাভি পাশে বসে অলস ভঙ্গীতে একটা পাতাওয়ালা ডাল নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে, এমন সময় নীল জোব্বা পরা একটি মেয়ে এল। ইরুমা। গ্রামের সবচেয়ে ভাল শিকারীর মেয়ে সে। গ্রামে পৌঁছবার দিনে এই মেয়েটির মনই পান্দিওন কেড়ে নিয়েছিল।

জোব্বার ভিতর থেকে চুড়ির টুংটাং আওয়াজ তুলে মেয়েটি তার একটি নরম কমনীয় হাত বাড়িয়ে দিল। হাতে বেণীর মতো করে বাঁধা একটা ছোট্ট থলে। থলেটা ইরুমা এগিয়ে দিল কাভির দিকে। বলল, এ হচ্ছে পশ্চিম বন থেকে তুলে আনা মন্ত্রপূত বাদাম, রোগীর পক্ষে খুব ভাল — কাভি এতদিনে এ অঞ্চলের দুএকটা শব্দ শিখে নিয়েছে। বাদামগুলো দিয়ে কী ভাবে ওষুধ তৈরী করতে হবে সেকথাও ইরুমা বোঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু কাভি বুঝতে পারল না। কী করবে ভেবে না পেয়ে ইরুমা একটু ধাঁধায় পড়ে মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল। এক মুহূর্ত পর আবার উৎসাহিত হয়ে উঠে কাভির কাছে বাদামগুলো থেঁৎলানর জন্য একটা চ্যাপ্টা পাথর চেয়ে নিল আর এক পাত্র জল। কাভি বিড়বিড় করে ঘরের ভিতর ঢুকে যেতে মেয়েটি চারদিকটা দেখে নিয়ে রোগীর মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ছোট্ট হাতটা একবার পান্দিওনের কপালে রাখল, কিন্তু কাভির ভারী পায়ের শব্দে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল।

চেস্টনাটের মতো কতগুলো বাদাম থলে থেকে বের করে ভেঙে মেয়েটি পাথর দিয়ে শাঁসটা ঘষে ঘষে পাৎলা পায়েসের মতো একটা জিনিস বানিয়ে কিদগোর কাছ থেকে একটু দুধ নিয়ে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিল। কিদগো সবে দুধ এনেছিল, বাদামগুলো দেখেই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে কাভির চারপাশে ঘুরে নাচ জুড়ে দিল।

বিস্মিত কাভিকে কিদগো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। পশ্চিমের বনে আর তার দেশের বনে একধরনের গাছ আছে, তাদের গুঁড়ি সোজা, ডালগুলো উপরের দিকে ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে, তাই গাছগুলোকে ছুঁচলো দেখায়। এই গাছে প্রচুর বাদাম হয়, সেই বাদামগুলো খুব ভাল

ওষুধের কাজ করে, দুর্বল ক্লান্ত লোকের পক্ষে খুবই বলকারী। সুস্থ সবল যারা তারাও এই বাদাম খেয়ে বেশ ফুর্তি অনুভব করে।*

মন্ত্রপূত বাদামের সেই পায়েস মেয়েটি পান্দিওনকে খাইয়ে দিল। তারপর তিনজনে তার পাশে বসে ওষুধের ফলের জন্য অপেক্ষা করে রইল ধৈর্য ধরে। কয়েক মিনিট পর পান্দিওনের ক্ষীণ নিঃশ্বাস আরো জোরাল আর নিয়মিত হয়ে উঠল। ভাঙা গালে দেখা দিল গোলাপী আভা। কাভির সব বিষণ্ণতা হঠাৎ দূর হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে বসে বসে সেই রহস্যজনক ওষুধের ক্রিয়া দেখতে লাগল। অবশেষে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তরুণ গ্রীকটি চোখ মেলে উঠে বসল।

তার সূর্যরঙা চোখদুটো কাভি আর কিদগোর উপর বুলিয়ে নিয়ে ইরুমার মুখে স্থির হল। ঘন তামাটে রং মুখ, কী অপূর্ব মসৃণ সজীব ত্বক — পান্দিওন অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

চোখদুটির নিচের দিকে একটু টানা, ভিতরের কোণ থেকে নাকের হাড় পর্যন্ত দুষ্টুমি ভরা ছোট ছোট ভাঁজ। আধবোজা পাতার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে চোখের সাদার স্বচ্ছ উজ্জ্বলতা। চওড়া কিন্তু সুগঠিত নাকের ফুটো অল্প অল্প কাঁপছে। পুরু স্পষ্ট ঠোঁটদুটি সরল সলজ্জ হাসিতে ফাঁক হয়ে গেছে। বেরিয়ে পড়েছে মুক্তার মতো শক্ত দাঁতের পাটি। গোল মুখের সমস্তটায় এমন একটা নির্ভয় অথচ নম্র দুষ্টুমির ভাব, সেইসঙ্গে যৌবনের আনন্দচঞ্চল লীলা যে তা দেখে পান্দিওনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই তার নিষ্প্রভ নিরুৎসাহ সোনালি চোখে দেখা দিল আলো। ইরুমা অপ্রস্তুত বোধ করে চোখ নামিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বিস্মিত কিদগো আর কাভি তো আনন্দে আত্মহারা। গণ্ডারের সঙ্গে লড়াইয়ের সেই ভীষণ দিনের পর এই প্রথম পান্দিওনের মুখে হাসি দেখা গেল। অত্যাশ্চর্য বাদামের শক্তি সম্বন্ধে আর এতটুকুও সন্দেহ রইল না। পান্দিওন উঠে বসে সে আহত হবার পর থেকে কী কী ঘটেছে সব

* কোলা বাদাম। এখন সারা পৃথিবীতেই ভেষজগুণের জন্য পরিচিত।

জিজ্ঞেস করতে লাগল। হড়বড় হড়বড় করে নানারকম প্রশ্ন করে মাতালের মতো সে কিদগো আর কাভির কথায় বাধা দিয়ে চলল।

ইরুমা তাড়াতাড়ি চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল সন্ধ্যাবেলার দিকে এসে খোঁজ নিয়ে যাবে পান্দিওন কেমন থাকে। সেদিন পান্দিওন প্রচুর পরিতৃপ্তির সঙ্গে বেশ ভাল করেই খেল। বার বার তার সঙ্গীদের নানারকম প্রশ্ন করতে থাকল। সন্ধ্যার দিকে ওষুধের জোর ফুরিয়ে আসতে পান্দিওন আবার আগের মতো নিস্পৃহ আচ্ছন্ন অবস্থায় শুয়ে পড়ল।

পান্দিওন তখন ঘরের ভিতর শুয়ে। কাভি আর কিদগো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে চলেছে তাকে আরেকটু মন্ত্রপূত বাদাম খাওয়ান উচিত হবে কিনা। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ইরুমাকে একবার এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা দরকার।

ইরুমা এল তার বাবার সঙ্গে। দীর্ঘকায় খেলোয়াড়সুলভ চেহারা বাপের। কাঁধে আর বুকে ক্ষতের চিহ্ন। সিংহের থাবার দাগ। বাপ আর মেয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে কী যেন কথাবার্তা হল। শিকারী রেগে কয়েকবার মাথা নেড়ে মেয়েকে তাচ্ছিল্যের ভাবে সরিয়ে দিল। তারপর উচ্চস্বরে হেসে উঠে ইরুমার পিঠ চাপড়ে দিল। ইরুমা বিরক্ত হয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিদগো আর কাভির দিকে এগিয়ে গেল।

'বাবা বলছেন, ওকে বেশি বাদাম খাওয়ান উচিত হবে না,' কিদগোকে সে বলল, — তার মতে কিদগোই পান্দিওনের সবচেয়ে বড় বন্ধু। 'কেবল দুপুরবেলা একবার দেবে ও যাতে ভাল করে খাবার খায় ...'

কিদগো বলল বাদামের প্রভাবের কথা সেও জানে, ইরুমার কথামতই সব কিছু করা হবে।

ইরুমার বাবা রোগীর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে মেয়েকে কী যেন বলল। কিদগো আর কাভি কিছুই বুঝতে পারল না, কিন্তু সেকথা শুনেই ইরুমার চোখদুটো রাগী বেড়ালের মতো জ্বলে উঠল। উপরের ঠোঁট একটু বেঁকে গিয়ে দেখা দিল সাদা দাঁত। শিকারী সদয়ভাবে হেসে হাত নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পান্দিওনের উপর ঝুঁকে পড়ে মেয়েটি

অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে ছুটে গেল।

'আসছে কাল এদেশের আচার অনুসারে আমি নিজেই ওর চিকিৎসা করব,' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ইরুমা দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করল। 'আমাদের মেয়েরা প্রাচীন কাল থেকে এই উপায়ে অসুস্থ আহত লোকদের রোগ সারিয়ে আসছে। তোমাদের বন্ধু মনের আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে — সেটা না থাকলে কোন মানুষ বাঁচতে চায় না। সে আনন্দ ফিরিয়ে আনতেই হবে!'

কিদগো ভেবে দেখল কথাটা ঠিক। এত দুঃখ কষ্টের ফলে পান্দিওন জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েছে। তার মনের ভিতরে কোথায় যেন একটা ভাঙন ধরেছে। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও কিদগো কিছুতেই বুঝতে পারল না কী ধরনের চিকিৎসার কথা মেয়েটি বলছে। শেষকালে ও নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন আবার পান্দিওনকে বাদামের পায়েস খাওয়ান হলে পর পান্দিওন ফের উঠে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। ভাল করে খেল, বন্ধুরা দেখে খুসি। পান্দিওন এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত আগের দিনের মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করল। তা শুনে খুশিতে মুখভঙ্গি করে কাভির দিকে চোখ ঠারল কিদগো। তারপর হেসে পান্দিওনকে সাবধান করে দিয়ে বলল, সন্ধ্যাবেলা মেয়েটি এক অজানা প্রক্রিয়ায় তার চিকিৎসা করবে। পান্দিওন প্রথমে উৎসুক হয়ে উঠলেও ওষুধের ঘোর কেটে যেতেই আবার নিরুৎসাহ হয়ে গেল। কাভি আর কিদগোর তবু মনে হল, এই দুদিনে রোগীর চেহারা অনেক ভালো হয়েছে। নিঃশ্বাসের জোর বেড়েছে, বিছানায় নড়াচড়াও করে বেশি।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতি দিনের মতো সেদিনও পোড়া ডালের ঝাঁঝাল গন্ধে গ্রাম ভরে গেল। চারদিকে ধ্বনিত হল মেয়েদের হাতে প্রকাণ্ড পাথরের হামানদিস্তা, রাতের খাবারের জন্য জোয়ার ভাঙা হচ্ছে। দুধ আর মাখন সহযোগে জোয়ারের কালো পরিজ হচ্ছে গ্রামবাসীদের প্রধান আহার।

ক্ষণস্থায়ী গোধূলি দেখতে দেখতে পরিণত হল রাতে। হঠাৎ মাদলের একঘেয়ে আওয়াজ বেজে উঠল গ্রামে। একদল তরুণ তরুণী হৈচৈ করতে করতে পান্দিওনদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সবার সামনে মশালধারী চারটি মেয়ে। ঘিরে রয়েছে কালো বড় জোব্বা পরা দুই বুড়িকে, তারা কালের ভারে একেবারে কুঁজো হয়ে পড়েছে। ছেলেরা পান্দিওনকে তুলে নিয়ে জনতার তারস্বর চীৎকারের মধ্যে দিয়ে চলে গেল গ্রামের অপর প্রান্তে, বনের ফাঁকা ধারটার কাছে।

কাভি আর কিদগোও সঙ্গে সঙ্গে চলল। কাভি অবশ্য আপত্তির ভাব করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, যেন বলতে চায় এসবে কিছু ফয়দা হবে না।

অন্তত হাত ত্রিশেক লম্বা একটা বড় বাড়িতে পান্দিওনকে নিয়ে যাওয়া হল। ঠিক মাঝখানের খুঁটির কাছে তাকে শোয়ান হল, চওড়া দরজার দিকে পিছন করে। তালের তেলে ভেজান নরম কাঠের কতগুলো মশাল খুঁটির গায়ে বাঁধা। তার ফলে ঘরের মাঝখানে উজ্জ্বল আলোর চক্কর পড়েছে। চালের নিচু কানাতের আড়ালে দেয়ালগুলো অন্ধকারে ঢাকা। ঘরভর্তি মেয়ে। তরুণী আর বৃদ্ধা দুইই। দেয়াল জুড়ে বসে তারা দ্রুতগতিতে অনর্গল কথা বলে চলেছে। এক বুড়ি পান্দিওনকে ঘন রঙের কী একটা তরল জিনিস খেতে দিল। সেটা খেয়েই পান্দিওন চাঙা হয়ে উঠল।

একটা ফাঁপা হাতির দাঁত থেকে বেরল কাঁপা কাঁপা তীব্র আওয়াজ। সারা বাড়ি চুপ হয়ে গেল। পুরুষরা সবাই তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেল। কাভি আর কিদগো থেকে যাবার তাল করছিল কিন্তু কোন ভদ্রতা না করে তাদের সোজাসুজি বাইরের অন্ধকারে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়া হল। দরজাটা আড়াল করে দাঁড়াল একদল কুৎসিত স্ত্রীলোক, তাদের তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, কৌতূহলীরা যাতে ভিতরে কী হচ্ছে তা দেখতে না পায়। কাভি বাড়ির কাছেই বসে রইল। এই রহস্যময় ব্যাপারটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে কিছুতেই নড়বে না। কিদগো দাঁত বের করে হাসতে হাসতে

তার সঙ্গে যোগ দিল — দক্ষিণের লোকেদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে তার বিশ্বাস।

দুজন মেয়ে সযত্নে পান্দিওনকে তুলে ধরে মাঝের খুঁটিটার গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল। পান্দিওন চারদিকে বিস্মিত চোখে তাকাতে লাগল, প্রায়ান্ধকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কেবল চারদিকে হাসিমুখ মেয়েদের শ্বেতশুভ্র দাঁত আর চোখের সাদা। ঘরের ভিতরে ঝোলান ছোট ছোট সুগন্ধ গাছগাছড়ার ডাল। ভিতরের কার্ণিস থেকে ঝুলে রয়েছে মোটা মালা। সেই একই ঝোপের পাৎলা ডাল বেঁধে দেওয়া হয়েছে মাঝের খুঁটিটার চারপাশে। সারা বাড়ি ভরে গেছে এক তীব্র উত্তেজক গন্ধে। পান্দিওন সে গন্ধে একটু বিচলিত আর ভীত হয়ে পড়ল। কিছু একটা তার মনে পড়তে লাগল যা অত্যন্ত কাছের আর লোভনীয় কিন্তু সেই সঙ্গেই সম্পূর্ণ বিস্মৃত।

কয়েকটি মেয়ে পান্দিওনের সামনে এসে দাঁড়াল। ফাঁপা হাতির দাঁতের তৈরী দুটো শিঙার বাঁকা রেখা ফুটে উঠল মশালের আলোয়। শিঙার পাশেই ফাঁপা গাছের গুঁড়িতে তৈরী কতগুলো কালো পেটমোটা মাদল।

আবার শোনা গেল শিঙার কম্পিত স্বর। বুড়িরা এসে পান্দিওনের সামনে রেখে গেল স্থূল হাতে অথচ দৃঢ় রেখায় খোদাই করা কাঠের এক নারী মূর্তি। মূর্তিটা কালের প্রলেপে কালো হয়ে উঠেছে।

মেয়েরা চড়া গলায় নরম সুরের গান ধরল — দুঃখ ভরা দীর্ঘনিঃশ্বাস আর গলার ভিতর থেকে উৎসারিত স্বরের ধীর মন্থর ওঠানামা ক্রমশ দ্রুত আর জোরাল হয়ে অতি জলদে অনেক চড়ায় উঠে গেল। হঠাৎ গুরুগম্ভীর স্বরে মাদল বেজে উঠতে পান্দিওন চমকে উঠল। গান থামল। আলোক চক্রের এক ধারে এসে দাঁড়াল নীল জোব্বা পরা একটি মেয়ে। পান্দিওন তাকে চেনে। চক্রের মাঝখানে এসে সে যেন সংকোচে দ্বিধায় থেমে গেল। আবার শিঙা বেজে উঠল। তার তীব্র গোঙানির সঙ্গে মিশেছে কয়েকটি বৃদ্ধার চীৎকার। মেয়েটি জোব্বা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সম্পূর্ণ নগ্ন, গায়ে কেবল সেই সুগন্ধী ডালের বন্ধনী।

তার গায়ের ঘন তামাটে রঙের উপর মশালের আলোর নিষ্প্রভ চমক। চোখে মোটা করে কাজল পরা। হাতে আর পায়ে চকচকে তামার চুড়ি। ঘন কোঁকড়ান চুল মসৃণ কাঁধের উপর খুলে পড়েছে।

মাদল তখন ছন্দে ছন্দে চাপাস্বরে বেজে চলেছে। তালে তালে আলতোভাবে পা ফেলে মেয়েটি পান্দিওনের কাছে এগিয়ে এল। বন্য জন্তুর মতো তার কমনীয় দীঘল শরীর দুলিয়ে এক তীব্র ও ক্লান্তি-আনা কামনার আবেগে সে দুহাত বাড়িয়ে প্রণাম জানাল সেই অজ্ঞাত দেবীমূর্তিকে। পান্দিওন মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল ইরুমার প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালন। ইরুমার মুখে দুষ্টুমির কোন ছাপ নেই। গম্ভীর কঠোর, তোলা ভুরুদুটো কুঁচকন। সে যেন তার নিজের হৃদয়ের ভাষা শুনছে। পান্দিওনের দিকে বাড়ানো হাতদুটোর উপর টানা মাংসপেশীর তরঙ্গ উঠছে। তারা ছুটে চলেছে মসৃণ কাঁধ থেকে পান্দিওনের মুখের সামনে আন্দোলিত আঙ্গুলের ডগায়। তার দেহের প্রতিটি অংশ যেন সাবেগে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। পান্দিওনের কাছে এ জিনিস সম্পূর্ণ নতুন — ইরুমার উত্তোলিত মুখে উৎসারিত হয়ে উঠেছে প্রাণঢালা প্রেরণা, সেই সঙ্গে মিশেছে তার হাতের রহস্যময় সপ্রাণতা।

হাতির দাঁতের শিঙাগুলো তখনো পাগলের মতো বেজে চলেছে। হঠাৎ একটা তীব্র শব্দে পান্দিওনের শ্বাসরুদ্ধ হল — কতগুলো তামার পাত একটা আরেকটার গায়ে লেগে এক প্রচণ্ড বিজয় উল্লাস সৃষ্টি করেছে। তাতে ডুবে গেছে মাদলের ভাঙা ছন্দ।

হঠাৎ ধনুকের মতো পিছন দিকে বেঁকে গেল ইরুমা। তারপর সেই মসৃণ মেঝের উপর ধীরে ধীরে নাচতে সুরু করল তার ছোট ছোট পাদুটো। আলোক চক্রের মধ্যে নর্তকী সলজ্জ সংকোচের ভঙ্গীতে ঘুরতে লাগল।

মশালের উজ্জ্বল আলোয় মনে হল মেয়েটি যেন কালো ধাতুর তৈরী। অন্ধকারের মধ্যে যখন সরে গেল তখন মনে হল যেন একটা হাল্‌কা প্রায় অদৃশ্য ছায়া নেচে চলেছে।

মাদলের উৎকণ্ঠিত আওয়াজ ক্রমেই জলদে উঠল। তামার পাতগুলো

বাজতে লাগল পাগলের মতো। মন্থর নাচ ক্রমে বাজনার প্রচণ্ড গতির প্রভাবে দ্রুত হয়ে উঠল।

ছিপছিপে লম্বা বলিষ্ঠ পাদুটো তামার পাতের ঝনঝনে গম্ভীর সুরে কখনো একটা আরেকটার সঙ্গে জড়িয়ে গেল, কখনো বা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আবার প্রায় মাটি না ছুঁয়েই ভেসে গেল মেঝের উপর দিয়ে। কাঁধ আর উন্নত বুক রইল স্তব্ধ। মূর্তির দিকে বাড়ান হাতদুটো ধীরে ধীরে লাবণ্যভরে লতার মতো ভঙ্গী করে চলল প্রার্থনায়।

মাদলের একটানা জোর শব্দ শেষ হলে তামার পাতগুলোও থামল। নৈঃশব্দ্যের বুকে জেগে রইল কেবল মাঝে মাঝে বেজে ওঠা শিঙার করুণ ডাক আর ইরুমার চুড়ি আর নূপুরের গুঞ্জন।

ইরুমার মাংসপেশীর অদ্ভুত আন্দোলনে পান্দিওন মুগ্ধ। তারা কোথাও স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে না থেকে নদীর বুকে জলের মতো বয়ে যায়। ভাস্করের চোখের সামনে ইরুমার শরীরের রেখা সারাক্ষণ অলক্ষ্য পরিবর্তনের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে চলল; তাতে কখনো সমুদ্রের মসৃণ তাল, কখনো বা সোনালি সমতলের দুরন্ত হাওয়ার ছন্দ।

আরম্ভের নরম পেলব প্রার্থনার বদলে এবার দেখা দিল প্রবল আবেগ। পান্দিওনের মনে হল সংগীতের বজ্রধ্বনি ও আলোর ব্রোঞ্জ আভার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে চলেছে নারী সৌন্দর্যের প্রাণের বহ্নিশিখা।

তরুণ গ্রীকটির বুকে আবার জ্বলে উঠল জীবনতৃষ্ণা। আবার ফিরে এল পুরনো স্বপ্ন, পুরনো বাসনা কামনা। চোখের সামনে খুলে গেল বিরাট রহস্যময় জগৎ।

থামল শিঙার আওয়াজ। মাদলের চাপা ভয়াবহ আওয়াজ মিশে গেল মেয়েদের তীক্ষ্ম চীৎকারে। কাছেই বজ্রপাতের মতো বেজে উঠল তামার পাতগুলো। তারপর হঠাৎ সব চুপ। পান্দিওনের কানে বাজতে থাকল তার নিজের হৃৎস্পন্দন।

ইরুমা ভীষণ জোর পাক খেল। তারপর হঠাৎ থেমে গেল, তার টান করা ছিপছিপে শরীর তারের মতো কাঁপছে। হাতদুটো দুপাশে

অসহায়ভাবে ঝুলে পড়েছে। অবসাদে নতজানু হয়ে সে বসে পড়ল, চোখের আলো তার নিভে গেছে। আর্ত চীৎকার করে সে লুটিয়ে পড়ল দেবী মূর্তির সামনে, শুয়ে রইল অনড়, কেবল বুক দ্রুত নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠা নামা করে চলেছে।

সেই তাণ্ডবনৃত্য হঠাৎ ভেঙে পড়ল করুণ চীৎকারে। বিস্মিত পান্দিওন শিউরে উঠল।

প্রশংসাধ্বনিতে ভরে গেল সারা বাড়ি।

চারজন মেয়ে ফিসফিস করে কী বলতে বলতে ইরুমাকে তুলে আলোক চক্রের বাইরে নিয়ে গেল। প্রাচীন কাঠের মূর্তিটিও সঙ্গে সঙ্গে হল অপসারিত। মেয়েরা সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রত্যেকের চোখ তখন জ্বল জ্বল করছে। সবাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী সব বলতে বলতে আগন্তুকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগল। দরজার পাহারায় যে বুড়িরা ছিল তারা কিদগো আর কাভিকে রাস্তা ছেড়ে দিল। তারা ছুটে গিয়ে পান্দিওনকে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগল। কিন্তু পান্দিওনের তখন কথা বলার শক্তি বা ইচ্ছা কোনটাই নেই। দুই বন্ধু তাকে বাড়ি নিয়ে গেল। সেই অসাধারণ নাচের ঘোরে পান্দিওন তখন আচ্ছন্ন। অনেকক্ষণ তার ঘুম এল না, সে চুপ করে শুয়ে রইল।

পান্দিওন সেরে উঠতে লাগল, তার তরুণ শরীরে আশ্চর্যরকম তাড়াতাড়ি ফিরে এল পুরনো শক্তি।

তিন দিন পরে সে কারো সাহায্য না নিয়েই শিকারীর বাড়িতে গিয়ে পেঁছিল ইরুমাকে দেখার ইচ্ছায়। ইরুমা তখন বাড়িতে ছিল না। কিন্তু তার বাবা তাকে বেশ আদর করে বসিয়ে ভাল. বীয়র খেতে দিল। তারপর হাত নেড়ে পান্দিওনের বুক পিঠ চাপড়ে কী যেন বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল। পান্দিওন একটা কথাও না বুঝে শিকারীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা অস্পষ্ট বিরক্তির ভাব নিয়ে।

পান্দিওনের পুনর্জন্ম তখনো সম্পূর্ণ হয়নি: শরীর আরোগ্যের দিকে, কিন্তু মনের ভাব তখনো যায়নি।

সে নিজেই বুঝল এত দিনের দুঃখ কষ্টে সে ভেঙে পড়েছে। গণ্ডারের সঙ্গে লড়াইয়ে যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, তা তার সহ্যের অতীত। ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে অনেক সময় লেগেছে। কিন্তু তাকে পুরোপুরি সেরে উঠতেই হবে। প্রস্তুত হতে হবে বাড়ির পথের সংগ্রামের জন্য। প্রাণপণ চেষ্টায় সে আগেকার মতো তার সঙ্গীদের সমকক্ষ হবার জন্য ব্যায়াম সুরু করে দিল।

পান্দিওন সেরে ওঠায় ভারী খুসী কিদগো আর কাভি দলের অন্যদের নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে জিরাফ শিকারে বেরিয়ে পড়ল। তাদের আশা শিকারে গিয়ে পথের সন্ধান করা যাবে, সেই সঙ্গে অতিথিবৎসল গ্রামবাসীদের জন্য কিছু মাংসের সংস্থান।

পান্দিওন তার মাংসপেশী শক্ত করে তোলার জন্য লেগে গেল বীয়র তৈরীর শস্য পেষার কাজে। তাই নিয়ে প্রতিবেশীদের কী হাসি ঠাট্টা। তারা ব্যাপারটায় খুবই মজা পেল। পুরুষরা অনেকেই মেয়েদের কাজে হাত লাগানর জন্য পান্দিওনকে বিদ্রূপ করতে লাগল, কিন্তু পান্দিওন তাতে কান দেয় না। কিছু দিন পরেই মিশরী বর্শা নিয়ে পান্দিওন গ্রাম ছেড়ে বেরতে সুরু করল। সমতলে গিয়ে সে বর্শা ছোঁড়া আর দৌড়ন অভ্যাস করে। এইভাবে প্রতিদিনই তার পেশী শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। অক্লান্ত পাদুটোয় শরীরবহনের আগেকার জোর ফিরে আসতে লাগল।

সঙ্গে পান্দিওন গ্রামবাসীদের ভাষা শেখার জন্যও প্রাণপণ চেষ্টা করল। ইরুমাকে মুহূর্তের জন্যও সে ভোলেনি। বারবার সে অপরিচিত অথচ সুরেলা শব্দগুলো আওড়ায়। তার স্মৃতিশক্তি অতি চমৎকার, তাই এক সপ্তাহের মধ্যেই কথা বোঝার মতো ভাষা তার রপ্ত হয়ে গেল।

দুসপ্তাহ হল পান্দিওন ইরুমার দেখা পায়নি। কিন্তু তবু শিকারীর অনুপস্থিতিতে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবার সাহস তার হয়নি, এদেশের নিয়ম কানুন তো সে জানে না। একদিন প্রান্তর থেকে ফেরার

পথে নীল জোব্বা জড়ান একটি নারী মূর্তি দেখে তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পান্দিওন আনন্দে স্মিতমুখে মেয়েটিকে ধরে ফেলল। এতটুকুও ভুল হয়নি, মেয়েটি সত্যিই ইরুমা। ইরুমার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই তরুণ গ্রীকটি উত্তেজিত হয়ে উঠল। বহু কষ্টে অপরিচিত শব্দ গেঁথে পান্দিওন অপ্রতিভ ইরুমাকে ধন্যবাদ জানাতে সুরু করল। কিন্তু একটু পরেই তার ভাষাজ্ঞান গেল ফুরিয়ে। সে তখন উত্তেজনায় নিজের ভাষাতেই কথা বলতে সুরু করল। কিন্তু শীঘ্রই সম্বিত ফিরে পেয়ে বুঝতে পারল তার কথা ইরুমা একবর্ণও বুঝতে পারছে না, তাই বিব্রত হল। ইরুমার মাথার রঙিন রুমালটা তার কাঁধ বরাবর। দুষ্টুমির ভঙ্গীতে ইরুমা আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে উঠল। পান্দিওনও মুচকি হাসল। তারপর বহুদিন আগে শিখে রাখা একটা কথা খুব সাবধানে বলল:

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারি কী?'

'এস,' সরল ভাবে জবাব দিল ইরুমা, 'কাল বনের খোলা জায়গায়। সূর্য যখন বনের সামনে যাবে তখন।'

পান্দিওন আনন্দে কী বলবে ভেবে পেল না। শুধু ইরুমার দিকে হাতদুটো বাড়িয়ে দিল। নীল জোব্বাটা সরে গেল। ইরুমা তার ছোট ছোট বলিষ্ঠ হাতদুটো বিশ্বাসভরে রাখল পান্দিওনের হাতের তেলোয়। পান্দিওন বেশ জোরে অথচ নরম করে হাতদুটো চেপে ধরল। বহু দূরের তেস্‌সার কথা তার আর মনে রইল না। ইরুমার হাতদুটো কেঁপে উঠল, নাক বিস্ফারিত। মৃদুভাবেই কিন্তু বেশ জোর দিয়ে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। জোব্বায় মুখ ঢেকে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমে গেল। পান্দিওন বুঝল মেয়েটির পিছন পিছন যাওয়া উচিত হবে না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে সে দেখল, কুটিরের আড়ালে ইরুমা মিলিয়ে যাচ্ছে। অকারণেই স্মিত হেসে পান্দিওন বর্শাটা নাচাতে নাচাতে পথ ধরে এগোতে সুরু করল।

এই প্রথম পান্দিওনের চোখে পড়ল গ্রামটা বড় সুন্দর জায়গায় দাঁড়িয়ে; সুন্দর আরামদায়ক বাড়ি, রাস্তাগুলোও চওড়া।

আপনা থেকেই পান্দিওন এদেশের লোকেদের সঙ্গে নুব রাজ্য আর ভগবানের আশিসপ্রাপ্ত তা-কেমের গরীব লোকেদের তুলনা সুরু করে দিল। সেখানকার গরীবদের মুখে সর্বদাই বিষাদ আর নির্জীব উদাসীনতার ছাপ। কঠোর পরিশ্রম আর নিরন্তর খাদ্যাভাবের ফলে জরাজীর্ণ শরীরগুলোয় কেমন একটা হীনতার ছাপ। এদেশের লোকেরা অন্য রকম। কেমন এক হাল্কা সহজ স্বাধীন চলার ভঙ্গী। বুড়োদের পর্যন্ত সুন্দর সুঠাম হাবভাব।

মাথায় চিতাবাঘের চামড়ার টুপি পরা এক চওড়া কাঁধ বলিষ্ঠ তরুণ এগিয়ে আসতে পান্দিওনের চিন্তায় ছেদ পড়ল। লোকটি একটু রাগতভাবেই পান্দিওনের দিকে তাকিয়ে বেশ একটা হুকুম দেওয়া গোছ ভঙ্গী করে পান্দিওনের বুক ছুঁল। তরুণ গ্রীকটি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেটিও তার সামনে দাঁড়িয়ে। হাতটা তার কোমরবন্ধের কাছে, সেখানে ঝুলছে একটা চওড়া ছুরি। যুদ্ধং দেহি ভাব করে সে আগন্তুকটির দিকে তাকিয়ে রইল।

'তুমি দেখেছি বেশ ভাল দৌড়তে পার,' অবশেষে ছেলেটি বলে উঠল। 'আমার সঙ্গে দৌড়বে? আমার নাম ফুলবো। সবাই আমায় চিতাবাঘ বলে,' ছেলেটি জুড়ে দিল, যেন তাতেই সবকিছু পান্দিওনের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রীতির হাসি হেসে পান্দিওন বলল, এককালে সে এর চেয়েও ভাল দৌড়তে পারত, অসুখের পর সে আর আগের মতো দৌড়তে পারে না। তা শুনে ফুলবো এমন তীব্র বিদ্রূপ সুরু করে দিল যে, পান্দিওনের রক্ত গরম হয়ে উঠল। ফুলবো যে কেন তার প্রতি এত বিরূপ পান্দিওন তা বুঝে উঠতে পারল না, তবু ঊরুর উপর হাত রেখে তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। ঠিক হল সেদিনই সন্ধ্যাবেলা একটু ঠাণ্ডা পড়লে পর প্রতিযোগিতা সুরু হবে।

গাঁয়ের তরুণরা সবাই, বুড়োদেরও কেউ কেউ, ফুলবো আর বিদেশীর দৌড়ের লড়াই দেখতে টিলার নিচে এসে জমায়েৎ হল।

ফুলবো দেখিয়ে দিল দূরে একলা দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাছ। ওদের কাছ থেকে অন্তত দশ হাজার হাত দূরে। গাছটার কাছে গিয়ে একটা ডাল ছিঁড়ে নিয়ে যে আগে ফিরে আসতে পারবে সেই জয়ী হবে।

হাততালি দিয়ে স্টার্ট দেওয়া হল। পান্দিওন আর ফুলবো ছুটে বেরিয়ে গেল। অধীরতায় উত্তেজিত ফুলবো গোড়া থেকেই লম্বা লম্বা পা ফেলে মুহূর্তের মধ্যে এগিয়ে গেল, যেন নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে মাটির উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। অন্য ছেলেরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাকে উৎসাহ দিতে লাগল।

পান্দিওন তখনো ভাল করে সেরে ওঠেনি। বুঝতে পারল, তার হারার ভয় রয়েছে। কিন্তু সে কিছুতেই হাল ছাড়ল না। বাড়ির কাছে সমুদ্রের সংকীর্ণ সৈকতে সকাল বেলার ঠাণ্ডায় দাদু তাকে যে রকম করে দৌড় করাতেন পান্দিওন সেইভাবেই দৌড়তে সুরু করল। একটু দুলে দুলে, বেশি জোরে না। দম বাঁচিয়ে রাখল সে। ফুলবো দেখতে দেখতে অনেকটা এগিয়ে গেল। পান্দিওন কিন্তু তখনো একই শান্ত দ্রুতভঙ্গীতে ছুটে চলেছে, ফুলবোকে ধরার কোন চেষ্টাই তার নেই। তার বুক ক্রমশ ফুলে উঠে বেশি পরিমাণে হাওয়া টানছে। পাদুটোও আরো জোরে ছুটছে। দর্শকরা তাকে দেখে এতক্ষণ করুণা প্রকাশ করছিল। এখন তারা দেখল পান্দিওন আর ফুলবোর ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে। ফুলবো ঘুরে তাকিয়ে রাগে চীৎকার দিয়ে উঠে আরো জোর দৌড়তে লাগল। গাছের কাছে যখন সে পেঁছিল, পান্দিওন তখনো চারশ হাত দূরে। লাফিয়ে উঠে একটা ডাল ছিঁড়ে নিয়েই সে তক্ষুনি ঘুরে দৌড়তে সুরু করল। গাছের অদূরেই ফুলবো পান্দিওনকে পার হয়ে গেল। পান্দিওন লক্ষ্য করল ফুলবো বেশ হাঁপিয়ে পড়েছে। তার নিজের হৃৎস্পন্দনও তখন বেশ বেড়ে গেছে, কিন্তু তবু সে বুঝল তার জেতার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ গোঁয়ার ফুলবোর দৌড়নর কোন নিয়মকানুনই জানা নেই। পান্দিওন আগের মতোই সমান তালে দৌড়ে চলল। দর্শকরা যখন আর তিন হাজার হাত দূরেও নয়

কেবল তখনই পান্দিওন গতি বাড়াল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফুলবোকে ধরে ফেলল। ফুলবো বিরাট হাঁ-করা মুখ দিয়ে দম নিতে নিতে সামনে লাফিয়ে পড়ে আবার পান্দিওনকে ছাড়িয়ে গেল। পান্দিওন হাল ছাড়ল না। চোখে সে তখন অন্ধকার দেখছে, হৃৎস্পন্দনও ভীষণ বেড়ে গেছে, কিন্তু তবু সে আবার তার প্রতিপক্ষকে ছাড়িয়ে গেল। ফুলবো তখন পাগলের মতো দৌড়চ্ছে, চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। পথ ঠিক করতে না পেরে সে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়েই গেল। কয়েক হাত ছুটে গিয়ে পান্দিওনও থেমে গেল, তারপর ফিরে এল তার প্রতিপক্ষের সাহায্যে। ফুলবো রেগে উঠে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে উঠে দাঁড়াল। তারপর পান্দিওনের দিকে সোজা তাকিয়ে বহুকষ্টে বলে উঠল:

'তুমি — জিতেছ — কিন্তু — সাবধান!.. ইরুমা ...'

মুহূর্তের মধ্যে পান্দিওনের কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। জয়ের আনন্দের সঙ্গে দেখা দিল একটা অস্বস্তি। যা তার নয়, যা তার কাছে নিষিদ্ধ, তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার অস্বস্তিকর অনুভূতি।

ফুলবো বিষণ্ণভাবে মাথা নামিয়ে থপথপ করে হেঁটে চলল, দৌড়বার কোন চেষ্টাই করল না। পান্দিওন ধীরে সুস্থে 'লক্ষ্যে' পৌঁছল। দর্শকরা চেঁচিয়ে উঠে তাকে অভিনন্দন জানাল। কিন্তু সেই অস্বস্তির ভাবটা পান্দিওনের মন থেকে গেল না।

নিজের শূন্য ঘরে পৌঁছে পান্দিওনের মন আবার ইরুমার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। পরের দিন দেখা করার কথা, কিন্তু সে যে অনেক দেরী।

শিকারীরা সেদিন সন্ধ্যায় গাঁয়ে ফিরে এল। পান্দিওনের সঙ্গীরাও ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরল, সঙ্গে নানারকম শিকার আর অভিযানের নানা গল্প। পান্দিওনকে বেশ ভাল দেখে কিদগো আর কাভি তো মহা খুসী। কিদগো ঠাট্টাচ্ছলে পান্দিওনকে কুস্তীতে আহ্বান করল। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল দুজনে দুজনকে পাকড়ে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কাভি তাদের ছাড়াবার জন্য গালাগাল করতে করতে দুজনকে লাথি মেরে চলল।

শিকারীদের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সেদিন ভোজে বন্ধুরা যোগ দিল। বীয়র খেয়ে মত্ত বীররা নিজেদের মধ্যে পাল্লা দিয়ে বড়াই করতে লাগল, শিকারে কে কত বাহাদুরি দেখিয়েছে। পান্দিওন তার সঙ্গীদের কাছ থেকে একটু দূরে বসে আড়চোখে তাকিয়ে রইল মাঠের দিকে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সেখানে নাচছে। তাদের মাঝখানে ইরুমাকে এক নজর দেখাই তার ইচ্ছা।

সর্দারদের একজন একটু টলমলভাব করে উঠে সুন্দর ভঙ্গীতে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাল। পান্দিওন সবকথা বুঝতে পারল না, তবে ভাবটা মোটামুটি ধরতে পারল — নবাগতদের প্রশংসা করে সর্দার বলল তারা শীগ্‌গীরি চলে যাবে বলে সবাই দুঃখিত। সর্দারের প্রস্তাব হচ্ছে আগন্তুকরা এখানেই থেকে যাক, তাদের জাতে তুলে নেওয়া হবে।

অনেকরাত পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া চলল। শিকারীরা পেট ভরে কাঁচ জিরাফের মাংস খেয়ে বীয়রও সব ফুরিয়ে দিতেই ভোজ শেষ হল। বাড়ি ফেরার পথে কিদগো জানাল যাত্রীদের বাকি সাতাশ জনকে নিয়ে পরের দিন একটা সভা হবে। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে। বনে যাযাবর শিকারীদের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ কিদগোর হয়েছে। গাঁয়ের পশ্চিম দিকে যে অঞ্চলটা ছড়িয়ে আছে সে অঞ্চলটা তাদের খুব ভাল করেই জানা। রাস্তাও তারা বাতলে দিয়েছে। সমুদ্রতীর আর কিদগোর বাড়ি দুটোই অনেক দূরে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জেনেছে, আস্তে আস্তে হাঁটলেও তিন মাসের মধ্যে তারা পৌঁছতে পারবে। যুদ্ধে অভিজ্ঞ, বন্ধুত্বে অটল তাদের ঠেকায় কার সাধ্যি? সাতাশজনের একেকজন পাঁচজন যোদ্ধার সমান! কিদগো বুক ফুলিয়ে উত্তেজিত মুখটা আকাশের তারার দিকে তুলে ধরল। তারপর পান্দিওনকে জড়িয়ে ধরে বলল:

‘এবার আমার মন শান্ত হয়েছে। তুমি সেরে গেছ — এখন তবে রওনা হতে হবে। বেরিয়ে পড়ব — যদি চাও তো কালকেই।’

পান্দিওন কোন উত্তর দিল না। এই প্রথম তার ইচ্ছা আর বন্ধুদের আকাঙ্ক্ষায় একটা ফারাক দেখা দিল। কিন্তু ভান করার কৌশল তার জানা নেই।

ইরুমার সঙ্গে সেদিন দেখা হবার পর থেকেই সে বুঝেছে, তার মনের এই গভীর দুঃখের কারণ হল ইরুমার প্রতি তার ভালবাসা। দাসত্বের কঠোর বছরগুলোর পর সে যখন মুক্তির দোরগোড়ায় পা দিয়েছে ঠিক সেই সময়েই ইরুমা তার যৌবনের পূর্ণ সম্ভার নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

এতদিন সে মুক্তির ক্ষীণতম আশায় ভর্ করে কারাগারের অন্ধকূপে পড়ে ছিল, এটা তার পক্ষে কি যথেষ্ট নয়? তার প্রেম তাকে এত করে এই সোনালি প্রান্তরেই থেকে যেতে বলছে। জগৎ আর জীবনের কাছে তার এর বেশি আর কি চাইবার আছে। ইরুমাকে নিয়ে এখানেই চিরকালের জন্য থেকে যাবার যে গোপন বাসনাটা সে নিজের কাছেও লুকিয়ে রেখেছিল, সেটা ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। যৌবনের বিশ্বাসপ্রবণতা তাকে অলক্ষ্যে নিয়ে গেল এক স্বপ্নের দেশে, যেখানে সবকিছুই অত্যন্ত সহজ সরল।

পরের দিন সে ইরুমার সঙ্গে দেখা করে তাকে সব কথা খুলে বলবে... ইরুমা... ইরুমাও তো তাকে ভালবাসে!

গ্রামের অপর প্রান্তেই যাত্রীরা মিলিত হবে বলে ঠিক হল; তারা ঐ দিকেই দুটো বড় বাড়ি নিয়ে থাকে। পান্দিওনের অসুস্থতার জন্য কাভি, কিদগো আর পান্দিওনকে একটা আলাদা ছোট্ট বাড়ি দেওয়া হয়েছিল।

ঘরে এককোণে বসে বর্শায় ধার দিতে দিতে পান্দিওন হঠাৎ উঠে দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

'কোথায় চললে!' কাভি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'সভায় যাবে না?'

'পরে আসব,' পাশ ফিরে কথাটা বলে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল পান্দিওন।

একদৃষ্টে তাকে চেয়ে দেখে কাভি কিদগোর দিকে ঘুরে তাকাল। কিদগো তখন দরজার কাছে বসে বড় চামড়া দিয়ে ঢাল বানানয় ব্যস্ত।

ইরুমা যে বনের খোলা জায়গায় তার জন্য অপেক্ষা করছে সে কথা পান্দিওন তার বন্ধুদের জানায়নি। বন্ধুদের ফিরে আসাটা যে তার নবলব্ধ

প্রেমের পক্ষে ক্ষতিকর সেটা পান্দিওন বুঝতে পেরেছে তাই ইরুমার সঙ্গে না দেখা করার শক্তি তার নেই। নিজেকে সে এই বলে স্তোক দিল যে, সভার ফলাফল সে বন্ধুদের কাছ থেকেই জেনে নেবে।

বনের কাছে এসে পান্দিওন ইরুমাকে খুঁজতে লাগল। ইরুমা হঠাৎ হাসি মুখে একটা গাছের গুঁড়ির কাছ থেকে বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। গায়ে তার বাবার ধূসর নরম বাকলের তৈরী শিকারী জোব্বা, সেই জন্যই গাছের গায়ে তাকে দেখা যাচ্ছিল না। ইশারায় পান্দিওনকে পিছন পিছন আসতে বলে বনের ধার ধরে সে তাড়াতাড়ি চলল। গ্রাম থেকে প্রায় হাজার তিনেক হাত দূরে বন অর্ধবৃত্তাকারে প্রান্তরের ভিতর গিয়েছে। সেখানে এসে ইরুমা বনের ভিতর ঢুকে গেল। এই প্রথম পান্দিওন আফ্রিকার বনে ঢুকছে। তাই কৌতূহলের সঙ্গে চারদিকে তাকাতে লাগল। বনটা সম্বন্ধে পান্দিওনের অন্য রকম ধারণা ছিল — গ্রামটাকে বেড় দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটার উপত্যকায় সরু বনটা ছড়িয়ে আছে, হাজার দুয়েক হাতের বেশি চওড়া হবে না।

বনটা বড় বড় গাছে ভরা। মাথার উপরে তারা এক বিরাট গম্বুজ গড়ে তুলেছে। নদীর বুকের অনন্ত গোধূলিতে অন্ধকার ছায়া ফেলেছে।

বনের আরো গভীরে আরো বড় বড় গাছ। নদীর খাড়া পাড়ে গাছগুলো নিচের দিকে ঝুঁকে গেছে, ডালে ডালে জড়াজড়ি। গাছগুলোর ঋজু উন্নত সুন্দর গুঁড়ি সাদা কালো খয়েরী বাকল নিয়ে বিরাট প্রাসাদের স্তম্ভসারির মতো শখানেক হাত উঁচুতে উঠে গেছে। ডালে ডালে জড়াজড়ি হয়ে পাতার যে গম্বুজ তৈরী হয়েছে, তা ভেদ করে সূর্যের আলোও প্রবেশ করতে পারে না। ধূসর গোধূলি আলো উপর থেকে ঝরে পড়ে দেয়ালের মতো উন্নত অদ্ভুত গাছের শিকড়ের গহ্বরে হারিয়ে গেছে। চারি দিক নিস্তব্ধ, কেবল নদীর জলের ক্ষীণ কলস্বর। সেই সঙ্গে বনের ভিতরের প্রায়ান্ধকার আর বিরাট উঁচু বৃক্ষস্তম্ভ মিলে পান্দিওনকে যেন চেপে ধরল। পান্দিওনের মনে হল সে যেন অনাহূত আগন্তুকের মতো এই অদ্ভুত অজানা প্রকৃতির নানা গোপন রহস্যে ভরা নিষিদ্ধ পুরীতে হানা দিয়েছে।

জলের উপর পাতার আচ্ছাদনের সংকীর্ণ ফাঁকগুলি দিয়ে ঝরে পড়ছে সোনার আগুন। সোনালি সূর্যের আলো এক অস্বচ্ছ ভাস্বরতায় গাছগুলোকে ছেয়ে ফেলেছে। তারপর তাদের গুঁড়ির রেখায় বিভক্ত হয়ে ক্রমশ মিলিয়ে গেছে বনের গভীরে। আইগিপ্তসের অন্ধকার রহস্যময় মন্দিরগুলোর কথা পান্দিওনের মনে পড়ল। লতাগাছের গুঁড়িগুলো বড় বড় গাছের মাঝখানে ঝুলে আছে ফাঁসের মতো, নয়ত ঢেউখেলান পর্দার মতো আলগাভাবে নেমে এসেছে নিচে। মাটি ছেয়ে গেছে ঝরা পাতা, পচা ফল আর ডালপালায়। পা ফেললে নরম নরম লাগে। এখানে ওখানে তারার মতো জ্বলে রয়েছে উজ্জ্বল রঙিন ফুল।

গাছের গুঁড়ি থেকে গা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া চামড়ার মতো ঝুলে আছে লম্বা লম্বা খসখসে বাকল।

বিরাট সব প্রজাপতি মাটির উপর দিয়ে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ডানায় অপূর্ব সুন্দর বর্ণসুষমা — উজ্জ্বল মখমল কালোর সঙ্গে ইস্পাৎ-নীল, লাল, সোনালি আর রুপোলি রং। তা দেখে পান্দিওন বিস্মিত।

ইরুমা বেশ নিশ্চিতভাবে গাছের শিকড়ের ভিতর দিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে গেল। একেবারে জলের ধারেই একটা সমতল জায়গায় এসে পড়ল পান্দিওন। জায়গাটা নরম শ্যাওলায় ছাওয়া। মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা বাজে-পোড়া গাছ। শক্ত হলদে গাছটার হাঁ-করা ফাটলে স্থূল হাতে খোদাই করা একটা মানুষের মূর্তি। গাছটাকে যে পূজা দেওয়া হয় তা চারদিকে ঝোলা রঙিন কাপড়ের টুকরো আর বুনো জন্তুর দাঁত দেখেই বোঝা গেল। গাছের ঠিক সামনেই মাটিতে পোঁতা তিনটে কালো রং করা হাতির দাঁত।

ভক্তিভরে মাথা নুইয়ে ইরুমা এগিয়ে গেল গাছটার দিকে। পান্দিওনকেও তাই করতে বলল।

'ইনিই হচ্ছেন আমাদের জাতের পূর্বপুরুষ, বজ্রের আঘাতে এঁর জন্ম,' ক্ষীণস্বরে বলল ইরুমা। 'এঁকে কিছু অর্ঘ্য দাও; পিতৃকুল তবে তৃপ্ত হবেন।'

পান্দিওন নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল — ইরুমার পূর্বপুরুষ বলে পরিচিত এই অদ্ভুত দেবতাকে অর্ঘ্য দেবার মতো তার কাছে কিছুই নেই। হাসি মুখে তার হাতটা মেলে ধরে দেখিয়ে দিল তার কাছে কিছুই নেই। ইরুমা কিন্তু কিছুতেই ছাড়বে না।

'এটা দাও,' জিরাফের ল্যাজের তৈরী যে কোমরবন্ধটা কিদগো পান্দিওনকে শিকারের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে দিয়েছে সেটা দেখিয়ে বলল ইরুমা।

পান্দিওন অত্যন্ত বাধ্যভাবে চামড়ার কোমরবন্ধটা খুলে ইরুমাকে দিয়ে দিল। ইরুমা খুলে ফেলল তার গায়ের জোব্বা। আজ তার গলায় হার বা হাতে চুড়ি নেই। পরনেও কিছুই নেই কোমর থেকে বাঁ ঊরুর উপরে ঝুলে থাকা একটা চামড়ার কোমরবন্ধ ছাড়া।

পা টিপে টিপে মূর্তির মাথার খাঁজপড়া কাঠটার কাছে গিয়ে ইরুমা পান্দিওনের অর্ঘ্য ঝুলিয়ে দিল। আরো নিচে বেঁধে দিল রঙিন চিতাবাঘের চামড়া আর পুঁতির মতো দেখতে ঘন লাল বেরির মালা। তারপর মূর্তির পায়ের কাছে জোয়ার ছিটিয়ে দিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে পিছু হটে এল।

পাতার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র লাল ফুলে ভরা একটা বেঁটে গাছের* গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ইরুমা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পান্দিওনের দিকে। তার মাথার উপর জ্বলে উঠেছে শত শত লাল আলো, তাদের লাল রশ্মি নাচছে তার ব্রোঞ্জের মতো শরীরে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে ইরুমার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল পান্দিওন। বিরাট বিরাট গাছে ভরা নিস্তব্ধ বনে ইরুমার সৌন্দর্য তার বড় নির্মল পবিত্র মনে হল। অপরিচিত দেবতার এই বনমন্দির তার নিজের দেশের আনন্দমুখর দেবতাদের চেয়ে একেবারে অন্য রকম।

হঠাৎ এক উজ্জ্বল শান্ত আনন্দে পান্দিওনের হৃদয় ভরে উঠল। আবার সে **শিল্পী** হয়ে উঠেছে, তার মনে জেগে উঠেছে আগের আকাঙ্ক্ষা।

---

* বিগ্‌নোনিয়াকীয়ে জাতের **ট্যুলিপ** গাছ।

স্মৃতিপটে জেগে উঠল একটি অত্যন্ত স্পষ্ট ছবি। বহু দূরে, তার নিজের দেশে, সমুদ্র আর পাইন গাছের গর্জনের মাঝখানে এই ভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল তেস্সা, সেই কোন দূর অতীতে। আর কখনো সেদিন ফিরে আসবে না ...

মাথার পিছনে দু হাত রেখে ইরুমা সরু কোমরটা একটু ভেঙে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। পান্দিওন অবাক হয়ে গেল — তার মূর্তিতে তেস্সাকে সে যে ভঙ্গীতে রূপ দিতে চেয়েছিল ঠিক সেই ভঙ্গীতেই দাঁড়িয়েছে ইরুমা।

গ্রীকটির চোখের সামনে ফুটে উঠল তার অতীত জীবন। আরো প্রবল হয়ে উঠল এনিয়াদায় ফিরে যাবার বাসনা। বেরিয়ে পড়। এগিয়ে চল নতুন সংগ্রামে। এগিয়ে চল ইরুমাকে দূরে ফেলে রেখে!..

পান্দিওনের মনে তার আগেকার সর্বদা সুস্পষ্ট কামনা দ্বিগুণ হয়ে উঠল। নিজের মধ্যে সে দেখতে পেল বিরুদ্ধ ভাব, আগে যা সে কখনো দেখেনি। তাতে সে ভয় পেয়ে গেল।

এখানে সে অনুভব করল জীবনের ডাক, আফ্রিকার সূর্যের মতোই উত্তপ্ত, বৃষ্টি-ধোওয়া ফুলফোটা প্রান্তরের মতো যৌবনে ভরা, ফুঁসে ওঠা জলস্রোতের মতো জোরাল জীবনের শক্তি। বহুদূরে, তার নিজের দেশে সে দেখেছিল মহান শিল্প সৃষ্টির উজ্জ্বল স্বপ্ন। কিন্তু সৌন্দর্য তো মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। সে সৌন্দর্য এত কাছে, এত আনন্দে ভরা। ইরুমা আর তেস্সায় কত তফাৎ। কোন দিক দিয়েই তাদের মিল নেই। তবু ওদের দুজনের মধ্যেই রূপ নিয়েছে সেই একই প্রকৃত সৌন্দর্য।

ইরুমার মধ্যেও সঞ্চারিত হল পান্দিওনের ভয়। পান্দিওনের কাছে এগিয়ে এল সে। এক অজানা সুরেলা ভাষার কথায় ভেঙ্গে গেল নিস্তব্ধতা।

'সোনালি চোখ, তুমি আমাদের ... মহাদেবীর নাচ আমি নেচেছি ... আমাদের পিতৃকুলও তোমার অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন ...' ইরুমার গলা বুজে এল, বড় বড় চোখের পাতায় ঢেকে গেল দুচোখ। দুহাতে পান্দিওনের গলা জড়িয়ে ধরে সে তাকে জোরে চেপে ধরল।

পান্দিওনের চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার। মরীয়া হয়ে সে কোন রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। ইরুমা মাথা তুলল। মুখটা তার আধখোলা। তাতে ফুটে উঠেছে একটা ছেলেমানুষী ভাব।

'তুমি এখানে থাকতে চাও না? তোমার সঙ্গীদের সঙ্গে চলে যাবে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ইরুমা। পান্দিওন বড় লজ্জা বোধ করল।

সাদরে ইরুমাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে পান্দিওন এদেশী ভাষা তার যেটুকু জানা আছে তার মধ্যে থেকে লাগসই শব্দ খুঁজতে লাগল। নিজের দেশের জন্য তার আকুলতার কথা সে ইরুমাকে বলতে, তেস্‌সার কথাও জানাতে চেষ্টা করল ... পান্দিওনের চওড়া বুকে সংলগ্ন ইরুমা মাথা তুলল। চোখদুটো তার তখন চেয়ে রয়েছে পান্দিওনের চোখের সোনালি আভার দিকে, একটা ম্লান হাসিতে ফুটে উঠল তার সাদা দাঁতের ছটা। ইরুমা কথা বলতে সুরু করল। তার গলার স্বরে ফুটে উঠল তেস্‌সার সেই নরম আবেগ আর আদরভরা ভালবাসা। পান্দিওন আবার মুগ্ধ হল তেস্‌সার কথা শুনে যেমন হত।

ইরুমা বলল, 'এখানে যদি থাকতে না পার, তবে অবশ্য তুমি নিশ্চয়ই চলে যাবে।' শেষ কথাটা বলতে গিয়ে তার কথা ঠেকে গেল। তারপর আবার বলল, 'কিন্তু আমাকে আর আমার স্বজাতিকে যদি তোমার ভাল লেগে থাকে তবে আমাদের সঙ্গেই থেকে যাও সোনালি চোখ। ভেবে দেখ, তারপর আমার কাছে এস... আমি অপেক্ষা করে থাকব।'

দর্পভরে মাথা তুলে ইরুমা খাড়া হয়ে দাঁড়াল। নাচের সময় পান্দিওন তাকে এই রকমই গম্ভীর আর কঠোর হতে দেখেছে। পুরো একটি মিনিট তরুণ গ্রীকটি ইরুমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর হঠাৎ কী একটা স্থির করে সে ইরুমার দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু ইরুমা তখন গাছের ওপারে জঙ্গলের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে ...

ইরুমার চলে যাওয়াটা পান্দিওনের মনে বাজল গভীর আঘাতের মতো। অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল বনের অন্ধকারে। তারপর ধীরে ধীরে এগোতে থাকল খোলা জায়গার সোনালি কুয়াশা ভেদ করে। কোথায় চলেছে তা সে জানে না। ইচ্ছে ছিল ইরুমার পিছনে ছুটে গিয়ে জানায়

সে তাকে ভালবাসে, তার সঙ্গে থাকতেই চায়। বহুকষ্টে পান্দিওন চেপে রাখল তার এই ইচ্ছে।

গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়া মাত্রই ইরুমা ছুটতে লাগল। হাল্কা পায়ে গাছের শিকড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে লতাগাছের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে সে ভীষণ জোর ছুটে চলল। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে একটা পুকুরের ধারে এসে থামল। শান্ত পুকুরটা আসলে হচ্ছে অনেক চওড়া হয়ে যাওয়া নদীর আবদ্ধ জল। বনের অন্ধকার আর ঠাণ্ডার পর উজ্জ্বল আলোয় ইরুমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল, গরম লাগতে লাগল।

সজল চোখে ইরুমা চারদিকে চেয়ে দেখল। চোখে পড়ল জলের বুকে নিজের ছায়া। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে আয়নায় নিজেকে পরখ করে দেখতে লাগল ... সত্যিই সে সুন্দর! কিন্তু সৌন্দর্যই সব নয়। তা না হলে সাহসী, স্নেহ মমতায় ভরা সোনালি চোখ কেন তাকে ছেড়ে যাবে? আরো কিছুর তবে তার প্রয়োজন ... কিন্তু কিসের?..

বন্ধুর প্রান্তরের ওপারে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কুটিরের দোরগোড়া পর্যন্ত ঢলে পড়েছে নীল ছায়া। কাভি আর কিদগো সেখানে বসে।

তার আবির্ভাবে ওদের উসখুস ভাব দেখেই পান্দিওন বুঝতে পারল অনেকক্ষণ ওরা অপেক্ষা করে আছে। চোখ নিচু করে পান্দিওন বন্ধুদের দিকে এগিয়ে এল। কাভি উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর কঠোর তার মুখ। পান্দিওনের কাঁধে হাত রেখে সে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমাদের কথা আছে।' কিদগোকে মাথা নেড়ে দেখিয়ে বলল। 'সভায় তুমি আসনি, কিন্তু আমরা সব ঠিক করে ফেলেছি, — কালকেই রওনা হতে হবে ...'

পান্দিওন থমকে হটে গেল। গত তিনদিনের মধ্যে কত কীই না ঘটেছে, কিন্তু কাভিরা যে এত তাড়াহুড়ো জুড়ে দেবে তা সে ভাবতেও পারেনি। সেও অবশ্য এরকমই তাড়াহুড়ো করত যদি ... যদি ইরুমা না থাকত!

বন্ধুদের ভর্ৎসনার দৃষ্টি পান্দিওনের নজর এড়াল না। পান্দিওনকে

এখন মনস্থির করতে হবে। এ কথা ভেবে অনেক দিন থেকেই তার মন অস্থির হয়ে উঠেছে। সবকিছু আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে, এ রকম একটা ছেলেমানুষী আশার বশে সে নিজের অজান্তেই এতদিন ধরে ব্যাপারটাকে এড়িয়ে এসেছে। তার মনে হল একটা দেয়াল যেন আবার তাকে তার মুক্তির জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। সেই মুক্তির জগতের অস্তিত্ব অবশ্য একমাত্র তার স্বপ্নেই।

পান্দিওনকে এখন ঠিক করতে হবে সে কী চায়। ইরুমার সঙ্গে এখানেই থেকে যাবে, নাকি চিরকালের মতো তাকে ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়বে সঙ্গীদের নিয়ে। এখানে থাকতে হলে অবশ্য চিরকালের মতো থেকে যেতে হবে। বিরাট দূরত্বের হাতে তারা বাঁধা পড়েছে। সে দূরত্ব জয় করা সম্ভব সাতাশ জন লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই, বাড়ি ফেরার আগ্রহে সবকিছু, এমন কি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হতেও যারা প্রস্তুত। তাই সে থেকে গেলেই তাকে দেশ ঘর সমুদ্র তেস্‌সা মাতৃভূমি, এ সবকিছু হারাতে হবে। অথচ এদের চিন্তাই এতদিন তাকে শক্তি জুগিয়েছে, এখানে আসায় সহায়তা করেছে।

এত দিন সে আপনা থেকেই তার সঙ্গীদের উপর নির্ভর করে এসেছে, নানা বিপদের মাঝখান দিয়ে গড়ে উঠেছে তাদের বন্ধুত্ব। তাদের ছেড়ে দিয়ে এই প্রীতিতে ভরা কিন্তু অপরিচিত দেশে সে কি নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারবে? কিছু না ভেবেই সে তার সমস্ত মন দিয়েই অনুভব করল ঠিক উত্তরটা।

যারা তার প্রাণ বাঁচাল, তাকে ভাল করে তুলল তাদের ত্যাগ করাটা কি বিশ্বাসঘাতকতা নয়?

না, তাকে যেতেই হবে। তার আধখানা মন সে এই বিদেশেই ফেলে রেখে যাবে।

এই দ্বন্দ্বের ভার সামলানর মতো মনোবল পান্দিওনের নেই। মনের ভিতরের তীব্র সংগ্রাম তার মুখেও ফুটে উঠল। কাভি আর কিদগো উৎকণ্ঠিতভাবে চেয়ে রইল তার দিকে। হঠাৎ তাদের হাত টেনে নিয়ে অনুনয়ের স্বরে সে বলে উঠল, এত তাড়াতাড়ি না। এখন তো তারা

মুক্তি পেয়েইছে, তবে আরেকটু থেকে গেলে কী ক্ষতি, দীর্ঘ যাত্রার আগে আরো কিছুটা জিরিয়ে নেওয়া ভাল, অঞ্চলটাও ভাল করে জেনেশুনে নেওয়া যাবে।

কিদগো ইতস্তত করতে লাগল। পান্দিওনকে সে বড় ভালবাসে। কাভির মুখ কিন্তু হয়ে উঠল আরো কঠোর।

'ভিতরে এস, এখানে অন্যেরা শুনতে পাবে,' পান্দিওনকে ঘরের ভিতর ঠেলে দিয়ে সে বলল। তারপর বেরিয়ে গিয়ে নিয়ে এল জ্বলন্ত কয়লার টুকরো। ধরাল ছোট্ট একটা মশাল। কাভির মনে হল আলো থাকলে বোধ হয় বন্ধুর দ্বিধা কাটিয়ে ওঠার সুবিধা হবে।

কড়া গলায় কাভি বলে উঠল, 'এখানে কিসের আশায় আমরা থাকব?' তার তীক্ষ্ণ কথাগুলো পান্দিওনের মনে বিঁধল। 'বিশেষ করে শেষ পর্যন্ত যখন যাবই। ওকে কি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও নাকি?'

ইরুমা যে তাদের সঙ্গে এই দীর্ঘ আর মারাত্মক বিপদসংকুল পথ পাড়ি দেবে, পান্দিওন তা কখনো ভাবেনি। পান্দিওন মাথা নাড়ল।

'তবে কেন থাকতে বলছ, বুঝতে পারছি না,' কাভি কঠোরভাবে বলল, 'তুমি কি ভাবছ অন্যেরাও এখানে তাদের মনের মতো মেয়ে পায়নি? কিন্তু দেশে ফেরার ব্যাপারে তবু কেউ এতটুকু ইতস্তত করেনি। একটি মেয়ে আর স্বদেশ — এ দুয়ের মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্ন যখন ওঠে তখন এখানে থেকে যাবার কথা একজনও ভাবেনি। ইরুমার বাবার ধারণা তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ না। তোমায় তার বেশ পছন্দ হয়েছে। তোমার বীরত্বের কথা তো সবাই জানে। সে জানিয়েছে তোমায় তার পরিবারে গ্রহণ করতে সে রাজী আছে! একটা সুন্দর মুখের জন্য তুমি নিশ্চয়ই আমাদের ছেড়ে দেবে না, ভুলে যাবে না তোমার আপন দেশকে?'

পান্দিওন মাথা নোয়াল। কাভির ভুলটা কোথায় তা সে খুলে বলতে পারবে না। সে যে কেবল কামনার বশেই থেকে যেতে চায়, তা নয়। কিন্তু সে কথা সে কী করে কাভিকে বোঝাবে? তার শিল্পিসত্তাকে ইরুমা কীভাবে নাড়া দিয়েছে, সে কথা কী করে বোঝাবে? ওদিকে আবার কাভির কথার কঠোর সত্যও তার মনে বিঁধল। সে ভুলে গিয়েছিল একেক জাতের একেক

রকম নিয়মকানুন, আচার ব্যবহার। এখানে থাকতে হলে তাকে শিকারী হতে হবে, এদেশের লোকেদের জীবনযাত্রা তাকেও আপনার করে নিতে হবে। ইরুমার সঙ্গে থাকার সুখের এই দাম তাকে দিতেই হবে... তারোপর এ দেশে ইরুমাই একমাত্র তার আপনার। এ দেশের শান্ত উত্তপ্ত সোনালি প্রান্তরের উদার ব্যাপ্তির সঙ্গে তার দেশের শব্দমুখর সমুদ্রের সরল বিস্তৃতির কোনই মিল নেই। ইরুমা এই জগতেরই অঙ্গ, অথচ পান্দিওনের মন থেকে 'কয়েকদিনের অতিথির' ভাবটা এখনো যায়নি ... ওদিকে বহুদূর থেকে তার স্বদেশ দিগ্‌দর্শী আলোর মতো তাকে ডাকছে। সে আলো যদি নিভে যায় সে বেঁচে থাকতে পারবে?

পান্দিওনকে ভেবে দেখার সুযোগ দেবার জন্য কাভি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল:

'ইরুমাকে বিয়ে করে কয়েকদিন পরেই যদি তাকে ছেড়ে চলে যাও; তুমি কি মনে কর, এদেশের লোকেরা তাহলে আমাদের সাহায্য করবে, বিনা বাধায় যেতে দেবে? তাদের আতিথ্যের এই প্রতিদান তুমি দেবে? তোমার প্রাপ্য শাস্তি এসে পড়বে আমাদের সকলের উপরও ... তাছাড়া একথা কেন তুমি ধরে নিচ্ছ যে, অন্যেরাও অপেক্ষা করতে রাজী হবে? আর কেউ অপেক্ষা করতে রাজী নয়, আমিও সে দলেই!'

কাভি চুপ করে গেল। তারপর নিজের রুক্ষতার জন্য যেন একটু লজ্জিত হয়েই বিষণ্নস্বরে বলল:

'আমার খুবই খারাপ লাগছে। সমুদ্রে যখন পৌঁছব তখন জাহাজ চালানয় অভিজ্ঞ কোন সঙ্গী পাব না। রেম্‌দ্‌ মারা গেল। তোমার উপরেই এতদিন নির্ভর করেছিলাম — তুমি জাহাজ চালিয়েছ, ফিনিশীয়দের কাছ থেকে তা শিখেছ...' কাভি মাথা নুইয়ে চুপ করে বসে রইল।

কিদগো ছুটে এসে পান্দিওনের গলায় একটা চামড়ার লম্বা দড়িওয়ালা থলে ঝুলিয়ে দিল। বলল, 'তুমি যখন অসুস্থ ছিলে, তখন এ থলেটার ভার আমিই নিয়েছিলাম। তোমার সেই সমুদ্রের মন্ত্রপূত কবচ এতে রয়েছে ... এর জোরেই তুমি গণ্ডারকে পরাস্ত করেছ। তুমি সঙ্গে থাকলে এর কল্যাণেই আমরা সমুদ্রে পৌঁছবার পথ খুঁজে পাব ...'

ইয়াখ্‌মসের দেওয়া পাথরটার কথা পান্দিওনের মনে পড়ে গেল। অন্য অনেক কিছুর মতো উজ্জ্বল সমুদ্রের এই প্রতীকের কথাও একেবারে সে ভুলে গিয়েছিল। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল পান্দিওন। সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢুকল লম্বা বর্শা হাতে দীর্ঘকায় একটি লোক। ইরুমার বাবা। বেশ সহজ স্বাভাবিকভাবেই সে মেঝের উপর পা মুড়ে বসে পড়ল। পান্দিওনের দিকে চেয়ে হাসল প্রীতির হাসি। তারপর কাভির দিকে তাকিয়ে বলল:

'তোমার কাছে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে এসেছি। আজ থেকে আর এক সূর্য ওঠার পরে তোমরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে বলে ঠিক করেছ।'

মাথা নেড়ে সমর্থন জানিয়ে কাভি পরের কথাটা শোনার জন্য চুপ করে রইল। পান্দিওন উদ্বেগের সঙ্গে তাকিয়ে রইল ইরুমার বাবার দিকে। তার মধ্যে বেশ একটা সহজ স্বাভাবিক মর্যাদার ভাব।

'দীর্ঘ যাত্রা, প্রান্তর আর বন নানা হিংস্র প্রাণীতে ভরা,' শিকারী বলে চলল। 'তোমাদের তেমন অস্ত্রশস্ত্রও নেই। মনে রেখ বিদেশী, মানুষের সঙ্গে যেভাবে লড়াই করা যায় জন্তুদের সঙ্গে তা চলে না। তলোয়ার তীরধনুক আর ছোরা নিয়ে মানুষের সঙ্গে লড়াই করা যায়, জন্তুদের বেলায় চাই বর্শা। একমাত্র বর্শাই জন্তুকে ঠেকাতে পারে, দূর থেকে পারে তার হৃৎপিণ্ড গেঁথে ফেলতে। তোমাদের ঐ বর্শাগুলো এদেশে অচল।' দেয়ালের গায়ে হেলান দেওয়া তামার মাথাওয়ালা পাতলা মিশরী বর্শাটা সে দেখিয়ে দিল। তারপর নিজেরটা তুলে ধরে বলল, 'এই রকম বর্শা চাই!'

বর্শাটা কাভির হাঁটুর উপর রেখে লম্বা চামড়ার ঢাকনাটা খুলে নিল।

ভারী বর্শাটা লম্বায় হাত চারেকেরও বেশি। বর্শার দু'আঙুল মোটা ডাণ্ডাটা হাড়ের মতো উজ্জ্বল শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরী। ডাণ্ডার মাঝখানটা একটু মোটা, সেখানে হায়েনার খসখসে পাতলা চামড়া লাগান। বর্শার মুখে সাধারণ বর্শার ফলার বদলে তিন আঙুল চওড়া আর এক হাত লম্বা শক্ত হালকা রঙের ধাতুর দুর্লভ বহুমূল্য লোহার ফলা।

কী ভাবতে ভাবতে কাভি ফলার ধারটা হাত দিয়ে পরখ করে দেখল। তারপর ওজনটা একবার দেখে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরিয়ে দিল বর্শাটা।

কাভির মনের ভাব দেখে ইরুমার বাবা হেসে সাবধানে বলল:

'এ রকম বর্শা বানাতে অনেক খাটতে হয় ... এই ধাতুটা অনেক দাম দিয়ে পাশের জাতির লোকদের কাছ থেকে কিনতে হয়েছে। কিন্তু এই বর্শা রক্ষা করতে পারে বহু মারাত্মক বিপদের হাত থেকে...'

শিকারী কী বলতে চায় ধরতে না পেরে কাভি চুপ করে রইল।

শিকারী বলে চলল, 'তা-কেম থেকে তোমরা ভাল জোরাল ধনুক নিয়ে এসেছ। অমন ধনুক আমরা বানাতে পারি না। আমাদের বর্শার সঙ্গে তোমাদের ধনুক বদল করবে? সর্দাররা বলেছে ধনুক পিছু দুটো করে বর্শা দেবে। আমি বলেছি, ধনুকের চেয়ে বর্শাই তোমাদের বেশি কাজে লাগবে।'

কিদগোর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল কাভি। কিদগো মাথা নেড়ে শিকারীর কথারই সমর্থন জানাল, বলল: 'এই প্রান্তরে শিকার প্রচুর। তীর ধনুকে কোন লাভ নেই, কিন্তু বনে গিয়ে অসুবিধে হবে। যাহোক বন এখনো অনেক দূর পর্যন্ত চলেছে। সেখানে তিনটে ধনুকের বদলে ছটা বর্শা অনেক বেশি লাভজনক।'

কাভি একটু ভাবল, তারপর বদলানটাই সাব্যস্ত করে দরাদরি করতে লাগল। শিকারী কিন্তু টলবার পাত্র নয় — বর্শা যে কী অমূল্য বস্তু তা সে বুঝিয়ে বলল। জানাল কালো রাজ্যের ধনুক কী ভাবে তৈরী তা দেখার জন্যই তারা ধনুক পিছু দুটো করে বর্শা দিচ্ছে, অন্য সময় হলে কিছুতেই দিত না।

'ভাল!' কাভি বলল। 'আমাদের বহুদূর পথ যেতে হবে। নইলে ধনুকগুলো তোমাদের আতিথ্যের জন্য এমনিই আমরা দিয়ে যেতাম। তোমার সর্তই মেনে নিচ্ছি। আসছে কাল ধনুক পাবে।'

শিকারীর মুখ হাসিতে ভরে গেল। কাভির হাতে চাপড় মেরে সে বর্শাটা তুলে ধরল। ফলায় মশালের লাল ছায়াটা দেখে নিয়ে নানা রঙের চামড়ায় নক্সা করা চামড়ার খাপে বর্শাটা ভরে ফেলল।

কাভি হাত বাড়িয়ে দিল। শিকারী কিন্তু অস্ত্রটা দিল না।

'আসছে কাল এরকমই ছটা বর্শা পাবে। এটা ...' ইরুমার বাবা একটু থেমে আবার বলল, 'তোমার সোনালি চোখ বন্ধুকে উপহার। ইরুমা নিজে হাতে খাপটা সেলাই করেছে। দেখ না, কী সুন্দর!'

বর্শাটা বাড়িয়ে দিতে পান্দিওন একটু ইতস্তত করে নিয়ে নিল।

কাভিদের দেখিয়ে ইরুমার বাবা বলল, 'তুমি ওদের সঙ্গে যাচ্ছ না, কিন্তু তবু ভাল শিকারীর পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে ভাল বর্শা, তুমি আমাদের বাড়ির লোক হবে, আমি পরিবারের খ্যাতি বাড়াতে চাই!'

বন্ধুরা পান্দিওনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিদগো এত জোরে আঙুলগুলোয় চাপ দিল যে সেগুলো ফুটে উঠল। অপ্রত্যাশিতভাবেই এসে গেছে চরম সিদ্ধান্তের সময়।

পান্দিওনের মুখ তখন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। হঠাৎ সে চরম প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গী করে বর্শাটা ফিরিয়ে দিল শিকারীকে।

'উপহার ফিরিয়ে দিচ্ছ? তার মানে?' অবাক হয়ে শিকারী চেঁচিয়ে উঠল।

'আমি সঙ্গীদের সঙ্গেই যাব,' বহুকষ্টে বলে উঠল পান্দিওন।

ইরুমার বাবা পান্দিওনের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, মুখ দিয়ে একটিও কথা সরল না। তারপর বর্শাটা তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে রেগে বলল:

'ঠিক আছে, কিন্তু খবরদার, আমার মেয়ের দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না। আজকেই ওকে অন্যখানে পাঠিয়ে দেব!'

পান্দিওন বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল শিকারীর দিকে। তার পুরুষোচিত বলিষ্ঠ মুখাবয়ব বিকৃত হয়ে উঠেছে আন্তরিক দুঃখে। তা দেখে ইরুমার বাবার রাগ একটু কমে এল। সে বলল:

'সাহস করে, বেশি দেরী হয়ে যাবার আগেই মনস্থির করেছ। তা ভাল। কিন্তু যদি যেতে হয় তবে এখনি যাওয়া ভাল ...'

কড়া চোখে পান্দিওনকে আর একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সে একটা অস্ফুট আওয়াজ করল।

দোরগোড়ায় ইরুমার বাবা কাভির দিকে ঘুরে রুক্ষভাবে বলল:

'যা বলেছি তাই করব।' তারপর মিশে গেল অন্ধকারে।

পান্দিওনের চোখের দীপ্তি দেখে কিদগোর অস্বস্তি হল। বুঝল এখন তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় বা ইচ্ছা পান্দিওনের নেই। তরুণ গ্রীকটি তখন শূন্যে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। যেন দূর অন্ধকারকে জিজ্ঞেস করছে কী তার করা উচিত। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে হাতে মুখ ঢাকল।

কাভি একটা নতুন মশাল জ্বালাল — বন্ধুকে একা অন্ধকারে তার চিন্তার রাজ্যে ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছা নেই। কোন কথা না বলেই কাভি আর কিদগো একপাশে বসে জেগে রইল। মাঝে মাঝে তারা বন্ধুর দিকে উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকায়, কিন্তু তাকে সাহায্য করার তাদের কিছুই নেই।

ধীরে ধীরে সময় এগোতে লাগল। রাত নামল। পান্দিওন বিছানায় নড়াচড়া করে লাফিয়ে উঠে কী যেন শুনতে লাগল। তারপর ছুটে গেল দরজার দিকে। কাভির চওড়া কাঁধ কিন্তু দরজা আটকে দাঁড়াল। পান্দিওন বাধা পেয়ে রেগে ভুরু কুঁচকল:

'আমায় যেতে দাও! ইরুমাকে ওরা যদি এখনো পাঠিয়ে দিয়ে না থাকে তবে ওর কাছ থেকে আমায় বিদায় নিতেই হবে।'

'কী করছ? ইরুমার, তোমার, আমাদের সব্বার সর্বনাশ ডেকে আনবে!' কাভি বলল।

কোনো উত্তর না দিয়ে পান্দিওন কাভিকে ঠেলে বেরতে চাইল। কাভি কিন্তু একটুও নড়ল না।

'মন যখন স্থির করে ফেলেছ, তখন আর তার বাবাকে রাগিও না। তার ফলটা কী হবে সে কথা ভেবে দেখ,' পান্দিওনকে বোঝানর চেষ্টায় কাভি বলল।

পান্দিওন আরো জোরে কাভিকে ঠেলে দিতে কাভি তার বুকে এক ঘুষি বসিয়ে দিল। বন্ধুদের এই লড়াই দেখে কিদগো কাছে ছুটে এসে অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পান্দিওন রাগে দাঁতে দাঁত চেপে জ্বলন্ত চোখে কাভির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নাক ফুলিয়ে তেড়ে গেল। চট করে নিজের ছুরিটা বের করে পান্দিওনের দিকে হাতলটা বাড়িয়ে দিয়ে কাভি রেগে চেঁচিয়ে উঠল:

'এই নাও, মার!'

পান্দিওন স্তম্ভিত হয়ে গেল। বুক চিতিয়ে বাঁ হাতটা হৃৎপিণ্ডের উপরে রেখে ডান হাতে ছোরাটা পান্দিওনের উদ্দেশে বাড়িয়ে দিয়ে কাভি ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'দাও, এখানে বসিয়ে দাও! আমায় না মেরে তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না! মেরে তবে যাও!'

বিষণ্ণ বিচক্ষণ বন্ধুকে পান্দিওন এই প্রথম এরকম অবস্থায় দেখল। ঘুরে গিয়ে অসহায়ভাবে গোঙাতে গোঙাতে টলতে টলতে সে নিজের বিছানায় ঢলে পড়ল। তারপর তার সঙ্গীদের দিকে পিছন ফিরে শুয়ে রইল।

হাঁপাতে হাঁপাতে কাভি কপালের ঘাম মুছে ফেলে ছুরিটা কোমরবন্ধে পুরে ফেলল।

'সারারাত ওকে পাহারা দিতে হবে, তারপর যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বেরিয়ে পড়ব। ভোরবেলা তুমি গিয়ে সবাইকে তৈরী হতে বলবে,' কাভি বলল কিদগোকে। কিদগো বেশ ভয় পেয়েছে।

কাভির কথাগুলো বেশ ভাল করেই পান্দিওনের কানে গেল। বুঝতে পারল ইরুমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন সুযোগই ওরা দেবে না। তার মনে হল তাকে যেন বেঁধে রাখা হয়েছে। শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। সুরু হল নিজের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম। ক্রমশ সেই ভীষণ, উন্মত্ত হতাশার বদলে দেখা দিল শান্ত দুঃখ।

আবার সেই সাতাশ জন একগুঁয়ের সামনে ছড়িয়ে পড়ল আফ্রিকার উত্তপ্ত প্রান্তর। প্রত্যেকেই ঘরে ফেরার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সইতে প্রস্তুত সব কিছু।

বৃষ্টির পর হাতিঘাস বার হাত বেড়ে উঠেছে, বিরাট বিরাট হাতিও তার হাঁপধরান উত্তপ্ত জঙ্গলে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যাবার কারণটা কিদগো পান্দিওনকে বুঝিয়ে বলল। কয়েক দিনের মধ্যেই বর্ষা শেষ হয়ে যাবে। সমস্ত প্রান্তর তখন যাবে জ্বলে পুড়ে শুকিয়ে, কোথাও থাকবে না এতটুকু প্রাণের চিহ্ন। চারদিকে পড়ে থাকবে ছাইঢাকা মাঠ। জুটবে না খাবার।

পান্দিওন নীরবে কথা মেনে নিল। তার ব্যথা তখনো খুবই সজীব রয়েছে। কিন্তু যাদের কাছে তার এত ঋণ সেই সঙ্গীদের কাছে এসে সে দেখল, বন্ধুত্বের বাঁধন আবার তাকে জড়িয়ে ধরছে, আবার সে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে এগিয়ে চলার উৎসাহে, সংগ্রাম করার আগ্রহে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এনিয়াদায় পেঁছিবার ইচ্ছা হয়ে উঠেছে আরো প্রবল।

ইরুমার জন্য মন অত্যন্ত খারাপ তা সত্ত্বেও পান্দিওনের মনে হতে লাগল, এতদিনে সে তার নিজের সত্তা ফিরে পেয়েছে। সামনে আর কোন ভয় নেই। নির্দিষ্ট পথ ধরে সে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। রূপ ও রঙের প্রতি শিল্পীর সেই পুরোনো তৃষ্ণা শেষ হয়নি। পান্দিওনের মন আগের মতোই সৃষ্টির ইচ্ছায় ভরা।

বর্শা, ছোট বল্লম, ছোরা আর ঢালে সজ্জিত সাতাশজন শক্তিশালী পুরুষ। এককালের ক্রীতদাস, নানা বিঘ্ন বিপদ সংঘাতে পোড় খেয়ে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বনের জন্তুকে তাদের আর ভয় নেই।

লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে যাওয়া পথটা অত্যন্ত বিপদসংকুল। জন্তুদের চলাচলের সরু পথ ধরে সার বেঁধে একজনের পর একজন চলতে হচ্ছে। সামনের লোকের পিঠ ছাড়া কিছুই দেখার উপায় নেই। ডাইনে বাঁয়ে মর্মরিত ঘাসের দেয়ালে সারাক্ষণ বিপদের হাতছানি। যে কোন মুহূর্তে ঘাসের ঝোপ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে লুকিয়ে আসা সিংহ, নয়ত ক্ষ্যাপা গণ্ডার কিম্বা নিঃসঙ্গ মারাত্মক বিরাট হাতি। ঘাস সবাইকে তফাৎ করে রেখেছে। পিছনে যারা রয়েছে তাদেরই অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, কারণ সামনের লোকদের সাড়ায় জেগে ওঠা ক্ষ্যাপা জন্তু পিছন দিকেই আক্রমণ করে বসতে পারে। সকাল বেলা ঠাণ্ডা শিশিরে ঘাস ভরে যায়। পথিকদের

উপর ঝরে পড়ে উজ্জ্বল জলকণা, তাদের গা চকচক করতে থাকে, মনে হয় যেন বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। দিনের ভীষণ গরমে শিশির যায় উপে। ঘাসের বৃন্ত থেকে ঝরে পড়ে ধুলো। সবার গলা জ্বালা করে ওঠে। সরু পথটায় অসম্ভব গুমট।

যাত্রার তিন দিনের দিন একটা চিতাবাঘ লাফিয়ে পড়ল সাহসী লিবীয়ার তাকেলের উপর। সারের পিছন দিকটায় সে চলে গেল। খুব ভাগ্যজোরে সেবার অল্প কয়েকটা আঁচড়ের উপর দিয়েই তার ফাঁড়া কাটে। পরের দিন একটা বিরাট, ঘন রঙের কেশরওয়ালা সিংহ আক্রমণ করে পান্দিওন আর তার পাশের নিগ্রোকে। ইরুমার বাবার দেওয়া বর্শার ঘায়ে পান্দিওন সিংহটাকে থামায়। অপ্রত্যাশিত আক্রমণে হাতের ঢালটা পড়ে যায় মাটিতে। তার নিগ্রো সঙ্গীটি ঢালটা কুড়িয়ে নিয়ে পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে সিংহের উপর। সিংহটা তার নতুন আক্রমণকারীর দিকে মুখ ফেরাতে গিয়ে পড়ে যায়, তিনটে বর্শা তাকে ফুঁড়ে ফেলে। কিদগো উত্তেজনায় ছুটে আসতে আসতে সবকিছু শেষ। যোদ্ধারা হাঁপাতে হাঁপাতে বর্শার গায়ে সিংহের দ্রুত জমাট বেঁধে যাওয়া রক্ত মুছে ফেলে। সিংহটা লুটনো বাদামী ঘাসের উপর পড়ে থাকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে। অন্যরা সবাই ছুটে এসে মহা সোরগোল জুড়ে দেয়। গাঁট্টাগোঁট্টা দুজন নিগ্রো, ধ্লোমো আর ম্পাফু, কিদগোর সঙ্গে পথ দেখানর ভার নিয়েছিল। সবাই তাদের বোঝাতে লেগে যায় বুনো জন্তুর হাতে ঠিক কারো না কারো প্রাণ যাবে। উঁচু ঘাসের এই প্রান্তরের পাশ কাটিয়ে যাওয়াই ভাল। পথপ্রদর্শকেরা তাতে রাজী হল। দক্ষিণে এগিয়ে সবাই সন্ধ্যার আগেই একটা সরু লম্বা বনের কাছে এসে পড়ল। বনটা ঠিক দিকেই পড়েছে — দক্ষিণ-পশ্চিমে। নদীর সরু খাতের উপর খিলানওয়ালা সবুজ বারান্দার মতো এই জাতীয় বনের সঙ্গে পান্দিওনের আগেই পরিচয় ঘটেছে। প্রান্তরের বুকে নদীর খাত ধরে এই ধরনের বন নানা দিকে ছড়িয়ে গেছে।

যাত্রীদের ভাগ্য ভাল, বড় বড় গাছের নিচে কাঁটা ঝোপ বা পথ জুড়ে দাঁড়ান লতাগাছ নেই। বড় বড় শিকড়গুলো এড়িয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে

এ'কে বে'কে গিয়ে যাত্রীরা সময়ও কিছুটা বাঁচায়। প্রচণ্ড রোদে খসখস আওয়াজ তোলা ঘাসের সেই হাঁপধরান অবস্থার পর পাওয়া গেল গভীর নিস্তব্ধতা আর শীতল প্রায়ান্ধকার। বনটা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। যাত্রীরা দিনের পর দিন গাছের তল দিয়ে হে'টে চলল। মাঝে মাঝে শিকারের সন্ধানে তারা ঘাসের সমতলে আসে নয়ত বনের খোলা জায়গায় অপেক্ষাকৃত বে'টে গাছে চড়ে দিক ঠিক করে নেয়।

বনের ভিতর দিয়ে চলাটা অনেক সহজ আর কম বিপজ্জনক। কিন্তু তবু এই রহস্যময় বনের অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা পান্দিওনের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। মনে পড়ে যেতে থাকল ইরুমার সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথা। তার মনে হল সে যা হারিয়েছে তা পরিমাপের অতীত। তার দুঃখ সারা জগতের উপর ধূসর পর্দা টেনে দিয়েছে। অজানা ভবিষ্যৎ এই বনের মতোই বিষণ্ণ নিস্তব্ধ আর অন্ধকার।

পান্দিওনের মনে হল এই একঘেয়ে গাছের সারি, এই একবার আলো একবার ছায়া, আর এই বন্ধুর বিদেশী মাটি বুঝি কখনোই শেষ হবে না। কোন্ অজানা দূরত্বে, বিদেশবিভুঁই রাজ্যের কোন্ অন্তরে এগিয়ে গেছে এই বন — সব কিছুই এখানে অপরিচিত, কেবল বিশ্বস্ত বন্ধুদের দৌলতেই রক্ষা পাওয়া সম্ভব নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে।

বন্দী অবস্থায় সমুদ্রটাকে বড় কাছে মনে হয়েছিল। অথচ এখন যতই দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে ততই মনে হচ্ছে সমুদ্রটা বোধ হয় বহুযোজন দূরে। মাঝখানে রয়েছে বহু বাধা, দীর্ঘযাত্রা ... সমুদ্র তাকে ইরুমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছে অথচ নিজেও ধরা দিচ্ছে না ...

বনপথটা গিয়ে পড়ল দিগন্তব্যাপী এক জলায়। অত্যধিক জোলো হাওয়ার ফলে দূর থেকে জলাটার চারদিকে একটা সবুজ ছায়ার আবরণ দেখা যায়। সকাল বেলা দেখা যায় সাদা কুয়াশার কম্বলের ছোট বেড়া। নলখাগড়ার সমুদ্রের উপরে উড়ে বেড়ায় সাদা ইগ্রেট্।

কাভি, পান্দিওন আর লিবীয়ার লোকেরা এই বিরাট বাধার সামনে এসে হতভম্ব হয়ে গেল। জলার উজ্জ্বল সবুজ ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে

চকচকে জল। জলের বুকে রোদের প্রতিফলনে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পথপ্রদর্শকরা কিন্তু বেশ সন্তুষ্ট — ঠিক পথেই তারা চলেছে, দুসপ্তাহের কঠিন পথ চলা তবে মিথ্যে হয়নি।

পরদিন সবাই লেগে গেল হালকা ফাঁপা দশহাত উঁচু, গাঁটওয়ালা এম্‌বাগের* ভেলা বানাতে। তারপর ভেলায় চড়ে এগোতে থাকল ঝাঁটামাথা উঁচু প্যাপিরাসের ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, লালচে শুকনো ভাঙা নলখাগড়ায় ভরা ভাসমান ঘাসের দ্বীপকে বেড় দিয়ে। প্রতি ভেলায় দু-তিন জন লোক, জলার পলিমাটিতে তালে তালে লম্বা লগি ঠেলে তারা সন্তর্পণে ভেলা নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

দুর্গন্ধে ভরা ঘন জলটা তেলের মতো দেখতে। লগিগুলো যেখানে জলের উপর পড়ছে সেখানে উঠছে বাষ্পের বুদ্বুদ। নলখাগড়ার সবুজ দেয়ালের ধারে ধারে পচ ধরে লালচে-খয়েরী রং ফুটেছে। চারিদিকে কোথাও এতটুকু শুকনো জায়গা নেই। ভ্যাপসা গরমে সবাই জীর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড রোদে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার দিকে সুরু হল অজস্র পোকার কামড়। জলের উপরে মাথা তোলা একটা টিলা পাওয়া গেলে সবাই খুসি হত। পোকার হাত থেকে বাঁচার জন্য সেখানে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া করা যাবে। বাতাস বইতে সুরু করলে সব কিছু অনেক সহজ হয়ে গেল। পোকা সব গেল উড়ে। এতদিনের রাতভর কঠোর পরিশ্রমের পর বাতাসের ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় সবাই আরামে ঘুমতে পারল। নলখাগড়ার ঝোপ বাতাসে মাথা নোয়াল। সেই বিরাট সবুজ সমুদ্রের বুকে জেগে উঠল একের পর এক ঢেউ।

নোংরা জল আর পচ ধরা গাছগাছড়া সব জাতের সরীসৃপে ভরা। দৈত্যের মতো সব কুমীর চড়ায় ভীড় করে আছে, নয়ত উঁকি মারছে সবুজ দেয়ালের ফাঁক দিয়ে। গাগুলো তাদের নলখাগড়ায় আধখানা ঢাকা। রাত্তিরে তাদের চাপা, গুরুগম্ভীর ডাকে লোকের পিলে চমকে যায়। কুমীরের গর্জনে কোন রাগ বা হিংস্রভাব নেই — কিন্তু অন্ধকার

---

* এম্‌বাগ — হের্মিনেরা এলাফ্রক্সিলন, কুড়ি ফুট উঁচু একজাতীয় নলখাগড়া।

রাত্রে শান্ত জলের বুকের উপর ছড়িয়ে পড়া সেই চাপা ছাড়া ছাড়া আওয়াজের কেমন একটা হৃদয়হীন নিঃস্পৃহ কঠোরতার ভাব আছে।

পথে যেতে একটা অগভীর জলাশয় পড়ল। তার ভিতরে কতগুলো আধ ধোওয়া, হাত দেড়েক উঁচু পলিজমা ঢিবি, তল থেকে ক্রমশ ছুঁচলো হয়ে উঠেছে। খয়েরী জলে সাংঘাতিক দুর্গন্ধ। ঢিবিগুলো পাখির আবর্জনায় ভরা। নিগ্রোরা জানাল, এখানে বিরাট গোলাপী রং ফ্ল্যামিংগোদের আস্তানা। বিশেষ কালে জলাভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যামিংগো পাওয়া যায়।

যাত্রীদের কয়েকজন, বিশেষ করে লিবীয়ার লোকেরা, সেই খারাপ জল আর বিষাক্ত বাষ্পে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সাংঘাতিক জ্বরে তারা ভেলার উপর অসহায়ভাবে শুয়ে পড়ল অন্যদের পায়ের কাছে।

পাঁচ দিনের দিন দেখা গেল পরিষ্কার জল, তার ভিতর থেকে মাথা তুলে রয়েছে বড় বড় গাছ। পান্দিওন অবাক হয়ে ব্যাপারটা কী জিজ্ঞেস করতে কিদগো একমুখ হেসে জানাল তাদের কষ্টের পালা প্রায় শেষ হয়ে এল।

জলের ভিতর লগিটা ঠেলে দিয়ে কিদগো বলল, 'গ্রীষ্মকালে এখানে সবকিছু পুড়ে শুকিয়ে যায়। বর্ষার পর আসে বন্যা।'

পান্দিওন জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোন নদী?'

'এখানে একটা নয় দুটো নদী* রয়েছে, তাদের মাঝখানে অনেক লম্বা জলার ফালি। গ্রীষ্মকালে কোথাও বলতে গেলে একফোঁটা জলও থাকে না।'

শেষের এই কয়দিন কিদগো সবসময় ঠিক খবরই দিয়েছে। এবারও তার অন্যথা হল না। কিছুক্ষণ পরেই ভেলাগুলো জলার পলিমাটিতে ঠেকে গেল। দেখা গেল সামনে মাটি ক্রমশ উপরে উঠে গিয়ে একটা সমান প্রান্তরে গিয়ে মিশেছে। প্রান্তরটা বিশেষ এক জাতের রুপোলি শীষ্ ঘাসে ভরা। রোদ পড়লে মনে হয় যেন জল। যাত্রীরা স্বস্তির

---

* বাহ্‌র এল আরব আর বাহ্‌র এল গজল। নদীদুটোতে প্রাচীন কালে এখনকার চেয়ে অনেক বেশি জল ছিল।

নিঃশ্বাস ফেলে কোমর অবধি কাদা ঠেলে চেঁচিয়ে কুমীর তাড়িয়ে শক্ত উত্তপ্ত মাটিতে নেমে এল। মাটিতে নেমে তারা শুকনো তাজা হাওয়ার স্পর্শ পেল, সে হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে গেল জলার দুর্গন্ধ। একটা উঁচু জায়গায় সবাই উঠে এল। সেখানে নীলচে-সবুজ পাতাওয়ালা একরকম ঝোপ। তাতে আবার ডিমের মতো বড় এক জাতের কমলা-রঙ ফল।

ভাল জলও পাওয়া গেল। ঠিক হল এখানেই ছাউনি ফেলা হবে। ছাউনির চারদিকে ছহাত উঁচু একটা কাঁটাবেড়া দেওয়া হল। নিগ্রোরা অনেক কমলা-রঙা ফল জোগাড় করে ফেলল। ফলগুলো বেশ নরম, খেতেও ভাল। তাছাড়া এক জাতের পাতাও নিয়ে এল। তার রস দিয়ে জ্বরো রুগীদের চিকিৎসা করা হল। যারা সুস্থ সবল তারা প্রাণপণ ঘুমিয়ে শক্তিসঞ্চয় করে নিল। জলার পোকার কামড়ে যে সব ঘা হয়েছিল সেগুলোও শীগ্‌গীর গেল শুকিয়ে। পর পর কয় দিন বৃষ্টি হয়নি। সকালবেলায় বেশ ঠাণ্ডা। দলের নিগ্রোরা তার ফলে বড় কষ্ট পেল।

কয়েক দিন পরেই আবার যাত্রা সুরু।

পঁচিশ দিন ধরে তারা প্রান্তরের বুকে হেঁটে চলল। এখন দলে উনিশজন লোক। আটজন জলা পেরবার পর উত্তরমুখে তাদের বাড়ির দিকে চলে গেছে। পেঁছিতে তাদের দিন দশেকের বেশি লাগবে না। অন্যদেরও তাদের সঙ্গে আসার জন্য তারা অনেক পীড়াপীড়ি করেছিল। কিন্তু অন্যরা তখন সমুদ্রতীরে পেঁছিতে ব্যগ্র বদ্ধপরিকর।

উজ্জ্বল আকাশের গায়ে একটা পাৎলা ধূসর পর্দা। রাত্রে প্রায়ই ঘন মেঘে আকাশ ঢেকে যায়। সারা প্রান্তরে ওঠে মেঘগর্জনের অবিরাম ভয়ংকর প্রতিধ্বনি। কিন্তু রাতের অন্ধকার ভেদ করে এতটুকু বিদ্যুৎচমক দেখা যায় না। শুকনো ঘাস আর গরমে ফাটল ধরা মাটির গায়ে এক ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ে না।

সারা সমতল জুড়ে ছোট টিলা। কোনটা উপরের দিকে ক্রমশ ছুঁচলো হয়ে গেছে, কোনটার গোল মাথা — দশ হাত উঁচু স্তম্ভের মতো খাড়া উঠে গেছে। শক্ত ইঁটের মতো মাটির সেই টিলাগুলো পিঁপড়েজাতীয় পোকায় ভরা। তাদের শক্ত দাড়া অত্যন্ত ভয়াবহ।

নানা জাতের জীবজন্তু দেখে পান্দিওন এতদিন বেশ অভ্যস্ত। একসঙ্গে হাজার হাজার হাতি বা জিরাফ দেখে এখন আর সে অবাক হয় না। এক জাতের অদ্ভুত সাদা কালো ডোরাকাটা জন্তুও সে দেখেছে। এনিয়াদার ঘোড়ার মতোই দেখতে, তবে একটু ছোট, পাগুলো সরু সরু অথচ দেহটা চওড়া; পিছনটা বেঁকে পিঠের সঙ্গে মিশেছে, উপরের ঠোঁটের বাঁকা ভঙ্গীটা বড় সুন্দর। বেঁটে ল্যাজ আর কেশর। জল খাওয়ার জায়গায় এই জন্তুর পালের দিকে পান্দিওন কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে থাকে। ইচ্ছে হয় ডোরাকাটা ঘোড়া কয়েকটা ধরে সেগুলোকে সওয়ারির জন্য তৈরি করে নেয়। কিদগো আর অন্য নিগ্রোদের সে কথা জানাতে তারা তো হেসেই অস্থির। তারা বলল, ডোরাকাটা জন্তুগুলো অত্যন্ত বদমেজাজী, কিছুতেই পোষ মানে না। শান্তশিষ্ট দু-একটাকে হয়ত ধরা যেতেও পারে, কিন্তু তাদের যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দুডজন ধরতে হলে বছর দশেকও যথেষ্ট নয়।

আরেক বার পান্দিওন হতাশ হল মহিষের দলের সঙ্গে দেখা হবার পর। চওড়া, পিছন দিকে বাঁকা শিং মহিষগুলোর বিরাট কালো শরীর দেখে একটার কাছে চুপি চুপি এগিয়ে গিয়েছিল বর্শা বাগিয়ে। কিদগো তাড়াতাড়ি পান্দিওনের উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে চেপে ধরে রাখে। পান্দিওনকে জানায় দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে ভীষণ জন্তু নাকি মহিষ। একমাত্র তীর ধনুক বা বর্শা দিয়েই তাদের শিকার করা সম্ভব। কিদগোর কথামত পান্দিওন তখন অন্যদের সঙ্গে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু তবু মহিষকে এত ভয় পাওয়ার কারণটা কিছুতেই তার মাথায় ঢোকে না। তার ধারণা গণ্ডার বা হাতি আরো অনেক ভয়ানক।

পথে প্রায়ই পাথুরে পাহাড়, পাহাড়শ্রেণী বা ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের ঢিবি পড়ল। এই সব জায়গায় প্রায়ই দেখা মিলল বেবুণের। কুকুরের মতো মাথা, বিশ্রী দেখতে জন্তুগুলো। যাত্রীরা এগিয়ে আসতে তারা পাথরের উপর উঠে নয়ত গাছের তলায় ভীড় করে নির্ভয়ে তাদের দিকে চেয়ে নানারকম বিশ্রী মুখভঙ্গী করতে থাকে। তাদের সেই নীল ঝোলা

গাল কুকুরের মতো মুখ, তাতে ঘন খাড়া খাড়া লোম, আবার লাল ছোপওয়ালা পিছন নাড়া দেখে পান্দিওনের ঘেন্না করতে লাগল। বেবুণ বড় হিংস্র। একবার তিনটে বেবুণ এসে কাভির পথ জুড়ে দাঁড়ায়, কাভি তার একটাকে বর্শার ঘা লাগায়। তখনি পাহাড়ের পায়ের কাছে সুরু হয়ে যায় সাংঘাতিক লড়াই। ভাগ্যক্রমে যাত্রীদের কাউকে খোয়াতে হয়নি, কিন্তু তবু যত দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পিছু হটে যেতে হয়েছিল।

পঁচিশ দিনের দিন এই ধীরে ধীরে উঠে যাওয়া অঞ্চলের গায়ে একেবারে দিগন্তের কাছে দেখা দিল একটা কালো রেখা। রেখাটার দিকে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিদগো আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। ঐ রেখাটাই হচ্ছে বিরাট বন। ওটাই তাদের শেষ বাধা। ঘন জঙ্গলে ভরা পাহাড়টা পেরলেই পাওয়া যাবে বহু প্রত্যাশিত সমুদ্র, দেশে ফেরার নির্ভরযোগ্য পথ।

দুপুরবেলা সবাই একটা তালবনে এসে পেঁছিল। গাছগুলোর অদ্ভুত চেহারা দেখে পান্দিওন অবাক। প্রান্তরে এই তারা প্রথম তালগাছ পেল। গাছগুলো অনেকটা আইগিপ্তসের খেজুর গাছের মতো দেখতে। প্রতিটি দীর্ঘ ঋজু কাণ্ড যেন তার নিজেরই মাথার তারার মতো ছায়ার কেন্দ্র থেকে উঠেছে। কালো ছায়ার মাঝখানের শুকনো মাটি যেন উত্তপ্ত ধাতু। অদ্ভুত ছায়া দেখে পান্দিওন বুঝতে পারল মাঝদুপুরে সূর্য থাকে মাথার উপর। কাভিকে ব্যাপারটা সে জানাল। কাভি তা বুঝতে না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল। কিদগো কিন্তু বলল কথাটা ঠিক। যতই দক্ষিণে এগোন যায়, সূর্য ততই উঁচুতে উঠতে থাকে। কিন্তু কারণটা কেউ বুঝতে পারল না। বুড়োরা বলল, পুরাণে বলে আরো অনেক দক্ষিণে গিয়ে সূর্য আবার নিচে নেমে এসেছে।

এ নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ পান্দিওনের ছিল না — তার ক্লান্ত সঙ্গীরা তখন তেষ্টার তাড়ায় জলের দিকে ছুটেছে। দুপুরের বিশ্রামের সময় কিদগো জানাল, সন্ধ্যার দিকে তারা বনের গাছের কাছে পেঁছিবে। তারপর তাদের চলতে হবে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছড়ান বন আর পাহাড়ের ভিতর দিয়ে।

‘ঐ দিকে,’ ডান দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে কিদগো বলল, ‘আর ঐ দিকে,’ এবার সে দেখিয়ে দিল বাঁ দিকটা, ‘বড় নদী রয়েছে, কিন্তু নদী ধরে এগোবার উপায় নেই। ডান দিকের নদীটা* পড়েছে উত্তরের মরুভূমির ধারে যে বিরাট মিষ্টি জলের সাগর রয়েছে, তাতে। বাঁ দিকেরটা** গেছে দক্ষিণে। আমরা যেখানে যেতে চাই তার চেয়ে বহুদূরে। তাছাড়া নদীর ধারে সব দুর্ধর্ষ উপজাতির বাস। তারা মানুষ খায়। তাদের হাতে পড়লে আমরা সকলেই মারা পড়ব। আমরা ঠিক নদী দুটোর মাঝখান দিয়ে সোজা নাক বরাবর এগোব। ঘন বনটায় কোন জনমানুষ নেই, বেশ নিরাপদ। পাহাড়েও কেউ থাকে না, কারণ বাজ আর ঘন জঙ্গলকে সবাই ভয় পায়। জীবজন্তু অবশ্য খুবই কম, তবে আমরাও তো বেশি লোক নই। ফল পাকুড় পেড়ে আর শিকার করে দিব্যি পেট চালাতে পারব।’

সামনের অন্ধকার বনটার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে পান্দিওন, কাভি আর লিবীয়ার লোকেদের মনে একটা অজানা ভয় দেখা দিল।

---

* বর্তমান শারি।

** উবাংগি — কঙ্গোর প্রধান উপনদী।
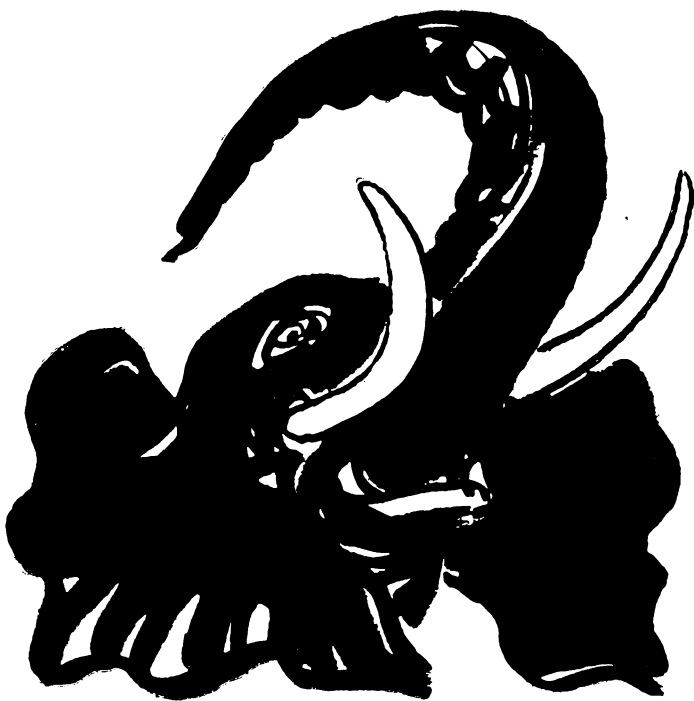
বনের শক্তি

ঘন ঝোপের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে অত্যন্ত অদ্ভুত সব গাছ। গুঁড়িগুলো সরু। তাতে গোল গোল গাঁট। মাথায় পাখার আকারের ছোট ছোট ডালের সমষ্টি। তাতে বড় বড় পাতা। তার উপরে উঠে আছে দশ হাত লম্বা সবুজ তলোয়ারের মতো শুঁড়।*

---

* লোবেলিয়াস।

বনের ধারে দুপাশে দুটো করে এই জাতীয় গাছ খাড়া তলোয়ার উ'চিয়ে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। যাত্রীরা তাদের মধ্যে দিয়ে কাঁটাঝোপের ভিতরে পথ করে এগিয়ে গেল। একটা মস্ত শুয়োর লম্বা বাঁকা দাঁত আর বিশ্রী মাথা নিয়ে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে রেগে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল। তারপর আবার লুকিয়ে পড়ল ...

কাভির হাতে একটা লাঠি ছিল। তার গায়ে দাগ কেটে সে যাত্রার দিনের হিসাব রাখত। বনে ঢোকার প্রথম দিনেই সে লাঠিটা গেল হারিয়ে। তার ফলে সময়ের হিসেব আর রইল না। বিরাট একঘেয়ে বনটা পান্দিওনের স্মৃতির উপর চিরকালের জন্য বোঝার মতো চেপে রইল।

সবাই নীরবে হে'টে চলেছে। কেউ একটা কোন কথা বললেই মাথার উপরের সবুজ খিলানে তার প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি ওঠে। বিরাট বিস্তৃত সোনালি প্রান্তরে কখনো তারা মানুষের এমন নগণ্যতা অনুভব করেনি। বনে এসে তারা যেন হারিয়ে গেল অজানা দেশের গভীরে। প্রায় মানুষের শরীরের সমান গুঁড়িওয়ালা লতা বড় গাছের মসৃণ গা বেয়ে পাক খেয়ে উপরে উঠে গেছে। তারপর বিরাট বিরাট জালের সৃষ্টি করে পর্দা বা আলাদা ফাঁসের মতো আবার নেমে এসেছে। গাছগুলো অনেক উ'চুতে উঠে তবে ডালপালা মেলেছে। অত উ'চুতে গুঁড়িগুলো ধূসর গোধূলি আলোয় মিলিয়ে গেছে। শ্যাওলায় ভরা পচা জলও মাঝে মাঝে পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে। কখনো কখনো দেখা যায় কালো নিঃশব্দ জলস্রোত। খোলা জায়গা পাওয়া গেল খুব কমই, বনের অন্ধকারের পর সেখানে এসে রোদে সবার চোখ গেল ধাঁধিয়ে। তাছাড়া ঘন ঝোপঝাড়ের জন্য পথিকদের এই জায়গাগুলো এড়িয়ে চলতে হল। চার মানুষ লম্বা ফার্ণ* বিরাট ডানার মতো ছড়িয়ে দিয়েছে ফ্যাকাশে সবুজ পালকের মতো পাতা। এরকম ফার্ণ পান্দিওনরা আগে কখনো দেখেনি। মিমোসার কাটা কাটা ধূসর পাতা সূর্যের আলোয় গড়ে তুলেছে সুন্দর সূক্ষ্ম নক্সা। কতরকম ফুল — টকটকে লাল, কমলা,

---

* সাইথিয়া আর টোডিয়া গ্রেপ ফার্ণ, ত্রিশ ফুটেরও বেশি লম্বা হয়।

বেগুনে, সাদা — ফুটে রয়েছে সব জাতের হালকা সবুজ পাতার পটভূমিকায়: কোনটা বড়, কোনটা চওড়া, কোনটা বা লম্বা সরু, সমান সাধারণ আকারের বা দাঁত দাঁত খাঁজ কাটা। গাছপালার জড়াজড়ি আরো গোলমেলে হয়ে উঠেছে পাক খেয়ে উপরে উঠে যাওয়া লতার দৌলতে। বড় বড় কাঁটায় যাত্রীদের গা ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে। খোলা জায়গা জুড়ে পাখপাখালির এমন চীৎকার চেঁচামেচি গোলমাল যে মনে হচ্ছে বনের সব প্রাণী বুঝি এই মাঠগুলোতেই আশ্রয় নিয়েছে।

সূর্য দেখে দিক ঠিক করে নিয়ে যাত্রীরা আবার প্রবেশ করল বনের গোধূলি আলোয়। বৃষ্টির জলের খোয়াই আর নদীর খাত দিয়েই তারা দিক নির্ধারণ করেছে। ঘন পাতার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে এসে পড়েছে বাঁকা রোদ, তা থেকে আবার দিক বুঝে নিচ্ছে তারা। পথপ্রদর্শকরা আরেকটা কারণেও খোলা জায়গা ছেড়ে বনে ঢুকতে ব্যগ্র: কাছের গাছগুলোয় নানারকম সব মারাত্মক পোকা মাকড় কালো ভীমরুল আর বড় পিঁপড়ের বাসা। বড় বড় শ্যাওলা, ধূসর চামড়ার মতো বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতিতে গাছের গুঁড়ি ঢেকে আছে। বিরাট শিকড়গুলো সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা। চ্যাপ্টা শিকড়গুলোর কোন কোনটা পাঁচছ' হাত উঁচু। গাছের গা থেকে তারা সাপের মতো বেরিয়ে আছে। উনিশ জনের পুরো দলটা আশ্রয় নিতে পারে তাদের মাঝখানকার নিচু জায়গায়। ঝুরির বাধায় পথ চলা মুশকিল। যাত্রীদের কখনো ঝুরি বেয়ে উঠতে হল, কখনো বা ঘুরে যেতে হল পাক দিয়ে, পার হতে হল লম্বা ফাঁকা জায়গা। আধপচা পাতা আর ডালপালার নরম গালিচায় তাদের পা ডুবে যায়। সাদাটে ব্যাঙের ছাতার গোছা থেকে মড়ার গায়ের গন্ধ বেরচ্ছে। যেখানে গাছগুলো অত বড় নয়, পথ আটকে দাঁড়িয়ে নেই শিকড়, কেবল সেখানে এসে নরম শ্যাওলা-ঢাকা মাটিতে পা ফেলে যাত্রীরা পাগুলোকে জিরিয়ে নেয়। কিন্তু সে সব জায়গায় আবার ভীষণ কাঁটা ঝোপ এগোতে হলে তাদের বেড় দিয়ে এড়িয়ে যেতে হয় নয়ত পথ করতে হয় জঙ্গল কেটে। তাতে আবার সময় আর শক্তি ক্ষয়। গাছের গা থেকে আবার থেকে থেকেই এক ধরনের ছিটকাটা খোলাছাড়া শামুক যাত্রীদের গায়ে পিঠে পড়ে। তাদের

বিষাক্ত রসে জ্বালা করে ওঠে। কদাচিৎ কখনো আবার বনের আধান্ধকারে দেখা যায় জন্তুর ছায়া। কিন্তু সে ছায়া এত তাড়াতাড়ি আর নিঃশব্দে মিলিয়ে যায় যে কী জন্তু তা বোঝা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। রাত্রের একটানা গভীর নৈঃশব্দ্যে হঠাৎ ছেদ পড়ে কোন অজানা হিংস্র জন্তুর বিষণ্ণ কান্নায় বা অজানা পাখির তীব্র চীৎকারে।

অনেকগুলো অনুচ্চ টিলার সারি পার হয়ে যাত্রীদের এগোতে হল। কিন্তু গাছের সারিতে কোথাও ছেদ নেই। টিলার সারির মাঝখানে বরং বন আরো ঘন। উপত্যকার ভেজা ঘন হাওয়ায় আর পচধরা গাছপালার গন্ধে নিঃশ্বাস নেওয়া কঠিন।

অবশেষে বড় বড় পাথরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা খরস্রোত ঠাণ্ডা জলের ছোট্ট নদীর উপত্যকা পার হয়ে সবাই জিরিয়ে নেবার জন্য বসে পড়ল।

তার পর সুরু হল আবার চড়াইয়ের দীর্ঘ পথ।

দুদিন ধরে চলল চড়াই। বন ক্রমশ আরো ঘন হয়ে উঠেছে। খাবার পাওয়া যেতে পারে এমন খোলা জায়গা আর কোথাও দেখা গেল না। তারোপর পথ আটকে পড়ে রয়েছে ঝড়ে পড়া গাছ। উপর থেকে ঝুলে পড়া কাঁটার পর্দার মতো পাৎলা ডাল আর দুর্ভেদ্য ঝোপঝাড় এড়িয়ে গিয়ে যাত্রীরা টিলার গায়ে বৃষ্টির খাত ধরে হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে চলল।

তাদের হাত আর পায়ের চাপে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে যেতে লাগল শক্ত মাটি। শুকনো জলের খাতে দিক বুঝে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকল তারা গোলকধাঁধার মতো এই পথে ঘুরে ঘুরে।

ক্রমশ হাওয়া আরো ঠাণ্ডা হয়ে এল। যেন সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে গভীর স্যাঁতসেঁতে কোন মাটির নিচের ঘরে।

ঢালুর মাথায় উঠতে উঠতে গভীর অন্ধকার হয়ে গেল। যাত্রীরা নিশ্চয় এসে পেঁছেছে একটা মালভূমির প্রান্তে। বৃষ্টিজলের খাত আর নেই। পাছে দিক হারিয়ে যায় তাই ঠিক হল রাতটা এখানেই কাটাবে। পাতার ঘন আবরণ ভেদ করে একটা তারার আলোও দেখা যায় না।

অনেক উঁচুতে কোথাও শোনা যায় বাতাসের দুরন্ত আওয়াজ। পান্দিওনের অনেকক্ষণ ঘুম এল না। চুপ করে শুয়ে বনের গর্জন শুনতে শুনতে তার মনে পড়ে গেল সমুদ্রের ডাক। পাতার মর্মর, দুরন্ত হাওয়ায় ডালের ঝটাপটি — সব মিলে মিশে সৃষ্টি হল এক বিরাট গর্জন। তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের নিয়মিত ছন্দের সঙ্গে তার মিল।

ভোর হল অনেক দেরীতে। ঘন কুয়াশা ভেদ করতে সময় লাগল সূর্যরশ্মির। অবশেষে অদৃশ্য সূর্যের হাতে পরাস্ত হল বনের গোধূলি। প্রকাশ হয়ে পড়ল এক বিষণ্ণ দৃশ্য।

শ'দেড়েক হাত উঁচু বিরাট গাছের সাদা কালো মসৃণ গুঁড়ি ঘন সাদা কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। শ্যাওলায় ঢাকা ডালগুলো একেবারেই লুপ্ত। গাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়েছে জলে ভেজা শ্যাওলা আর ব্যাঙের ছাতা দীর্ঘ কালো জটা বা লম্বা দাড়ির মতো। কখনো কখনো মাটির অনেক উঁচুতে তারা বাতাসে এদিক থেকে ওদিক দুলছে। শ্যাওলা ঘাস আর বাঁকা শিকড়ের নরম ভেজা জালিকাজের গা বেয়ে যে জল বেরিয়ে জমে রয়েছে পায়ের চাপে তা চলকে পড়ছে। চওড়াপাতাওয়ালা ঘন ঝোপের ফলে পথ চলা দুষ্কর। বড় বড় ম্লান রং নক্সা তোলা ফুলগুলো দীর্ঘ বৃন্তের মাথায় কুয়াশায় ধীরে ধীরে দুলছে।

চার হাত বেড়ের কালো সাদা স্তম্ভগুলো ভিড় করে দাঁড়িয়ে। ধূসর কুয়াশা তাদের পাক দিচ্ছে, গা থেকে নেমেছে পাতলা জলের স্রোত। কোন কোন গাছের গুঁড়ি জলভেজা ঘন শ্যাওলায় ঢাকা। এই ভয়ানক বনে ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরে কিছুই দেখা যায় না। দৈত্যের মতো গাছগুলোর তল দিয়ে পথ কেটে যাত্রীরা এগচ্ছে।

ঝড়ে পড়া গাছের গাদা দেখে খুব শক্তসমর্থ অভিজ্ঞ যাত্রীরাও হতাশ হয়ে পড়ল। সবচেয়ে খারাপ হল দিক ঠিক করার অসুবিধা।

বনের এই অবিশ্বাস্য শক্তিতে ভীত নিগ্রোরা ঠান্ডা কুয়াশায় কাঁপতে লাগল। লিবীয়ার লোকেরা তো হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়েছে। সবার মনে হল নিশ্চয় তারা পৌঁছেছে বনদেবতাদের রাজ্যে। সেখানে মানুষের প্রবেশ নিষেধ, কাজেই বেরবার পথ আর পাওয়া যাবে না।

কাভি পান্দিওনের প্রতি ইসারা করতে দুজনে বড় ছুরি নিয়ে পাগলের মতো ভেজা ডাল কেটে পথ করতে লেগে গেল। ক্রমশ অন্যরাও এগিয়ে এসে পালা করে ডাল কাটতে সুরু করল। কখনো তারা উপড়ে হওয়া গাছের বিরাট গুঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে কখনো বা বিরাট বিরাট শিকড়ের মধ্যে দিয়ে পথের সন্ধানে এগিয়ে যায়, আবার এসে পড়ে ঘন সবুজ জঙ্গলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। মাথার উপর সেই একই আবছা অস্পষ্টতা। গাছের গা থেকে সারাক্ষণ ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে। বাতাস সমানই ঠাণ্ডা। কেবল কুয়াশার গায়ে ধূসর লাল আভা দেখে বোঝা যায় সন্ধ্যা আসছে...

'কোন দিকেই কোন পথ নেই!' হতাশায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল কিদগো একটা শিকড়ের উপর। আরো দুজন পথপ্রদর্শক কিছু আগে ঠিক ঐ খবর নিয়েই ফিরেছে।

কাটা পথটার সামনে প্রায় হাজার খানেক হাত জুড়ে একটা সরু খোলা জায়গা। যাত্রীদের পিছনে অন্ধকার বিরাট বন, গত তিন দিনের অমানুষিক পরিশ্রমের পর বনটা তারা পেরিয়ে এসেছে। সামনে খোলা জায়গার ওধারে দুর্ভেদ্য বাঁশবন। চকচকে গাঁটওয়ালা বাঁশ কুড়ি হাত উঁচুতে উঠে সুন্দর ভঙ্গীতে পাৎলা পালকের মতো মাথা নোয়াচ্ছে। দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে বর্শার ডাণ্ডার মতো ঋজু গাঁটওয়ালা বাঁশগাছের ঘন বন। চকচকে মসৃণ গুঁড়ি এত শক্ত যে প্রথম ঘায়েই যাত্রীদের ব্রোঞ্জের ছুরি গেল ভোঁতা হয়ে। কুড়ুল বা বড় তলোয়ার ছাড়া এই প্রাচীর ভেদ করার উপায় নেই। বাঁশবনটাকে ঘুরে যাবারও কোন পথ আছে বলে মনে হল না। খোলা জায়গার সীমানায় ঘন ঝোপঝাড়। বাঁশের ঝাড় আবার দুদিকে ছড়িয়ে পড়ে বহুদূরে মিলিয়ে গেছে কুয়াশাঢাকা মালভূমির বুকে।

শক্তসমর্থ যাত্রীরা ঠাণ্ডায়, যথেষ্ট খাবারের অভাবে আর ভীষণ বনের সঙ্গে লড়াই করে অবসন্ন। শেষ কয়দিনের যাত্রার পর তারা ভেঙে পড়েছে। কিন্তু ফিরে যাবার কথা তারা ভাবতেই পারে না।

ঐ ভীষণ বনটা পার হতে হলে আগেকার মতো দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে শুধু এগোলেই চলবে না। ঘন গাছপালার মধ্যে যেমন তেমন ভাবে কোনরকমে পথ করে চলেও কোন লাভ নেই। কোনখানে পথ কাটা দরকার সেটাই জানতে হবে। যারা এ বনে বাস করে একমাত্র তারাই ঠিক পথ বাতলে দিতে পারে। কিন্তু কোন মানুষের সন্ধান এতক্ষণ তারা পায়নি। বেশি খোঁজ করতে গেলে আবার উঠতে হতে পারে নরখাদকদের চুল্লীতে।

প্রত্যেকের হতাশা আর নীরব আত্মসমর্পণের অভিব্যক্তিতে ভরা গম্ভীর মুখে ফুটে উঠেছে 'আর পারি না' গোছের ভাব।

হতাশার প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠে কিদগো মাথা তুলে তাকাল শ'খানেক হাত উঁচু বিরাট গাছগুলোর ডগার দিকে। তার মনের ভাবটা বুঝতে পেরে পান্দিওন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।

গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে সে দেখল অনেক উঁচু পর্যন্ত গুঁড়িগুলো একেবারে সমান মসৃণ। কিদগোকে সে জিজ্ঞেস করল, 'বেয়ে ওঠা যাবে? তুমি কী বল?'

'সারাদিন লাগলেও উঠতে হবে', বিষণ্ণভাবে বলল কিদগো। 'হয় এগোতে হবে, নয় পেছতে। কিন্তু আর আন্দাজে পথ চলা চলবে না। খাবার নেই।'

একটা সাদা বাকলওয়ালা বিরাট গাছ খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে। আকাশের গায়ে তার বাঁকা ডালগুলো তারার আকারে ছড়ান। গাছটা দেখিয়ে পান্দিওন বলল, 'ঐ গাছটা থেকে অনেকদূর দেখা যাবে।'

কিদগো বলল:

'না, সাদা আর কালো বাকলওয়ালা গাছগুলো* কোন কাজের নয়। গাছগুলো লোহার মতো শক্ত। কাঠের খুঁটি তো দূরের কথা ছুরি পর্যন্ত বসান যায় না। লাল গুঁড়ি আর বড় পাতাওয়ালা গাছ পেলে ওঠা যাবে।'

---

* আফ্রিকার অনেক বড় গাছেরই যেমন ইবনি, আয়রনউড্, মাকারাংগা বা পলিস্কিয়াসের বাকল হয় কালো নয়ত সাদা।

সবাই বেরিয়ে পড়ল খোলা জায়গায় উপযুক্ত গাছের সন্ধানে। কিছুক্ষণ পরেই একজন চেঁচিয়ে উঠল — পেয়েছি, পেয়েছি। লোহার মতো শক্ত বিরাট গাছগুলোর তুলনায় গাছটা বেঁটে। কিন্তু বাঁশের প্রাচীর ঘেঁষে গাছটা বাঁশগাছের চেয়ে হাত পঞ্চাশেক উপরে উঠে গেছে। বহু কষ্টে দুটো বাঁশগাছ কেটে চিরে হাতখানেক লম্বা একদিক ছুঁচলো কতগুলো গোঁজ বানান হল। কিদগো আর ম্‌পাফু মোটা ডাল দিয়ে গাছের নরম গায়ে গোঁজ মেরে মেরে উপরে উঠতে লাগল। শেষকালে পাওয়া গেল গাছের গায়ে বেড় দিয়ে উপরে ওঠা লতা। তার সরু গুঁড়িতে নিজেদের বেঁধে নিয়ে কিদগো আর ম্‌পাফু গুঁড়ির গায়ে প্রাণপণে পা চেপে রেখে গাছের গা থেকে অনেক পিছনে হেলে পড়ে সেই বিরাট উঁচু গাছ বেয়ে অসম্ভব উপরে উঠতে লাগল। কিছু পরেই আকাশের ঘন মেঘের গায়ে তাদের শরীরদুটো কালো ফোঁটায় পরিণত হল। হঠাৎ পান্দিওনের বড় হিংসে হতে লাগল — ওরা কত উপরে উঠে গেছে, বিরাট জগতটাকে দেখতে পাচ্ছে অথচ সে কিনা বৃষ্টির খাতের লালচে নীল কেঁচোর মতো নিচের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ পান্দিওন মনস্থির করে গাছের গায়ে বসানো একটা বাঁশের গোঁজ চেপে ধরল। কাভির মানা সে শুনল না। তাড়াতাড়ি গাছ বেয়ে উঠে গিয়ে একটা পাক দেওয়া লতা জড়িয়ে ধরল। মাথার উপরে ঝুলে পড়া অন্য পাৎলা লতার ডগাটা কেটে নিয়ে সে কিদগোর আদর্শ অনুসরণ করল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে দেখতে পেল ব্যাপারটা মোটেই সহজসাধ্য নয়। শক্ত লতা তার পিঠে কেটে বসে যাচ্ছে। তারোপর চাপ একটু কম দিলেই পা হড়কে যায়। গাছের রুক্ষ গায়ে হাঁটু যায় ছড়ে। বহুকষ্টে পান্দিওন গুঁড়ির আধখানা উঠল। নিচে বাঁশগাছের পাখার আকারের মাথাগুলো দুলছে অসমান পীতসমুদ্রের মতো। কিন্তু প্রথম বড় ডালটা তখনো অনেক উঁচুতে। উপর থেকে সে কিদগোর চীৎকার শুনতে পেল। তারপর তার কাঁধের উপর এসে পড়ল শক্ত লতার একটা ফাঁস। ফাঁসটা পান্দিওন দুবগলে গলিয়ে নিল। কিদগোরা তাকে আস্তে আস্তে উপর থেকে টেনে সাহায্য করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই পান্দিওন

তলের বড় ডালগুলোয় পেঁাছে গেল। পা ছড়ে গেছে, অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছে, কিন্তু তবু তার আনন্দ ধরে না। কিদগো আর তার সঙ্গী তখন ঐখানেই দুটো ডালের উপর আরাম করে বসে।

আশি হাত উঁচুতে উঠে পান্দিওন বহুদিন পর এই প্রথম দূর দিগন্তের দেখা পেল। উঁচু মালভূমির বুকে, ডাইনে বাঁয়ে যতদূর চোখ যায় বনটাকে বেড় দিয়ে বাঁশবন। প্রস্থে কিন্তু বাঁশবনটা চার পাঁচ হাজার হাতের বেশি হবে না। তার পিছনে কালো পাথরের সারি। পাথরগুলো তেমন উঁচু নয়। ঢালু পাহাড়ের শাখার মতো সারিটা পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে। একেকটা ঢিবির মাঝখানে ফাঁক। তার ওপারে মাটি আবার ধীরে ধীরে একটু নেমে গেছে। শক্ত সবুজ মেঘের মতো ঘন গাছে ঢাকা পাহাড়। তার ফাঁকে ফাঁকে কুণ্ডুলীপাকান ঘন কুয়াশায় ভরা সংকীর্ণ খাত। সেখানেই রয়েছে দিনের পর দিন ক্ষুধার্ত পেটে আলো আঁধারির মধ্যে দিয়ে বহুকষ্ট সয়ে পথ হাঁটা। পান্দিওনদের ঐ একই দিকেই আবার যেতে হবে। শক্ত সবুজ প্রাচীরের মাথায় সাদা কুয়াশার ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ। প্রাচীরের গায়ে কোথাও কোন ছিদ্র নেই, নেই কোন মাঠ বা চওড়া উপত্যকা। অতটা যাবার শক্তিও যাত্রীদের আছে কিনা সন্দেহ। অথচ হয়ত দিগন্তের ঐ আবছা কুয়াশার ওপারেও দেখা যাবে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। তবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আর রক্ষা থাকবে না।

নিচের বিস্তৃত মাটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে কিদগোর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল পান্দিওনের। কিদগোর বেরিয়ে আসা চোখে পান্দিওন দেখতে পেল অসীম ক্লান্তি আর ভয়ের ছায়া। কিদগোর অফুরন্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে তার মুখ বিষণ্ণ একটা ভঙ্গীতে কুঁচকে গেছে।

ক্লান্ত নিরস গলায় কিদগো বলল, 'পিছন ফিরে দেখতে হবে।' তারপর হঠাৎ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাঁশ গাছের মাথার উপর দিয়ে অনেক দূরে ছড়িয়ে যাওয়া একটা ডাল বেয়ে সে হেঁটে এগিয়ে গেল।

বহুকষ্টে পান্দিওন চেপে রাখল একটা ভয়ার্ত চীৎকার। কিদগো কিন্তু খুব সহজভাবেই অল্প টলে টলে একেবারে ডালের শেষ প্রান্তে গিয়ে পেঁাছল। তার ভারে ডালটা নুয়ে গেল, পাতাগুলো কেঁপে উঠল।

ভয়ে পান্দিওন কাঠ হয়ে উঠল, কিন্তু কিদগো দুপাশে পা ঝুলিয়ে ছোট ছোট ডালগুলো জোরে ধরে রেখে বসে পড়ল। তারপর খোলা জায়গার দক্ষিণ কোণের ওপারের অঞ্চলটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। বন্ধুকে অনুসরণ করার সাহস পান্দিওনের হল না। সে আর ম্‌পাফু দমবন্ধ করে বসে অপেক্ষা করে রইল কখন কিদগো ফিরে আসে। নিচের লোকদের উপর থেকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না, কিন্তু তারা ঐ সাহসীদের দিকেই তাকিয়ে।

দোদুল্যমান ডালটায় অনেকক্ষণ ধরে বসে থেকে কিদগো নীরবে ফিরে এল। করুণভাবে বলল:

'পথ না জানাটা বড় খারাপ ব্যাপার। অনেক সহজেই আমরা এখানে এসে পৌঁছতে পারতাম।' উত্তর-পশ্চিম দিকটা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে কিদগো বলল, 'ঐ দেখ, ঘাসের প্রান্তরটা। খুব বেশি দূরে নয়। বনে না ঢুকে আমাদের যাওয়া উচিত ছিল আরো ডাইনে... আবার প্রান্তরে ফিরে যেতে হবে। হয়ত ওখানে মানুষের বসতিও আছে — বনের ভিতরে বা সমতলের চেয়ে সাধারণত বনের ধারেই মানুষরা থাকে।'

গাছে ওঠার চেয়ে নামাটাই অনেক বেশি কষ্টকর ও বিপজ্জনক মনে হল। সঙ্গীদের সাহায্য ছাড়া পান্দিওন অত তাড়াতাড়ি নামতে পারত না, খুব সম্ভব পড়ে মরেই যেত। মাটিতে নামা মাত্রই তার হাঁটু কমজোর হয়ে এল। সে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তা দেখে তার সঙ্গীদের সে কী হাসি। গাছে চড়ে কিদগো কী দেখেছে তা সবাইকে জানাল। তারপর বলল পূর্বনির্দিষ্ট পথ ছেড়ে এবার এগোতে হবে সমকোণে। সবাই বুঝল বনের সঙ্গে লড়াইয়ে তারা পরাস্ত হয়েছে। অনেক সময়ও হয়ত নষ্ট হবে, কিন্তু তবু কেউ এতটুকু প্রতিবাদ করল না। তা দেখে পান্দিওন তাজ্জব হয়ে গেল। এমন কি একরোখা কাভিও চুপ, বনের সঙ্গে সেই তীব্র কঠোর সংগ্রামে সবাই যে কী কষ্ট ভোগ করেছে তা সে নিশ্চয় বোঝে।

পান্দিওনের মনে পড়ল যাত্রা সুরুর আগে কিদগো কী বলেছিল। এখন সে জানল, বনকে বেড় দিয়ে যাওয়া পথটা যেমন দীর্ঘ তেমনি বিপজ্জনক। বনের ধারে আর নদীতীরে দুর্ধর্ষ বন্যজাতির বাস। উনিশ জন যাত্রী তাদের কাছে কিছুই নয় ...

ঘাসের প্রান্তর ধীরে ধীরে নেমে গেছে নদীতীর পর্যন্ত। তার বুকে বাগানের মতো ছোট ছোট গাছ, সমান দূরত্বে ফাঁক ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। খরস্রোত নদীর দূর তীরে কালো পাথরের টিলা। তার দিকে নদীস্রোতে ভেসে আসছে কাঠের গাদা — রোদে শুকনো আর সাদা হয়ে যাওয়া গাছের গুঁড়ি, ডাল আর নলখাগড়া।

হাতির পালের আক্রমণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত একটা তালকুঞ্জ ঘুরে যাত্রীরা ছাউনি পাতল একটা ছোট গাছের নিচে। গাছের গা থেকে বেরন রজনের সুগন্ধ আর রেশমী বাকলের একঘেয়ে খসখস আওয়াজে ক্লান্ত যাত্রীদের চোখে ঘুম নেমে এল।

হঠাৎ কিদগো হাঁটু গেড়ে উঠে বসল। তার সঙ্গীরাও। নদীর তীর বেয়ে এগিয়ে আসছে একটা মস্ত হাতি। শুভলক্ষণ নয়। সবাই স্থির দৃষ্টিতে দেখতে লাগল হাতিটার মস্ত দুলকি চাল। নিজের মোটা চামড়ার ভিতরেই হাতিটা যেন ধীরে সুস্থে হেলে দুলে চলছে। যেমন তেমন অসাবধানভাবে শুঁড় দোলাতে দোলাতে হাতিটা কাছে এগিয়ে আসছে। হাতিদের নাক কান সবসময় খুবই সজাগ। সাধারণত হাতি খুবই সতর্ক প্রাণী। কিন্তু এ হাতিটার হাবেভাবে সেই সতর্কতার চিহ্ন নেই। হঠাৎ অনেকগুলো মানুষের গলা শুনেও হাতিটা মাথার পিছনে লেপ্টে থাকা বিরাট কানদুটো একটু তুললও না। হতভম্ব যাত্রীরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গেই আবার মাটিতে শুয়ে পড়ল যেন কারো হুকুম পেয়ে। হাতিটার সঙ্গে কয়েকজন লোকও রয়েছে। এতক্ষণে সবার চোখে পড়ল হাতিটার বিরাট গলার উপরে একজন লোক শুয়ে। হাতির মাথার পিছনে আড়াআড়িভাবে হাতদুটো চেপে ধরে রেখেছে লোকটি। হাতিটা সোজা জলে নেমে গাছের গুঁড়ির মতো বিরাট বিরাট পা দিয়ে জল ঘাঁটতে লাগল। তারপর হঠাৎ কানদুটো মেলে দিল, মাথাটা যেন সঙ্গে সঙ্গে তিনগুণ বেড়ে গেল। তার ক্ষুদে ক্ষুদে খয়েরী চোখদুটো চেয়ে রইল নদীর জলের দিকে। পিঠের লোকটা উঠে বসে হাতির ঢালু মাথায় জোর এক চড় কষিয়ে দিল। চারদিকে একটা চীৎকারের প্রতিধ্বনি উঠল 'হেইয়া'। হাতিটা শুঁড়

নেড়ে সঞ্চিত আবর্জনা থেকে একটা বড়সড় গোছের ভেসে আসা গাছের গুঁড়ি নিয়ে মাথার উপর তুলে নদীর মাঝখানে আছড়ে ফেলল। গুঁড়িটা সশব্দে জলের ভিতর ডুবে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার ভাঁটির স্রোতে ভেসে উঠল। আরো কয়েকটা কাঠ জলে ছুঁড়ে দিয়ে হাতিটা সাবধানে পা ফেলে নদীর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর স্রোতের উজানে মুখ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

হাতির সঙ্গে আটটি তরুণ তরুণী ছিল, তাদের প্রত্যেকেরই কালো রং। তারা হৈহৈ করে হেসে উঠে নদীর ঠাণ্ডা জলে ছুটে নেমে পড়ল। জলে তারা চেষ্টা করতে লাগল এক জন আরেক জনের পাশ কাটিয়ে যাবার। তাদের হাসি আর পরস্পরের ভেজা গায়ে চড় চাপড়ের আওয়াজের প্রতিধ্বনি উঠল চারদিকে।

হাতির পিঠের লোকটা ফুর্তিতে চেঁচাতে লাগল। সেই সঙ্গে ঠায় চেয়ে রইল নদীর দিকে। মাঝে মাঝে সে হাতিটাকে দিয়ে বড় বড় কাঠ জলের উপর ফেলতে লাগল।

যাত্রীরা অত্যন্ত অবাক হয়ে সবকিছু দেখছে। বিরাট হাতি আর মানুষের এই বন্ধুত্ব এক অলৌকিক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু ঐ তো মাত্র শ'তিনেক হাত দূরেই বিরাট ছাইরঙা দৈত্যটা কেমন মানুষের বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারায় আর শক্তিতে অদ্বিতীয়, বন ও প্রান্তরের অবিসংবাদিত অধিপতি এই ছ'হাত উঁচু বিরাট জন্তুটা যে কী করে মানুষের মতো দুর্বল তুচ্ছ প্রাণীর এমন বশ হল, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আফ্রিকার দৈত্যকে বশ করেছে এরা কারা?

কাভির চোখদুটো জ্বলে উঠেছে। কিদগোকে খোঁচা দিয়ে সে নীরবে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কী? সেই মজার খেলার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কিদগো কাভির কানে কানে বলল:

'ছেলেবেলাতে এ জাতের গল্প শুনেছি। শুনেছি বন যেখানে প্রান্তরের সঙ্গে মিশেছে সেখানে 'হাতি জাতি' বলে এক জাতের লোক বাস করে। এখন নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি গল্পটা সত্যি। হাতিটা দাঁড়িয়ে রয়েছে যারা স্নান করছে তাদের কুমীরের হাত থেকে বাঁচানর জন্য ... শুনেছি

এদের সঙ্গে আমাদের জাতের কুটুম্বিতাও আছে। এদের ভাষাও আমাদের সঙ্গে অনেকটা মেলে ...'

হাতির পিঠের লোকটার দিকে স্থির দৃষ্টে চেয়ে থেকে কাভি বলল, 'তুমি কি ওদের কাছে যেতে চাও নাকি?'

কিদগো তোৎলাতে তোৎলাতে বলল, 'ইচ্ছে তো করছে, কিন্তু জানি না ... ভাষা যদি এক হয় তবে আমাদের কথা ওরা বুঝতে পারবে। রাস্তা খুঁজে পাওয়ারও তবে একটা সুবিধা হতে পারে। কিন্তু ভাষা যদি এক না হয়, তবে ব্যাপারটা মোটেই ভাল হবে না — ওরা আমাদের ইঁদুরের মতো টিপে মেরে ফেলবে!'

কাভি একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'এরা কি মানুষ খায়?'

'শুনেছি খায় না। এরা খুব সমৃদ্ধ, শক্তিশালী জাতি,' নিজের মনের দ্বিধার ভাবটা লুকনোর জন্য একটা ঘাস চিবতে চিবতে বলল কিদগো।

কাভি বলল:

'ওদের গ্রামে না গিয়ে এখানেই ওরা কী ভাষায় কথা বলে সেটা জানার চেষ্টা করলে হয়। এরা তো সবাই ছেলেমানুষ। তারোপর সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও নেই। হাতির লোকটা আক্রমণ করলে পর ঘাসে আর ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে গেলেই চলবে। হাতি জাতির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না করেই ওদের গ্রামে গিয়ে উঠলে আমাদের সর্বনাশ হবে...'

কাভির পরামর্শটা কিদগোর মনঃপূত হল। খাড়া হয়ে উঠে সে ধীরে ধীরে নদীর দিকে এগোতে লাগল। হাতির লোকটা হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠাতে জলক্রীড়া বন্ধ হয়ে গেল। স্নানার্থীরা কোমর জলে ঠায় দাঁড়িয়ে অপর তীরের দিকে স্থির দৃষ্টে চেয়ে রইল।

এগিয়ে আসা কিদগোর দিকে হাতিটা রুখে দাঁড়াল। বিরাট সাদা দাঁতদুটোর উপর দিয়ে তার শুঁড়টা দুলে উঠল খসখস আওয়াজ তুলে। কানদুটো আবার ছড়িয়ে পড়ল বিরাট ডানার মতো। হাতির পিঠের লোকটা স্থির দৃষ্টে চেয়ে রইল নবাগতের দিকে। তার ডান হাতে একটা উদ্যত ছুরি। ছুরির ডগাটা আবার বঁড়শির মতো বাঁকা। প্রস্তুত ছুরিটা সে তুলতেই ফলাটা অল্প কেঁপে উঠল।

কিদগো নিঃশব্দে একেবারে জলের ধারে এগিয়ে গিয়ে হাতের বর্শাটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। তারপর বর্শার উপর পা রেখে তার নিরস্ত্র হাতদুটো দুপাশে মেলে দিল।

ধীরে ধীরে প্রতিটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে সে বলল, 'নমস্কার বন্ধু, আমি এখানে আমার সঙ্গীদের নিয়ে এসেছি। আমরা পলাতক। বাড়ির পথে চলেছি। তোমাদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করি ...'

মাহুত চুপ করে রইল। যাত্রীরা সবাই গাছের আড়ালে লুকিয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখতে লাগল কিদগোর কথা লোকটি বুঝতে পারে কিনা। পলাতকদের ভাগ্য এখন নির্ভর করছে তার উপর।

মাহুত ধীরে ধীরে ছুরি নামিয়ে নিল। কুলকুল করে ছুটে চলা জলে হাতিটা তার শরীরের ভর চালান করে দিল এক পা থেকে আরেক পায়ে, দাঁতদুটোর মাঝখান দিয়ে শুঁড়টা নামিয়ে দিল। হঠাৎ লোকটি কথা বলে উঠল। তা শুনে পান্দিওন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। উৎকণ্ঠায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কিদগোর সারা শরীরে দেখা দিল আনন্দের শিহরণ। মাহুতের কথায় সিবিল্যাণ্ট আর শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য খুবই বেশি। কিদগোর সুরেলা ভাষায় তা নেই। কিন্তু তবু পান্দিওনের কানে পর্যন্ত কয়েকটা পরিচিত শব্দ ধরা পড়ল।

'বিদেশী, তুমি কোথা থেকে আসছ?' হাতির ঐ উচ্চতা থেকে ভেসে আসা প্রশ্নটা কেমন যেন অহঙ্কারের মতন শোনাল। 'তোমার সঙ্গীরাই বা কোথায়?'

কিদগো বলল তারা তা-কেমে বন্দী হয়ে ছিল, এখন তারা সমুদ্রতীরে নিজেদের দেশে ফিরে চলেছে। অন্যদেরও কিদগো হাত নেড়ে ডাকল। উনিশ জন হতোদ্যম জীর্ণশীর্ণ লোক নদীতীরে এগিয়ে এল।

'তা-কেম ...' প্রতিটি শব্দ বহুকষ্টে আলাদা আলাদা ভাবে উচ্চারণ করে মাহুত বলল, 'সেটা আবার কী? কোথায় সে দেশ?'

উত্তর-পূর্বে এক বিরাট নদীর তীরের সেই শক্তিশালী দেশের কথা কিদগো তাকে বলল। মাহুত বোঝার ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে লাগল।

'হ্যাঁ, শুনেছি বটে ওদেশের কথা, কিন্তু সে তো অনেক দূরের পথ।

এতদূরে তোমরা এলে কী করে?' লোকটির কথায় একটা অবিশ্বাসের সুর।

'সে অনেক গল্প,' ক্লান্ত স্বরে বলল কিদগো। কাভি, পান্দিওন আর লিবীয়ার লোকেদের দেখিয়ে সে বলল, 'এদের দিকে তাকিয়ে দেখ। এরকম মানুষ আর কখনো দেখেছ?'

অদৃষ্টপূর্ব লোকগুলোর মুখের দিকে কৌতূহলভরে চেয়ে রইল মাহুতটি। ক্রমশ তার মুখ থেকে অবিশ্বাসের ছাপ মিলিয়ে গেল। হাতির মাথার পিছনে এক চাপড় মেরে সে বলল, 'আমার তো বয়স অল্প, বড়দের জিজ্ঞেস না করে কিছু স্থির করতে পারি না। হাতিটা জলে থাকতে থাকতেই নদীটা পেরিয়ে আমাদের তীরের দিকে এসে অপেক্ষা কর। সর্দারদের তোমাদের বিষয়ে কী বলব, বল?'

'বল, ক্লান্ত যাত্রীরা তোমাদের গ্রামে একটু বিশ্রাম করার অনুমতি চায়। তাছাড়া সমুদ্রতীরে যাবার পথের সন্ধানও তাদের প্রয়োজন। এর বেশি আমাদের আর কিছুই চাই না,' সংক্ষেপে স্পষ্টভাবে বলল কিদগো।

"আর কখনো এমন কথা শুনিনি, এমন মানুষও দেখিনি," মাহুত নিজের মনেই বলে উঠল। তারপর নিজের দলের দিকে ঘুরে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমরা এগোও, আমি আসছি!'

অন্য তরুণ তরুণীরা এতক্ষণ চুপ করে নবাগতদের দেখছিল। এখন বাধ্য হয়ে সবাই মাথা ঘুরিয়ে তাকাতে তাকাতে তাড়াতাড়ি তীরের দিকে এগিয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে লাগল। মাহুত হাতিটাকে ঘুরিয়ে স্রোতের বুকে আড়াআড়িভাবে দাঁড় করাল। যাত্রীরা বুক জল ঠেলে নদী পার হল। তারপর হাতিটাকে জোরে চালিয়ে মাহুত তার দলের অন্যদের পিছু নিল। কিছুক্ষণ পরেই যে কয়টা অল্প গাছ তীরে দাঁড়িয়ে ছিল তার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। যাত্রীরা পাথরের উপর বসে শংকিতচিত্তে অপেক্ষা করতে লাগল। লিবীয়ার লোকেরাই সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে। কিদগো অবশ্য অনেক বোঝাল। বলল, হাতি জাতিরা তাদের কোন ক্ষতি করবে না।

কিছুক্ষণ পর প্রান্তরে দেখা গেল চারটে হাতি। পিঠে ডাল বিছিয়ে

হাওদা করা হয়েছে। প্রতিটি হাওদায় ছ'জন যোদ্ধা। সঙ্গে তীরধনুক আর অসাধারণরকম চওড়া বর্শা। সেই যোদ্ধাদের পাহারায় যাত্রীরা গ্রামে পেঁছিল। গ্রামটা নদীর সেই স্নানের জায়গাটা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। হাজার চারেক হাত দক্ষিণ-পূবে ঐ নদীরই একটা বাঁকের কাছে।

একটা বন্ধুর জায়গায় সবুজ গাছের মধ্যে তিনশ কুঁড়েঘর।

গ্রামের বাঁয়ে একটা পাৎলা বন। ডাইনে, কিছু দূরে, ছুঁচলো-মাথা বিরাট বিরাট গুঁড়ি দিয়ে তৈরী একটা বেড়া। তার বাইরেটা আরো সব কাঠের গুঁড়ি দিয়ে মজবুৎ করে ঠেকা দেওয়া। চারধারে একটা গভীর পরিখা, সেটাও আবার আরেকটা ছুঁচলো-মাথা বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার আকার দেখে পান্দিওন তাজ্জব। কিদগো আঁচ করল, বেড়াটা বোধ হয় হাতির খোঁয়াড় হবে।

অনেকদিন আগে পূবদেশে যাত্রীরা একবার গাঁয়ের সর্দার আর বয়োবৃদ্ধদের সামনে দাঁড়িয়েছিল। আজ আবার দাঁড়াল। আবার তাদের বিদ্রোহী ক্রীতদাসদের অত্যাশ্চর্য গল্প শোনাতে হল। সেই সঙ্গে অজানা দেশের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ যাত্রার কথাও। সর্দাররা তাদের খুব ভাল করে যাচিয়ে নিল। পরীক্ষা করে দেখল তাদের অস্ত্রশস্ত্র, পিঠে ফারাও'র লাল মার্কা। কাভি আর পান্দিওনকে দিয়ে দূর সাগরের উত্তরে অবস্থিত তাদের দেশের কথাও বলিয়ে ছাড়ল।

এ দেশের লোকেদের জ্ঞানের পরিধি দেখে পান্দিওন অবাক হয়ে গেল। নুব রাজ্য তো বটেই, আফ্রিকার উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিমের আরো বহু দেশের কথা তারা জানে।

কিদগো মহাখুসি। স্থানীয় লোকেরা যাত্রীদের তাদের বাড়ির পথ বাতলে দিতে পারবে। ঠিক রাস্তা ধরে এগিয়ে তারা তবে শীগ্‌গীরই তাদের গন্তব্যস্থলে পেঁছে যাবে।

বয়োবৃদ্ধদের একটা ছোট্ট সভায় নবাগতদের ভাগ্য নির্ধারিত হল। ঠিক হল তাদের গ্রামে কয়েক দিন বিশ্রাম করার অনুমতি দেওয়া হবে। আতিথেয়তার পবিত্র নিয়ম অনুযায়ী খাওয়া আর থাকার জায়গাও তারা পাবে।

গ্রামের প্রান্তে যাত্রীদের ভাল করে বিশ্রাম করার জন্য একটা বড় কুঁড়েঘর দেওয়া হল। ঠিক পথ বাতলিয়ে দিয়ে হাতি জাতির লোকেরা তাদের পথে পথে ঘুরে বেড়ানর অবসান ঘটাবে জেনে যাত্রীরা আরো বেশি উৎসাহ বোধ করতে লাগল।

পান্দিওন, কিদগো আর কাভি গ্রামের ভিতর ঘুরে ঘুরে লোকেদের জীবনযাত্রা দেখে বেড়াতে লাগল। দৈত্যের মতো হাতিকে পোষ মানিয়ে এরা তাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। জীবজন্তুদের আটকে রাখার জন্য হাতির দাঁতের লম্বা লম্বা বেড়া দেখে তো পান্দিওন হতভম্ব।* পান্দিওনের মনে হল ভীষণ হাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের জন্য ইচ্ছা করেই এরকমটা করা হয়েছে। দামী হাতির দাঁত এরা এই ভাবে নষ্ট করছে, তার মানে হাতির দাঁতের কী বিরাট সঞ্চয়ই না এদের আছে। গ্রামের একজনকে এ কথা বলতে সে বেশ মুরুব্বীচালে পান্দিওনকে বলল, সর্দারের কাছে গিয়ে গাঁয়ের মাঝখানের বিরাট গুদামঘরটা দেখার অনুমতি চেয়ে নিও।

দুটো কুঁড়েঘরের মাঝখানের দেড়শ হাত ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে লোকটি বলল, 'এত হাতির দাঁত জমা করা রয়েছে।' সেই সঙ্গে মাথার উপর একটা ছড়ি তুলে গাদাটা কত উঁচু তাও সে দেখিয়ে দিল।

'হাতিকে তোমরা বশ মানাও কী করে?' কৌতূহল চেপে না রাখতে পেরে পান্দিওন বলল।

সে কথা শুনে লোকটা ভুরু কুঁচকে সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'বিদেশীদের কাছে সে কথা আমরা প্রকাশ করি না। সে কথা জানতে হলে সর্দারদের জিজ্ঞেস কর। লাল পাথরের লকেট বসান সোনার হার যাদের গলায় তারাই হচ্ছে হাতিদের প্রধান শিক্ষক ...'

পান্দিওনের তখন মনে পড়ল পরিখায় ঘেরা জায়গাটার কাছে যাওয়া

---

* নীল নদীর যেখানে আরম্ভ সে অঞ্চলের শিল্পকদের মধ্যে ১৯শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্তও হাতির দাঁতের বেড়ার চল ছিল।

তাদের বারণ। নিজের ভুলের জন্য সে নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে পড়ল। এমন সময় কিদগো তাকে ডাকল। একটা লম্বা চালায় কয়েকজন লোক কাজ করছিল; কিদগো সেখানেই ছিল। চালাটা হচ্ছে কুমোরদের কর্মশালা। তারা সবাই শস্য আর বীয়রের জালা বানাতে ব্যস্ত।

কিদগো নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না। এক তাল ভাল করে ঠাসা ভেজা মাটি নিয়ে সে উটকো হয়ে বসে গেল। তারপর নলখাগড়ায় ছাওয়া চালের দিকে চোখ তুলে মূর্তি গড়তে লেগে গেল। তার বড় বড় শক্তসমর্থ হাতদুটো প্রিয় কাজ সুরু করার জন্য ব্যগ্র। কিদগো বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে হাত চালাতে লাগল। পান্দিওন দেখে চলল তার বন্ধুর কাজ। কাজ করতে করতে নিজেদের মধ্যে কুমোরদের সে কী হাসাহাসি। কিদগো দক্ষ হাতে ধীরে ধীরে নরম মাটি কেটে টিপেটুপে পালিশ করে কাঁধের কাছ থেকে ছালার মতো ঝোলান চামড়ায় মোড়া উপরে সরু হয়ে ওঠা হাতির ঢালু পিঠ গড়ে তুলল। কুমোরদের হাসি আর গালগল্প গেল বন্ধ হয়ে। সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল। কিন্তু কিদগো তখন তার কাজে মগ্ন। কুমোরদের প্রতি তার কোন খেয়ালই নেই।

হাতির মোটা মোটা পাগুলো মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। মাথাটা তোলা। শুঁড়টা সামনে বাড়ান। কয়েকটা কাঠি নিয়ে কিদগো পাখার আকারে মাটিতে গুঁজে দিল, তারপর সেই কাঠামর উপর গড়তে সুরু করল হাতির কান — কানদুটো দুপাশে পালের মতো ছড়ান। দর্শকরা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেই পরমবিস্ময়ে আবার চুপ করে যায়। একজন কুমোর সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেল চালা ছেড়ে।

কিদগো তখন হাতির পিছনের পাদুটো নিয়ে ব্যস্ত। এক লম্বা সরু গলা, মোটা বাঁকা নাক, ছোট্ট পাকা দাড়িওয়ালা বুড়ো সর্দার যে কখন দর্শকদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে খেয়ালও করেনি। সর্দারের বুকে পান্দিওন দেখল হাতির প্রধান শিক্ষকদের সোনালি হার।

বুড়ো চুপ করে কিদগোর কাজ শেষ করা দেখল। পিছনে সরে দাঁড়িয়ে হাতের মাটি ঘষতে ঘষতে হাত খানেক উঁচু হাতির মূর্তিটাকে কিদগো স্মিত মুখে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। কুমোররা

সোচ্চারে তার তারিফ করতে লাগল। বুড়ো সর্দার তার মোটা ভুরুদুটো তুলতেই সব গোলমাল থেমে গেল। বেশ সমঝদারের ভঙ্গীতে ভেজা মূর্তিটা ছুঁয়ে সর্দার হাতের ইশারায় কিদগোকে এগিয়ে আসতে বলল।

'তুমি দেখছি খুব উঁচুদরের কারিগর,' বেশ অর্থবোধকভাবে সর্দার বলল। 'আমাদের লোকদের কেউ যা পারে না তুমি তা অতি সহজেই পার। শুধু হাতি নয়, মানুষের মূর্তি এ রকম করে বানাতে পার?' নিজের বুকে টোকা মেরে সর্দার বলল।

কিদগো মাথা নেড়ে নিজের অক্ষমতা জানাল। সর্দারের মুখ কালো হয়ে উঠল।

'কিন্তু আমাদের মধ্যে আমার চেয়ে ভাল কারিগর একজন আছে, দূর উত্তরে তার দেশ। সে তোমার মূর্তি বানাতে পারবে।' পান্দিওনকে দেখিয়ে কিদগো বলল।

বুড়ো পান্দিওনের দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করল। বন্ধুর অনুনয়ভরা দৃষ্টি লক্ষ্য করে পান্দিওন রাজী হয়ে গেল।

'কিন্তু একটা কথা সর্দার। আমাদের দেশে আমরা নরম পাথর বা কাঠ কেটে মূর্তি বানাই। এখানে পাথরও নেই, কাটার যন্ত্রপাতিও নেই। কেবল এই মাটি দিয়েই তোমার মূর্তি বানিয়ে দিতে পারি, তাও এই পর্যন্ত,' নিজের বুকে হাত দিয়ে পান্দিওন বলল। 'কিন্তু মাটি যে শীগ্‌গীর শুকিয়ে গিয়ে ফেটে যাবে। মূর্তি তোমার দিন কয়েকের বেশি টিকবে না...'

সর্দার হেসে বলল:

'বিদেশী কারিগরের কাজ আমি কেবল দেখতে চাই। আমাদের কারিগরেরাও তা দেখুক।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু কাজের সময় তোমায় আমার সামনে বসে থাকতে হবে।'

সর্দার অবাক হয়ে গেল, 'কেন? ওর মতো করে বানাতে পার না?' কিদগোকে দেখিয়ে সর্দার বলল।

পান্দিওন একটু অসুবিধায় পড়ে গেল, কী বলতে হবে ভেবে পেল না।

তখন কিদগো বলে উঠল, 'আমি বানিয়েছি সাধারণ হাতি। আর তুমি হচ্ছ হাতির শিক্ষক। জানই তো প্রত্যেক হাতিরই চেহারা আলাদা। যারা আনাড়ী তারাই কেবল ভাবে সব হাতি একইরকম দেখতে।'

'ঠিক বলেছ,' সর্দার বলল, 'আমি দেখা মাত্রই প্রত্যেক হাতির মন বুঝতে পারি, আগে থেকে বাতলে দিতে পারি তার চালচলন।'

'তবেই দেখ,' কিদগো বলে উঠল, 'যদি একটা কোন বিশেষ হাতির মূর্তি আমি বানাতে চাই তবে সে হাতিটাকে চোখের সামনে রাখা উচিত। আমার বন্ধুরও সেই কথা; সে তো যে কোন একজন মানুষের মূর্তি গড়তে যাচ্ছে না। তাকে গড়তে হবে তোমার মূর্তি। কাজেই কাজের সময় চোখের সামনে তুমি না থাকলে চলবে কী করে।'

'ঠিক, ঠিক,' বুড়ো বলল, 'দুপুরের বিশ্রামের সময় তোমার বন্ধুকে আসতে বল। আমি তখন বসব।'

সর্দার চলে যেতে কুমোররা হাতির মূর্তিটাকে একটা কাঠের বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দিল। গ্রামের লোকরা দলে দলে এসে মূর্তিটার তারিফ করে যেতে লাগল।

কিদগো বলল, 'পান্দিওন, এখন আমাদের ভাগ্য তোমার উপর নির্ভর করছে। সর্দার যদি তোমার মূর্তি দেখে খুসি হয়, তবে এরা আমাদের সাহায্য করবে ...'

পান্দিওন মাথা নেড়ে কথাটা মেনে নিল। দুজনে ঘরে ফিরে এল। পিছনে ছোট ছেলেদের ভীড়।

একটা উঁচু অসুবিধাজনক আসনে বসে সর্দার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পার? তোমার কাজের ব্যাঘাত হবে না?' পান্দিওন তখন কুমোরদের আনা মাটির তালটা একটা গাছের গুঁড়ির উপর ঠিকঠাক করে রাখছিল।

'কথা তো বলতেই পারি, কিন্তু তোমার ভাষা যে ভালো করে জানি না। তোমার সব কথা তো আমি বুঝতে পারব না। উত্তরও দেব অল্প কথায়।'

'তবে তোমার বন্ধুকে ডেকে আন, সমুদ্রতীরের বনের সেই লোকটিকে, ও তোমার সঙ্গে থাকুক। বোকা বাঁদরের মতো চুপ করে বসে থাকা আমার পোষাবে না!'

কিদগো এসে পান্দিওন আর বুড়োর মাঝখানে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল। তার সাহায্যে পান্দিওন আর বুড়ো সর্দার নিজেদের মধ্যে বেশ মন খুলে গল্প করে চলল। সর্দার পান্দিওনকে তার দেশের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে বুড়োর প্রতি পান্দিওনের বেশ একটা বিশ্বাস ও ভরসা হল। বুড়ো অনেক কিছু দেখেছে শুনেছে।

পান্দিওন নিজের দেশের কথা, তেস্‌সার কথা, তার ক্রীট যাত্রা আর তা-কেমে দাসত্বের কাহিনী, দেশে ফেরার ইচ্ছা, সব কিছুই বুড়োকে বলল। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার আঙুলগুলো মূর্তি গড়ে চলল। কিদগো তার কথা অনুবাদ করে দিল। অসাধারণ প্রেরণা আর রোখের সঙ্গে ভাস্কর কাজ করে চলল। সর্দারের মূর্তিটাকে তার মনে হতে লাগল যেন স্বদেশের পথনির্দেশ। অতীতের স্মৃতি তখন তাকে অধীর করে তুলেছে। আবার অসহ্য হয়ে উঠেছে এদেশে এভাবে আটকে থাকাটা।

বুড়ো সর্দার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উস্‌খুস করতে লাগল। নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তারপর হঠাৎ বলে উঠল:

'তোমার নিজের ভাষায় কিছু বল।'

পান্দিওন উচ্চস্বরে বলল: 'ἑλληνικόν ἐλεύθερον!'

পান্দিওনের দাদু বিখ্যাত গ্রীক বীরদের গল্প বলতে বলতে প্রায়ই একথাটা আওড়াত। আফ্রিকার অন্তরে বসে একথার উচ্চারণ অদ্ভুত শোনাল।

'কী বললে?' সর্দার জিজ্ঞেস করল।

পান্দিওন বলল, এই কয়টি কথায় প্রকাশ পেয়েছে তার দেশের প্রতিটি লোকের স্বপ্ন — 'যা কিছু হেলিনীয় তাই মুক্ত!'

কথাটা সর্দারের মনে চিন্তার খোরাক জোগাল। কিদগো পান্দিওনকে

সন্তর্পণে বলল, সর্দার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, যতটা কাজ হয়েছে সেটাই আজকের পক্ষে যথেষ্ট।

'হ্যাঁ, আজকে এখানেই থাক,' বুড়ো সর্দার মাথা তুলে বলে উঠল, 'কাল আবার এস। আর কদিন লাগবে?'

'তিন দিন,' কিদগোর ইশারা সত্ত্বেও পান্দিওন বেশ জোর দিয়েই বলে উঠল।

'তিন দিন, এমন কিছু বেশি নয়, তিন দিন সইতে পারব,' বুড়ো আসন ছেড়ে উঠে বলল।

ভেজা কাপড়ে মাটির তালটাকে ঢেকে দিয়ে পান্দিওন আর কিদগো সর্দারের বাড়ির ভাঁড়ার ঘরে সেটাকে রেখে দিয়ে এল।

পরের দিন দুই বন্ধু সর্দারকে শোনাল তা-কেমের গল্প। বলল তার প্রচণ্ড শক্তি আর বিরাট বিরাট দালানের কথা। সর্দারের ভুরু কুঁচকে গেল। কিন্তু তবু আইগিপ্‌তসের লোকেদের কথা সে কৌতূহলের সঙ্গে শুনল। পান্দিওন মিশরীদের একঘেয়ে সংকীর্ণ জগতের কথা জানাতে সর্দার উৎসাহিত হয়ে উঠল।

'এবার আমাদের জাতির কথা তোমাদের জানার সময় হয়েছে,' সর্দার বলল, 'তোমাদের দূর দেশে আমাদের কথা তোমরা বলবে।'

সর্দার বলল, হাতি জাতির লোকেরা তাদের ক্ষমতার দৌলতে বহুদূরে যাত্রা করে। হাতি আরোহীদের পক্ষে পথের একমাত্র বিপদ হল বুনো হাতির পাল। পোষা হাতি যে-কোন মুহূর্তে বুনোদের দলে গিয়ে জুটতে পারে। কিন্তু তা ঠেকাবারও কয়েকটা উপায় আছে।

সর্দার বলল জলা আর পাহাড় পেরিয়ে আরো পুব আর দক্ষিণে গেলে বড় বড় পানীয় জলের সাগর* পড়বে। সাগরগুলো এত বড় যে বিশেষ এক জাতের নৌকো ছাড়া তাদের পার হওয়া যায় না। কয়েক দিন লাগে পার হতে। এই পানীয় জলের সাগরগুলো একটার পর একটা লম্বা মালার মতো দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়েছে। চারদিক পাহাড়ে ঘেরা। সে পাহাড়ের মধ্যে থেকে

---

* পানীয় জলের সাগরগুলো — পূর্ব আফ্রিকার বিরাট হ্রদমালা।

ধোঁয়া ওঠে, শিখা জ্বলে, আগুনের নদী বয়। এই সব সমুদ্রের ওপারে আবার রয়েছে শুকনো মাটি — নানা জীব জন্তুতে ভরা উঁচু মালভূমি। পৃথিবীর প্রকৃত প্রান্ত, অসীম সমুদ্রতট রয়েছে আরো অনেক পূবে, অনেক জলা পেরিয়ে।

মালভূমিতে রয়েছে দুটো বিরাট পাহাড়*, তাদের মধ্যে তফাত বেশি নয়। তাদের বরফঢাকা সাদা চুড়ো দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। যে নিজের চোখে না দেখেছে তাকে এদের সৌন্দর্য কিছুতেই বোঝান যাবে না।

পাহাড়দুটো ঘন জঙ্গলে ভরা। বুনো জাতি আর এক ধরনের রহস্যজনক প্রাচীন দুর্লভ প্রাণীর বাস সেখানে। তাদের চেহারা বর্ণনাতীত। হাতি জাতির লোকেরা পাহাড়ের খাদে মস্ত বড় জন্তুর কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখেছে, সেই সঙ্গে মানুষের হাড় আর তাদের পাথরের অস্ত্রের টুকরো। উত্তরের সাদা পাহাড়ের কাছের ঘন জঙ্গলে পাওয়া যায় গণ্ডারের সমান বড় বড় বুনো শুওর। একবার একটা হাতির মতো মস্ত জন্তু দেখা গিয়েছিল, ওজনে আরো ভারী, মুখের প্রান্তে পাশাপাশি দুটো শিং।

পানীয় জলের সাগরের বুকে লোকেরা বাস করে ভাসমান গ্রামে**, শত্রুরা যাতে পৌঁছতে পারে না। এরাও কাউকে তাদের হাত থেকে সহজে পার পেতে দেয় না।

দেশটা দক্ষিণে কতদূর গেছে আর সত্যিই সূর্য সেখানে আবার নিচে নেমেছে কিনা, সে কথা পান্দিওন জিজ্ঞেস করল সর্দারকে।

প্রশ্নটা শুনেই বুড়ো উৎসাহিত হয়ে উঠল। জানা গেল সর্দারের বয়স যখন চল্লিশের নিচে তখন সে দক্ষিণের দিকে একটা বড় অভিযানের ভার নিয়ে বেরয়। কুড়িটা বাছাই করা হাতির পিঠে চড়ে তারা গিয়েছিল। দক্ষিণের সমতলে সোনা পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় একরকমের দুর্মূল্য ঘাস। বুড়ো আর অসুস্থদের পক্ষে তা খুবই বলকারী।

---

* কেনিয়া আর কিলিমাঞ্জারো গিরিশীর্ষ — আফ্রিকার দুটি সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ।

** ভাসমান গ্রাম — বিরাট বিরাট ভেলার বুকে অবস্থিত গ্রাম আফ্রিকার বড় বড় হ্রদে এখনো দেখা যায়।

পশ্চিম থেকে পূবে বয়ে গেছে একটা বিরাট নদী। তার অনেকগুলো বিরাট বিরাট জলপ্রপাত আছে।* জলপ্রপাতে জল ছিটকে উঠে উঁচু উঁচু স্তম্ভের সৃষ্টি হয়, তাতে সারাক্ষণই রামধনু। সেই বিরাট নদীর ওপারে নীল ঘাসের অসীম প্রান্তর। এই সমতলের প্রান্তে, সমুদ্রতীরে পূব আর পশ্চিমে গজিয়েছে বিরাট বিরাট গাছ। তাদের পাতাগুলো যেন পালিশ-করা ধাতু দিয়ে তৈরী, সূর্যের আলোয় লক্ষ লক্ষ আয়নার মতো জ্বলতে থাকে।

দক্ষিণের গাছের পাতা আর ঘাসের রং সবুজ নয় — ধূসর, ফিকে নীল আর বাদামী। তার ফলে সারা দেশটাকে বড় অদ্ভুত দেখায়, কেমন ঠাণ্ডামতো। অবশ্য অমনিতেও যত দক্ষিণে যাবে ততই ঠাণ্ডা পাবে। আমাদের যখন গ্রীষ্ম, ওখানে তখন বর্ষা। বর্ষাকালে ঠাণ্ডা ভীষণ, উত্তরের লোকেদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন।

বহু দক্ষিণের গিরিবর্ত্মে একরকম রুপোলি গাছ পাওয়া যায়। হাত তিরিশেক উঁচু, গায়ে তাদের আড়াআড়ি আলগা বাকলের ছেঁড়াখোঁড়া রেখা। রুপোলি পাতায় ঢাকা অজস্র ডালপালা। পাতাগুলো আবার বাচ্চা পাখির প্রথম পালকের মতো নরম। গাছগুলো এমন সুন্দর যে যেই দেখে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়।

বুড়ো বলে চলল, বিরাট বিরাট বেগুনী মিনারের মতো সব পাথুরে পাহাড় খাড়া উঠেছে। তার পাদদেশে বাঁকা বাঁকা গাছ, টকটকে লাল ফুলে ভরা।

ঊষর সমতলে আর পাহাড়ের পাথুরে ঢালুতে বিশ্রী দেখতে আঁকাবাঁকা ডালের ঝোপ আর ছোট ছোট গাছ**। তাদের মোটা নরম পাতা বিষাক্ত রসে ভরা। সোজা শূন্যে ওঠা জোড়া ডালের মাথায় আঙুলের মতো পাতা। অন্য গাছগুলোরও একই ধরনের পাতা, লালচে রং, ডালহীন বাঁকা গুঁড়ির ডগায় টুপির মতো নিচে ঝুলে পড়েছে। গাছগুলো হাত চারেক লম্বা।

---

* জাম্বেজী নদী আর ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত।

** লিলিয়াকেথায়ে জাতের নানা ধরনের আলোয়ে-গাছ।

নদনদীর কাছে, বনের খোলা জায়গায় বিরাট বিরাট সমান করে কাটা পাথরে তৈরী প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। দেখেই বোঝা যায় খুব শক্তিশালী আর দক্ষ কোন জাতের তৈরী। হিংস্র বুনো কুকুর ছাড়া আজকাল এইসব ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি কেউ থাকে না। চাঁদনী রাতে সেগুলো আবার কান্না জোড়ে। যাযাবর পশুপালক আর গরীব শিকারীরা প্রান্তরের বুকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আরো দক্ষিণে ফিকে ধূসর রঙের এক জাতীয় লোকের* বাস। তাদের আছে অজস্র পশুপাল। হাতি জাতির অভিযান অবশ্য অত দূর যায়নি।

পান্দিওন আর কিদগো সাগ্রহে বুড়ো সর্দারের গল্প শুনতে লাগল। দক্ষিণের সেই নীল প্রান্তরের গল্পটা মনে হল যেন সত্যের সঙ্গে কল্পনা মেশান কিন্তু তবু বুড়োর কথায় প্রত্যয়ের ভাব। থেকে থেকেই সে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে, উত্তেজনায় তার চোখদুটো জ্বলে ওঠে। তা দেখে পান্দিওনের মনে হয় যেন বুড়োর চোখের সামনে আবার ঘটে যাচ্ছে স্মৃতিতে-ধরে-রাখা পুরনো দিনের ঘটনা।

হঠাৎ সর্দার থেমে গেল। বলল:

‘তুমি যে দেখছি কাজ বন্ধ করে দিয়েছ। আমায় তার মানে আরো বেশ কিছু দিন তোমার সামনে বসতে হবে।’

পান্দিওন তাড়াতাড়ি হাত চালাতে লাগল। অবশ্য তাড়াহুড়োর তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। তরুণ ভাস্কর বেশ বুঝতে পারল, এই মূর্তিটার মতো ভাল কাজ সে আর কখনো করেনি। এত বিপদ আপদ পার হওয়া সত্ত্বেও তার হাত অলক্ষ্যে ক্রমশ পাকা হয়ে উঠেছে। আইগিপ্তসে তার ভীষণ অভিজ্ঞতা আর পর্যবেক্ষণ বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে।

তিন দিনের দিন পান্দিওন সর্দারের সঙ্গে তার মূর্তিটা কয়েক বার মিলিয়ে দেখল।

---

* হটেনটট জাতির উপজাতিরা প্রাচীন কালে এখনকার তুলনায় অনেক বেশি দূর দূর দেশে ছড়িয়ে থাকত, প্রাচীন মিশরীদের সঙ্গে তাদের যে আত্মীয়তা ছিল সে কথা মনে করার কারণ আছে।

অবশেষে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'হয়ে গেছে।'

'হয়ে গেছে?' সর্দার জিজ্ঞেস করল। পান্দিওন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে সে উঠে পড়ে মূর্তিটার কাছে এগিয়ে গেল।

কিদগো তো তখন মুগ্ধদৃষ্টিতে পান্দিওনের গড়া মূর্তিটার দিকে চেয়ে। প্রশংসা না করে সে আর থাকতে পারছে না।

একরঙা মাটি কিন্তু তাতে সর্দারের মুখের প্রতিটি রেখা ফুটে উঠেছে — তার কঠোর বিচক্ষণ মহিমান্বিত মুখ, বেরকরা দৃঢ় চোয়াল, চওড়া ঢালু কপাল, পুরু ঠোঁট আর বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র শুদ্ধ মোটা নাক।

বাড়ির দিকে ফিরে বুড়ো অনুচ্চস্বরে ডাক দিল।

ডাক শুনে হাজির হল তার বউদের একজন। সে অল্পবয়সী, কপালের উপর পাতা ছোট ছোট অনেক বেণী। একটা পালিশ করা রুপোর আয়না মেয়েটি সর্দারের দিকে বাড়িয়ে দিল। আয়নাটা নিশ্চয় উত্তরের কোন দেশে তৈরী। কেমন করে যেন মধ্য আফ্রিকায় এসে পড়েছে।

হাত বাড়িয়ে মূর্তির গালের কাছে আয়নাটা ধরে সর্দার নিজের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগল।

পান্দিওন আর কিদগো তখন তার মতামত জানার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। সর্দার অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আয়নাটা নামিয়ে রেখে মৃদুস্বরে বলল:

'মানুষের অসীম ক্ষমতা... বিদেশী, আমাদের দেশের যে কোন লোকের চেয়ে সে ক্ষমতা তোমার অনেক বেশি। আমাকে তুমি আমার চেয়েও অনেক ভাল করে রূপ দিয়েছ — তার মানে আমার বিষয়ে তোমার ধারণা ভালো। তোমায় এর প্রতিদান আমি দেব। কী পুরস্কার চাও বল?'

কিদগো পান্দিওনকে একটা খোঁচা মারল। কিন্তু পান্দিওনের যেন অন্তস্তল থেকেই উৎসারিত হয়ে উঠল:

'আমার যা সম্পত্তি তা তো তোমার চোখের সামনেই রয়েছে। অন্যের দেওয়া এই বর্শাটা ছাড়া আর কিছুই নেই...' পান্দিওন তোৎলাতে সুরু করল। তারপর সাগ্রহে বলল, 'এই বিদেশে আমার কিছুই চাই না...

আমার নিজের দেশ আছে; সে দেশ বহু দূরে, কিন্তু তবু তাই আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ। আমায় দেশে ফেরায় সাহায্য কর।'

হাতি শিক্ষক বাপের মতো সস্নেহে পান্দিওনের কাঁধে হাত রাখল।

'তোমার সঙ্গে আরো আলাপ করতে চাই, কাল আবার তোমার বন্ধুকে নিয়ে এস। মূর্তিটার বাকি কাজ আমরাই করব। কুমোরদের বলব, মাটিটাকে এমন শুকিয়ে দেবে যাতে ফেটে না যায়। এই প্রতিমূর্তিটা আমি রেখে দিতে চাই। বাড়তি মাটি ভিতর থেকে বের করে নিয়ে বিশেষ একজাতের পিচ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে — কী করতে হবে তা কুমোররা জানে। কেবল এই দৃষ্টিহীন চোখদুটো আমার ভাল লাগছে না। এক জাতের পাথর তোমায় আমি দেব, সেগুলো বসিয়ে দিতে পার?'

পান্দিওন সম্মতি জানাতে বুড়ো আবার তার বউকে ডাকল। বউ এবার একটা চিতাবাঘের চামড়ামোড়া বাক্স নিয়ে এল।

বেশ বড় গোছের একটা থলে বের করে নিয়ে সর্দার ভিতরের জিনিসগুলো হাতের উপর ঢেলে ফেলল। কোনা কাটা, ডিমের আকারের বড় বড় অজস্র পাথর। একেবারে জলের মতো স্বচ্ছ। পাথরগুলোর অস্বাভাবিক জৌলুষ পান্দিওনের নজরে পড়ল। প্রত্যেকটা পাথরে যেন সংহত হয়ে আছে সূর্যের আলো, অথচ তারা শীতল স্বচ্ছ নির্মল।* সর্দার বলল:

'এই রকম চোখই আমি বরাবর চেয়ে এসেছি, জীবনের আলো যাতে সংহত থাকবে, কিন্তু নিজেরা কখনো বদলাবে না। সবচেয়ে ভালো পাথর বেছে নিয়ে মূর্তিতে বসিয়ে দাও।'

তরুণ ভাস্কর তার কথা মেনে নিল। সর্দারের মূর্তি এমন একটা রূপ নিল যা বর্ণনার অতীত। ভেজা পাঁশুটে মাটিতে যেখানে ছিল ফাঁকা চোখদুটো সেখানে স্থান নিল আলো ফুটে ওঠা দুটো পাথর। তাদের বিচ্ছুরিত আলো মুখটাকে ভরে দিল প্রাণের যাদুমন্ত্রে। এই পরিবর্তনটা পান্দিওনের কাছে প্রথমটা বড় অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। কিন্তু পরে সেও

---

* হীরা।

অবাক হয়ে গেল। যতই সে তাকিয়ে থাকে ততই ঘন রঙের মাটির মুখটার সঙ্গে স্বচ্ছ চোখের সুষমা ধরা পড়তে থাকে।

হাতি শিক্ষক মহাখুসি। 'এই পাথরগুলো তুমি অভিজ্ঞান হিসেবে নিয়ে যাও বিদেশী কারিগর!' পান্দিওনের হাতে কতগুলো পাথর ঢেলে দিয়ে বলল সর্দার। পাথরগুলোর কোন কোনটা আকারে জামের আঁটির সমান। 'পাথরগুলো দক্ষিণের সমতলের নদীতে পাওয়া। এর চেয়ে শক্ত ও স্বচ্ছ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। তোমার দূর দেশে ফিরে গিয়ে লোকজনদের দক্ষিণ থেকে হাতি জাতিদের আনা এই অত্যাশ্চর্য জিনিস দেখিয়ো।'

বুড়োকে ধন্যবাদ জানিয়ে পান্দিওন উপহারগুলো লুকিয়ে রাখল ইয়াখমসের পাথর রয়েছে যে থলিতে তার ভিতরে। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

'কাল এস কিন্তু, ভুলে যেও না!' পিছু ডেকে বলল বুড়ো।

কুঁড়েঘরে যাত্রীরা উত্তেজিতভাবে পান্দিওনের কাজের সাফল্যের ফলাফল নিয়ে আলোচনা জুড়ে দিল। শীগ্‌গীর বেরিয়ে পড়ার আশা আরো জোরাল হয়ে উঠল। হাতি জাতিরা যে তাদের যেতে দেবে, রাস্তাও বাতলে দেবে সে বিষয়ে তারা অনেকটা নিশ্চিত হল।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে পান্দিওন আর কিদগো আবার সর্দারের বাড়ির কাছে এসে হাজির হল। বুড়ো সর্দার হাতের ইশারায় তাদের ভিতরে ডাকতে বহু কষ্টে উত্তেজনা চেপে রেখে তারা সর্দারের পায়ের কাছে বসল।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সর্দার একসঙ্গে দুজনকেই উদ্দেশ্য করে বলল:

'অন্য সর্দারদের পরামর্শ নিয়েছি, সবাই আমার সঙ্গে একমত। আজ থেকে আধখানা চাঁদ পরে, বিরাট শিকার যখন শেষ হবে তখন আমরা পশ্চিমে একটা বড় অভিযান পাঠাব সোনা আর ওষুধবাদামের সন্ধানে। ছটা হাতি বন পেরিয়ে যাবে বিরাট নদীর উৎসের দিকে। সাত দিনের পথ... ঐ লাঠিটা দাও তো,' পান্দিওনকে সর্দার বলল।

সমুদ্র যেখানে ঊষর দেশের ভিতরে কোণা করে ঢুকে গেছে সেখানকার বড় উপসাগরের ঘেরটা বুড়ো এঁকে দিল। তা দেখে কিদগোর মুখ দিয়ে

বেরিয়ে এল একটা ক্ষীণ চীৎকার। একটা আঁকাবাঁকা রেখা কেটে বুড়ো দুশাখায় বিভক্ত একটা নদী এঁকে দিল। শাখাদুটো যেখানে মিশেছে বুড়ো সেখানে একটা ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বলল:

'এত দূর পর্যন্ত হাতিগুলো যাবে। হাতির পিছন পিছন তোমরা যেও। তাহলে সহজেই বন পেরতে পারবে। তারপর তোমাদের একা যেতে হবে। কিন্তু সমুদ্রে পেঁছিতে আর কেবল পাঁচ দিন লাগবে...'

'রাজকুমার!' উত্তেজিত হয়ে কিদগো বলে উঠল। 'তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা। নদীটা আমার দেশের ভিতর দিয়েই গেছে। সোনার প্রান্তরও আমার পরিচিত...' পুলকের চোটে লাফিয়ে উঠল কিদগো।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বুড়ো সর্দার শান্তভাবে বলল, 'তোমার দেশ, দেশের লোকজনদের আমি জানি। তোমাদের শক্তিশালী সর্দার ইওরুমেফুর সঙ্গে এককালে আমার পরিচয়ও হয়েছিল।'

'ইওরুমেফু!' কিদগো চেঁচিয়ে উঠল। 'ইওরুমেফু আমার মামা...'

'খুব ভাল,' কিদগোকে থামিয়ে সর্দার বলে উঠল, 'তাকে আমার অভিবাদন জানিও। যা বললাম, সব বুঝেছ তো?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই বুড়ো বলে উঠল, 'এবার তোমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' সর্দার পান্দিওনের দিকে তাকাল। 'আমি জানি, দেশে ফিরতে পারলে তুমি একজন মহাপুরুষ হয়ে উঠবে। কী জানতে চাও বল, আমি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেব।'

পান্দিওন বলল, 'অনেক দিন থেকেই ভাবছি জিজ্ঞেস করব, তোমরা কেমন করে হাতিকে পোষ মানাও। এটা হয়ত গোপন কথা,' সন্দেহের ভাবে পান্দিওন জুড়ে দিল।

'কেবল বোকাদের কাছেই হাতিকে পোষ মানানর ব্যাপারটা গোপন কথা,' বুড়ো সর্দার হেসে বলল, 'যে কোন বিচক্ষণ লোক ব্যাপারটা অতি সহজেই ধরে ফেলতে পারে... গোপন কথাটা ছাড়া এতে অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য, বিপজ্জনক খাটুনির প্রয়োজন আর চাই অসীম ধৈর্য। শুধু বুদ্ধি দিয়ে কিছু হবে না, সত্যিকার কঠোর পরিশ্রমও দরকার। আমাদের জাতির যে তিনটি গুণ আছে তা একসঙ্গে এদেশের অন্যান্য জাতির মধ্যে

খুব কমই দেখা যাবে — বুদ্ধি, পরিশ্রম শক্তি আর অসীম সাহস। একথা প্রথমেই জেনে রাখ, পূর্ণবয়স্ক হাতিকে কখনো পোষ মানাতে পারবে না। বাচ্চা হাতিই আমরা ধরি। অল্পবয়সী হাতিকে দশ বছর ধরে শেখান হয়। হাতিকে মানুষের আদেশ বুঝে প্রয়োজনীয় কাজ করতে শেখাতে হলে দশ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।'

'দশ বছর!' অবাক হয়ে বলল পান্দিওন।

'তার এক মুহূর্ত কম নয়, তাও যদি ঠিকভাবে হাতির চরিত্র বুঝতে পেরে থাক। যদি ভুল কর তবে পনের বছরেও কিছু হবে না। গোঁয়ার আর বোকা হাতিও আছে। তাছাড়া ভুলে গেলে চলবে না বাচ্চা হাতি ধরাটা ভীষণ বিপজ্জনক। নিজেদের চেষ্টায় ধরতে হবে। শেখান হাতির সাহায্য নেওয়া যাবে না, কারণ তবে শেখান হাতিগুলোও আবার পালে যোগ দিয়ে বসতে পারে। বুনো হাতির পালকে তাড়িয়ে দেবার পর, বাচ্চা হাতিগুলোকে ধরে ফেলে কাজে লাগান হয় শেখান হাতিদের। হাতি শিকারের সময় সর্বদা কয়েকজন সাহসী শিকারী মারা পড়ে ...' বুড়ো সর্দারের গলায় ফুটে উঠল দুঃখের সুর। 'আমাদের তরুণ যোদ্ধাদের তালিম তুমি দেখেছ ?.. দেখেছ ? ভাল। হাতি শিকারে এই সব তালিম কাজে দেয়।'

হাতি জাতিদের অদ্ভুত খেলা পান্দিওন কয়েক বার দেখেছে। একটা মসৃণ মাঠে দুটো উঁচু খুঁটি বসান হয়। খুঁটিদুটোর মাঝখানে মাটি থেকে প্রায় হাত পাঁচেক উঁচুতে আড়াআড়িভাবে বাঁশের বাতা লাগান থাকে।

লোকেরা অনেকটা ছুটে এসে পাশ থেকে অদ্ভুতভাবে শূন্যে লাফিয়ে উঠে বাতাটা পেরিয়ে যায়। লাফিয়ের শরীরটা যায় প্রায় দুভাঁজ হয়ে, যে দিকে লাফাচ্ছে সেদিকে ডানপাশ করে এগিয়ে থাকে। পান্দিওন আর কখনো কাউকে এত উঁচুতে লাফাতে দেখেনি। খুব ভাল লাফিয়েদের কেউ কেউ প্রায় হাত ছয়েক পর্যন্ত লাফাতে পারে। এদের এই কসরৎ দেখে পান্দিওন তো অবাক। কিন্তু এটা যে কী কাজে লাগতে পারে তা সে ভেবে পায়নি। বুড়ো সর্দারের কথায় এই অনুশীলনের কিছু অর্থ পাওয়া গেল।

একটুখানি থেমে সর্দার আবার বলতে লাগল গলাটা একটু চড়িয়ে:

'ব্যাপারটা কত কঠিন তা বুঝতে পারলে তো। আরো কোন কোন জাতি হাতি শিকার করে। তারা গাছে উঠে বড় বড় বর্শা চালিয়ে হাতিদের মেরে ফেলে, তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায় গভীর খাদে, কখনো কখনো আবার হাতিদের ঘুমের সময় লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের কাছে এগিয়ে যায়।' বুড়ো সর্দার নিজের হাঁটুতে চাপড় মেরে বলল, 'আচ্ছা, পরের বার হাতি শিকারে তোমায় নিয়ে যেতে বলব। পশ্চিমের বনে আমাদের অভিযান সুরু হবার আগেই হাতি শিকারে যাওয়া হবে। বেশি দিন বাকি নেই। আমাদের দেশের লোকদের গৌরব আর কষ্ট দেখতে চাও?'

'চাই সর্দার, তোমাকে ধন্যবাদ। আমার সঙ্গীরাও দেখতে যেতে পাবে তো?'

'সবাই গেলে বড্ড ভীড় হয়ে যাবে। দু-একজনকে নিয়ে যেও। তার বেশি হলে শিকারীদের কাজের অসুবিধা হবে।'

'তবে আমার দুই বন্ধুকে যেতে দাও — ও যাবে,' কিদগোকে দেখিয়ে পান্দিওন বলল, 'আর আরেকজন...'

'ঘন দাড়িওয়ালা গোমড়ামুখ লোকটি?' কাভির বর্ণনা দিয়ে বলল সর্দার। পান্দিওন মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ, সেই।

'ওর সঙ্গেও আমার আলাপ করার ইচ্ছা আছে। ওকে একবার আসতে বল। তোমাদের যে আমরা সাহায্য করতে চাই একথা সঙ্গীদের জানানর জন্য নিশ্চয়ই ব্যগ্র হয়ে উঠেছ। শিকারের দিন ঠিক হলে তোমরা খবর পাবে।' বুড়ো সর্দার হাতের ভঙ্গীতে পান্দিওনদের যেতে বলল।

মাদলের ভয়াবহ আওয়াজে দলবদ্ধ হল শিকারীরা সবাই। কেউ কেউ হাতিতে চড়ে। হাতির পিঠে দড়াদড়ি, খাবারদাবার, জল। বাকিরা পায়ে হেঁটেই চলল। মোটা বর্শা হাতে পান্দিওন, কিদগো আর কাভি হাঁটার দলে যোগ দিল। নদী পার হয়ে দু'শ শিকারী প্রান্তরের ভিতর

দিয়ে চলল উত্তর মুখে। দূর দিগন্তে পাথুরে পাহাড়ের নীল রেখা আবছা দেখা যায়। শিকারীরা সেই দিকেই এত দ্রুত হেঁটে চলেছে যে আমাদের এই তিন বন্ধুর মতো অভিজ্ঞ হাঁটিয়ের পক্ষেও তাদের সঙ্গে তাল রাখা মুশকিল হল।

পাহাড়শ্রেণীর দক্ষিণ আর পূবে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে রোদে পোড়া সমান ঘাসজমি। বাতাসে হলদে প্রান্তরের বুকে ধুলোর মেঘ উঠছে। তাতে ঢাকা পড়ছে গাছগাছড়া ঝোপঝাড়ের নিষ্প্রভ শ্যামলিমা। কাছের পাথরগুলো বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু দূরেরগুলো ধূসরনীল কুয়াশায় প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা। বিরাট বিরাট ভুতুড়ে হাতির মাথার খুলির মতো উঠে আছে পাহাড়ের গোল চূড়া। বেঁটে পাহাড়গুলো রয়েছে মস্ত কুমীরের মতো গুড়ি মেরে।

শিকারীরা রাত কাটাল পাহাড়শ্রেণীর দক্ষিণ প্রান্তে। ভোর বেলা তারা আবার এগোতে লাগল পূবদিকের ঢালু ধরে। সামনেই প্রান্তরের বুকে লালচে মরীচিকা, তাতে গাছের কম্পিত ছায়া। উত্তরে অনেক দূর বিস্তৃত জলা। একটি তরুণ দল ছেড়ে এসে বিদেশী তিনজনকে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে তার সঙ্গে উপরে উঠতে বলল।

কাভি, পান্দিওন আর কিদগো পাহাড়ের গায়ে প্রান্তর থেকে শদুয়েক হাত উঁচুতে উঠে গেল। মাথার উপর খাড়া পাথরের পাহাড়। পাথরের গা থেকে বেরচ্ছে ভীষণ গরম হল্কা, তার উজ্জ্বল হলদে গায়ে অজস্র ফাটা দাগ। জলার সামনে একটা প্রান্তে পান্দিওনদের নিয়ে গিয়ে তরুণ শিকারীটি তাদের পাথর আর রুক্ষ ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে বলল। যাবার সময় ইশারায় তাদের চুপ করে থাকতে বলে গেল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনবন্ধু কড়া রোদের ভিতর চুপ করে বসে রইল। একটি কথাও বলার সাহস কেউ পেল না। নিচের উপত্যকা থেকেও কোন আওয়াজ এল না।

হঠাৎ বাঁ দিক থেকে অস্পষ্ট ছপ ছপ আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজটা ক্রমেই জোরাল হয়ে উঠে কাছে এগিয়ে এল। পাথরের আড়াল

থেকে সাবধানে মাথা বের করে পান্দিওন নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রায় স্থির হয়ে ঘাসের মধ্যে দিয়ে চেয়ে রইল।

জলার বুকে ঘনিয়ে এল ঘন ধূসর মেঘ। হাতির পাল। হাজার হাজার হাতি। বিপুলকায় জন্তুগুলো পাহাড়ের দিক থেকে এসে ঘাসের প্রান্তরের সীমানা পেরিয়ে এগোচ্ছে পূবদক্ষিণে।

হলদে-ধূসর ঘাসের গায়ে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তাদের শরীর। আলাদা আলাদা পালে ভাগ হয়ে তারা চলেছে। প্রতিটি পালে একশ থেকে পাঁচশ হাতি। মাঝখানে ফাঁক রেখে পালগুলো একটার পর আরেকটা এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি পাল হয়ে উঠেছে গায়ে গায়ে লাগা হাতির এক একটা বিরাট পিণ্ড। পাহাড়ের উপর থেকে মনে হচ্ছে একটা বিরাট ধূসর দ্বীপ যেন এগিয়ে চলেছে, শতশত পিঠের বন্ধুরতায় রচিত তার ত্বকে দাঁতের সাদা রেখার আঁচড়।

জলায় এসে পালগুলো লম্বা সরু রেখায় ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটা হাতি দল ছেড়ে একপাশে ছুটে গিয়ে বড় বড় কানগুলো ছড়িয়ে পিছনের পাদুটো মজা করে ফাঁক করে দাঁড়াল। পরেই অবশ্য আবার দলে যোগ দিল।

কোন কোনটা, বিশেষ করে প্রকাণ্ড মদ্দা হাতিগুলো, মাথা আর কান নামিয়ে ধীরে সুস্থে হেঁটে চলেছে। অন্যেরা গম্ভীর চালে এগিয়ে চলেছে শরীরের সামনের অংশটা উঠিয়ে রেখে, পিছনের পাদুটো একটায় আরেকটা ছুঁইয়ে। আরেকদল আবার পাশাপাশি হাঁটছে, তাদের সরু ল্যাজগুলো উপরে ওঠা। কত আকারের সব দাঁত। কোনটা ছোট, কোনটা আবার এত লম্বা যে প্রায় মাটিতে ঠেকে, কোনটার ডগা উপর দিকে বাঁকা, অন্যগুলো একেবারে সোজা। ধূসর পটভূমিকায় চমকে উঠছে সাদা দাঁতগুলো।

পান্দিওনের কানের কাছে মুখ এনে কিদগো ফিসফিস করে বলল, 'হাতিগুলো জলা আর নদীর দিকে চলেছে। ঘাসের প্রান্তর সব পুড়ে গেছে কিনা।'

'শিকারীরা কোথায়?' পান্দিওন জিজ্ঞেস করল।

'ওরা সব ওত পেতে আছে। অনেক বাচ্চা হাতি নিয়ে একটা পাল সবসময় পিছনে থাকে। সেটার জন্যই ওরা অপেক্ষা করছে। দেখছ তো, এই পালগুলোয় সব কটাই বড় হাতি ...'

'আচ্ছা, কোন কোন হাতির দাঁত দেখছি বেশ লম্বা, কোন কোনটার আবার ছোট। এরকম কেন হয়?'

'ছোট দাঁত যাদের তাদের দাঁত ভেঙে গেছে।'

'নিজেদের মধ্যে লড়াই করে?'

'শুনেছি হাতিরা ক্বচিৎ নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। গাছ উপড়াতে গিয়েই সাধারণত ওদের দাঁত ভাঙে। দাঁত দিয়ে হাতিরা গাছ উপড়ে ফেলে ফলপাকড়ি, পাতা আর সরু ডাল খায়। প্রান্তরের হাতির চেয়ে বনের হাতির দাঁতের জোর বেশি। সেই কারণেই শক্ত হাতির দাঁত বাজারে চালান যায় বন থেকে, নরম দাঁত প্রান্তর থেকে।'

'এগুলো কোথাকার হাতি, বনের না প্রান্তরের?'

'প্রান্তরের, নিজেই দেখ না।' পিছিয়ে পড়া একটা বুড়ো হাতিকে দেখিয়ে কিদগো বলল। হাতিটা তাদের কাছাকাছিই ছিল।

হাঁটু পর্যন্ত ঘাসে ডোবা। মাথা ঘুরিয়ে হাতিটা পান্দিওনদের দিকে ফিরল। দুপাশে তার চওড়া কানদুটো টান করা পালের মতো মেলে দেওয়া। হাতিটা মাথা নামাতে তার ঢালু কপালটা সামনে বেরিয়ে এল। কপালে দেখা দিল গভীর গর্ত। সারা মাথাটা হয়ে উঠল নিচের দিকে সরু হয়ে আসা একটা স্তম্ভের মতো। কখন যে সেটা পরিণত হয়েছে খাড়া, ঝুলে থাকা শুঁড়ে তা বোঝার উপায় নেই। শুঁড়ের গায়ে কিছু পর পরই মোটা আংটার মতো গোল ভাঁজ। শুঁড়ের একেবারে উপরে দুপাশে একটু নিচের দিকে বেরিয়েছে যেন দুটো চামড়ার নল তার ভিতর থেকে বেরিয়েছে খুব বেঁটে আর মোটা দুটো দাঁত।

'ওগুলো যে প্রান্তরের হাতি তা তুমি কী করে ধরলে বুঝতে পারলাম না,' শান্ত বুড়ো হাতিটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে বলল পান্দিওন।

'দাঁতগুলো দেখেছ? ভাঙেনি। ক্ষয়ে গেছে। বুড়ো বলে কম গজায়। নরম দাঁত, তাই ক্ষয়ে গেছে। বনের হাতির কখনো এরকম দাঁত দেখা যায় না। তাদের দাঁত অধিকাংশই বেশ লম্বা আর সরু ...'

পান্দিওনরা ফিসফিস করে কথা বলে চলেছে। ওদিকে এগিয়ে চলেছে সময়। হাতির প্রথম পালগুলো দিগন্তে মিলিয়ে গিয়ে একটা সরু রেখায় পরিণত হয়েছে।

বাঁ দিক থেকে আরেকটা বড় পাল এল। সামনে চারটে অত্যাশ্চর্য বিরাট মদ্দা হাতি, প্রায় আট হাত উঁচু। পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে দুলছে তাদের মাথাগুলো। লম্বা স্বল্প বাঁকা দাঁতগুলো চলার তালে তালে উঠছে নামছে, একেক সময় তাদের ছুঁচলো ডগা ঘাসেও ঠেকছে।

পালটায় অনেক মাদী হাতি। নিচু পিঠ আর দুপাশের চামড়ায় বিরাট বিরাট ভাঁজ দেখে তাদের চেনা যায়। বাচ্চা হাতিরা মায়েদের পিছনের পা ঘেঁষে ঘেঁষে টলমল করে হাঁটছে। এক পাশে দল বেঁধেছে ফুর্তিবাজ তরুণ হাতিরা। ছোট ছোট দাঁত আর কান, ছোট লম্বা মাথা, বড় পেট, সামনের আর পিছনের পায়ের সমান দৈর্ঘ্য দেখে তাদের বড়দের থেকে আলাদা করে চেনা যায়।

পান্দিওনরা বুঝল, শিকারের চরম মুহূর্ত এবার এসে গেছে। বাচ্চা হাতিদের পক্ষে জলার উপর দিয়ে হাঁটা খুব কষ্টকর। হাতির পালটা তাই আরো ডাইনে সরে ঝোপজঙ্গল আর খাপছাড়া কয়েকটা গাছের মাঝখানের শক্ত মাটি ধরে এগোচ্ছে।

'হাতির মতো ভারী জন্তু জলায় কেন আটকে যায় না বল তো?' পান্দিওন জিজ্ঞেস করল।

'ওদের পা যে বিশেষভাবে তৈরী,' কিদগো বলল, 'ওরা ...'

হঠাৎ শোনা গেল প্রচণ্ড আওয়াজ। মাদল আর ঝাঁঝর বাজিয়ে পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল শিকারীরা। সে চীৎকার এত অপ্রত্যাশিতভাবে ছড়িয়ে পড়ল প্রান্তরে যে পান্দিওনরা চমকে উঠে চুপ করে গেল।

হাতির পালটা ভয় পেয়ে জলার দিকে ছুটল। কিন্তু সেখানেও আরেক দল লোক মাদল নিয়ে দাঁড়িয়ে। ঘাসের উপরে মাথা তুলেছে তাদের

শিঙাগুলো। সামনের হাতিগুলো পেছতে লাগল। পিছন থেকে অন্যদের চাপ তাদের থামিয়ে দিল। ভীত হাতির দলের তীব্র বৃংহিত, ঝাঁঝরের ঝমাঝম, ডালপালা ভাঙার মড়মড় আওয়াজ — এই প্রচণ্ড গোলমালের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল বাচ্চা হাতিদের সরু করুণ ডাক। হাতিরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি সুরু করল। কখনো কখনো একসঙ্গে হয়ে যায়, তার পর আবার ছড়িয়ে পড়ে। উৎক্ষিপ্ত বিরাটকায় জন্তুগুলোর ক্ষেপামিতে ধুলোর ঝড় উঠছে। তার মধ্যে দেখা যেতে লাগল শিকারীদের আবছা ছায়া। হাতির দিকে এগিয়ে না গিয়ে শিকারীরা তখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে বেড়াচ্ছে। তারপর আবার দল বেঁধে ঝাঁঝর বাজান সুরু করছে। শিকারীদের মতলবটা ক্রমশ বন্ধুদের কাছে পরিষ্কার হল। বড়দের কাছ থেকে বাচ্চাদের আলাদা করে ফেলে শিকারীরা তাদের ডাইনে একটা শুকনো জলখাতের চওড়া উপত্যকার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টায় রয়েছে। উপত্যকাটা পাথুরে পাহাড়মালার ভিতরে ঢুকেছে, সেটাকে আটকে রয়েছে একটুকরো বন। চড়াও হওয়া শত্রুদের মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য হাতিগুলো হঠাৎ হঠাৎ শিকারীদের তাড়া করে যায়। শিকারীরা তখন শূন্যে লাফিয়ে উঠে ঝোপঝাড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। ক্ষেপা হাতিগুলো যখন শুঁড় নেড়ে লুকিয়ে পড়া শত্রুর জন্য এদিক ওদিক তাকায় নতুন একদল শিকারী তখন আরেক দিকে ঝমাঝম ঝাঁঝর বাজিয়ে পাগলের মতো চীৎকার করে ওঠে। হাতিগুলো তখন নতুন দলের দিকে তেড়ে যায়। সে দলও আবার বাচ্চাগুলোকে আলাদা করে ফেলার চেষ্টায় অন্যদের কায়দা মতো চলে।

হাতির পালটা ক্রমেই ঘাসের প্রান্তরে সরে যেতে লাগল। তাদের ধূসর গা অদৃশ্য হয়ে গেল গাছের আড়ালে। শিকারের জায়গার হদিশ পাওয়া গেল কেবল ধুলোর ঝড় আর কানে তালা ধরান চীৎকারে।

শিকারীদের সাহস আর কৌশলে পান্দিওনরা অবাক, ক্ষেপা হাতির আক্রমণ এড়িয়ে কী নির্ভয়েই না তারা তাদের বিপজ্জনক শিকার চালিয়ে গেল। পান্দিওনরা নীরবে ফাঁকা মাঠটার দিকে চেয়ে রইল। মাঠের

গাছপালা ঝোপঝাড় সব উৎখাৎ হয়ে গেছে। দূরের আওয়াজ শুনে কিদগোর ভুরু কুঁচকে গেল। মৃদুস্বরে বলে উঠল:

'কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে ... শিকার তো ঠিকভাবে হচ্ছে না!'

'কী করে বুঝলে?' কাভি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ওরা আশা করেছিল হাতির পালটা পূব দিকে যাবে। তাই আমাদের এখানে এনেছিল। কিন্তু পালটা ডাইনে গেছে, ব্যাপারটা বোধ হয় খারাপ হল।'

'চল, পাহাড়ের প্রান্ত বেয়ে যেদিক দিয়ে এসেছিলাম সেদিকেই যাই,' পান্দিওন বলল।

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে কিদগো রাজী হয়ে গেল। শিকারের হৈচৈ গোলমালে তাদের আসা না আসায় কিছুই এসে যাবে না।

গুড়ি মেরে পাথর আর ঘাসের আড়ালে আড়ালে তিন বন্ধু যে দিক দিয়ে এসেছিল সেদিকেই হাজার খানেক হাত এগিয়ে গেল। সামনেই আবার একটা খোলা প্রান্তর।

পাহাড়ের গায়ের সরু খাদটা তারা দেখতে পেল। গোটা দশেকেরও বেশি বাচ্চা হাতিকে শিকারীরা সেখানেই তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে ছুটে শিকারীরা খুব কৌশলের সঙ্গে হাতিগুলোর উপর ফাঁস ছুঁড়ে ধরছে। তারপর বেঁধে দিচ্ছে গাছের সঙ্গে।

সরু খাদে ঢোকার মুখে বর্শা হাতে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে এক দল শিকারী। সামনে আর ডাইনে হাজার দুয়েক হাত দূরে প্রচণ্ড গোলমাল চেঁচামেচি। পালের বাকি হাতিগুলো নিশ্চয় ঐ দিকেই গেছে।

হঠাৎ একেবারে সামনে আর বাঁ পাশ থেকে শোনা গেল সাংঘাতিক ছাড়া ছাড়া বৃংহিত। কিদগো শিউরে উঠে ফিসফিস করে বলল, 'হাতিগুলো আক্রমণ করেছে।'

একজনের টানা আর্তনাদ শোনা গেল। আরেকজন ক্রুদ্ধ ধমকে কী যেন একটা বলে উঠল আদেশের সুরে।

সামনের প্রান্তরটায় দূরে দুটো ডালপালা ছড়ান বড় গাছ বিরাট ছায়া ফেলেছে। পান্দিওনদের চোখে পড়ল সেখানে কী একটা নড়াচড়া করছে।

এক মুহূর্ত পরেই একটা মস্ত হাতিকে সেখানে দেখা গেল। মাথার সামনে বাড়ান শুঁড়টাকে দেখাচ্ছে কাঠের গুঁড়ির মতো, কানদুটো মেলে দেওয়া। তার পিছনে আরো দুটো দৈত্যের মতো হাতি। হাতিগুলোকে পান্দিওন চিনতে পারল। এরাই হচ্ছে বিরাটকায় যূথপতি। যূথপতিদের চতুর্থটি একটু দূরে, তার সঙ্গে আরো কয়েকটি হাতি। ডান হাতের ঝোপগুলো থেকে শিকারীরা ছুটে বেরিয়ে এল। হাতিগুলোকে দলছাড়া করে ফেলা তাদের উদ্দেশ্য। হাতিগুলোর মাঝখান দিয়ে গিয়ে সব শেষের হাতিটার গায়ে তারা বর্শা ছুঁড়ে মারল। হাতিটা সাংঘাতিকভাবে ডেকে উঠে শিকারীদের তেড়ে এল। শিকারীরা তখন কিন্তু জলার দিকে দৌড় মেরেছে। অন্য হাতিগুলোও ঐ হাতিটার পিছু নিল। শিকারীরা যে তাদের দলছাড়া করিয়ে দেবার মতলবে আছে যূথপতি তিনটের সেদিকে কোনই খেয়াল নেই। তারা পাহাড়ের মাঝখানের উপত্যকার দিকে সবেগে ছুটতে লাগল, হয়ত বাচ্চা হাতিদের ডাক শুনেই।

'খুব খারাপ, যূথপতিরা অন্যদিক থেকে ফিরে এসেছে,' উত্তেজনার চোটে পান্দিওনের হাত সজোরে চেপে ধরে বলে উঠল কিদগো।

'দেখ ... দেখ, একেই বলে বীরত্ব,' সব কিছু ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কাভি।

উপত্যকার মুখে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, ক্ষেপা হাতির কাছ থেকে নিজেদের লুকোবার জন্য একপা নড়ল না। দীর্ঘ সারিতে তারা সামনে এগিয়ে এল। নিচু পোড়া ঘাসে তাদের প্রত্যেকটি নড়াচড়া খুব স্পষ্টই দেখা যায়।

সামনের হাতিটা সোজা শিকারীদের সারির মাঝবরাবর এগোতে লাগল। দুজন লোক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, তাদের দু পাশের লোকেরা লাফিয়ে পড়ল ছুটে আসা হাতিটার সামনে। হাতিটা তার বেগ একটু কমিয়ে দিয়ে আকাশে শুঁড় তুলে বীভৎসভাবে শিস দিয়ে শিকারীদের তেড়ে এল। হাতিটা যখন মাত্র হাত দশেক দূরে তখন সেই বীর শিকারী দুজন বিদ্যুদ্‌গতিতে লাফিয়ে দুপাশে সরে গেল। ঠিক সেই সঙ্গেই একেবারে হাতিটার পিছনের পাদুটোর কাছে উঠে এল দুজন করে লোক।

দুজন বর্শা গেঁথে দিল হাতিটার পেটে, বাকি দুজন পিছনে হেলে পড়ে হাতিটার পাদুটোয় ঘা মারল।

যূথপতির উপরে তোলা শুঁড় থেকে বেরিয়ে এল তীব্র এক শীৎকার। শুঁড়টা নামিয়ে হাতিটা ডান দিকে শিকারীটির প্রতি মাথা ঘোরাল। শিকারীটি সরে যেতে পারল না ... তার শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটতে লাগল রক্ত। লোকটির কাঁধ আর একপাশের সাদা হাড়গুলো পান্দিওনের চোখে পড়ল। আহত লোকটি টুঁ শব্দটি না করে মাটিতে পড়ে গেল। ভারী হাতিটাও সেই সঙ্গে ধপাস করে পড়ল, তারপর ধীরে ধীরে একপাশে গুড়ি মেরে সরে যেতে লাগল। হাতিটাকে ছেড়ে দিয়ে শিকারীরা অন্যদের দলে যোগ দিল। তারা তখন বাকি দুটো যূথপতিকে ঠেকাতে ব্যস্ত। হাতিদুটো হয় খুবই বুদ্ধিমান, নয়ত মানুষের পরিচয় আগেই পেয়েছে। হাতিদুটো খালি এপাশ থেকে ওপাশে ছুটে যায়, কিছুতেই শিকারীদের পিছন থেকে লুকিয়ে আসার সুযোগ দেয় না। তিনজন লোককে হাতিদুটো থেঁৎলে শেষ করে দিল।

লড়াই ক্ষেত্রের ধুলোর ঝড় সূর্যাস্তের রঙে রাঙা হয়ে উঠল। হাতিগুলোকে দেখে মনে হল যেন বিরাট বিরাট সব কালো মিনার। তাদের পায়ের কাছে ছোটাছুটি করছে একদল নির্ভীক মানুষ। লম্বা দাঁত এড়াবার জন্য তারা শূন্যে লাফিয়ে উঠছে, বর্শা মাটিতে গেঁথে দিয়ে ভীষণ চীৎকার করে উঠে ছুটে চলে যাচ্ছে হাতির পিছনে যাতে হাতিগুলোর নজর অন্য শিকারীদের ওপর না পড়ে, নয়ত তাদের মৃত্যু অনিবার্য।

হাতিগুলো পাগলের মতো ডেকেই চলেছে। পান্দিওনদের পাহাড়টার দিকে যখন তারা মুখ ফেরায় তখন তাদের অস্বাভাবিক রকম উঁচু দেখায়, মেলে দেওয়া কানগুলো শিকারীদের মাথার অনেক উপরে নাচতে থাকে। তাদের পাশে মাথা নোয়ান হাতিটাকে ছোট দেখায়। দাঁতগুলো প্রায় মাটি চিরে ফেলেছে। শত্রুকে ফুঁড়ে দিতে তারা প্রস্তুত। তিন বন্ধু বুঝল যুদ্ধের একটা অংশ মাত্র তারা দেখতে পাচ্ছে। ঐ গাছের সারি পেরিয়ে যেখানে সারা পালটা জমায়েৎ হয়েছে সেখানেও লড়াই চলেছে। লড়াই চলেছে বাঁ

দিকে জলায় যেখানে চতুর্থ যূথপতি আর তার দলবলকে শিকারীরা তাড়িয়ে নিয়ে গেছে সেখানেও। ঐ দুই যুদ্ধক্ষেত্রে যে কী ঘটছে পান্দিওনরা তা জানে না। কিন্তু ও নিয়ে মাথা ঘামাবার ফুরসৎও তাদের নেই, সামনে যে রক্তাক্ত কান্ড ঘটে চলেছে তা থেকে চোখ সরাবার এতটুকু সময়ও নেই।

শোনা গেল গাছের সারির পিছন থেকে এগিয়ে আসা মাদলের গুরু গুরু আওয়াজ। একদল শিকারী তাদের সঙ্গীদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে। যূথপতিরা কী করবে ভেবে না পেয়ে থেমে গিয়েছিল। শিকারীরা বীভৎস চীৎকার করে উঠে বর্শা দোলাতেই তারা পিছিয়ে গেল। আহত হাতিটার কাছে ছুটে এসে হাঁটু মুড়ে হাতিগুলো তার দুপাশে দাঁড়াল। তার পেটের তলে দাঁত ঢুকিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর তাকে তাদের বিরাট শরীর দিয়ে চেপে রেখে গাছগুলোর পিছনে টেনে নিয়ে গিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর আবার তাকে একইভাবে তুলে নিয়ে চলতে লাগল। কয়েকজন শিকারী হাতিগুলোর পিছনে ছুটেছিল, কিন্তু সর্দার শিকারী তাদের থামিয়ে দিল।

'ও যেতে পারবে না ... কিছুক্ষণ পরেই ওরা হাতিটাকে ফেলে রেখে চলে যাবে ... ওদের ক্ষেপিয়ে দিও না ...'

সর্দার শিকারীর কথা কিদগো অনুবাদ করে দিল।

ডান দিকে চীৎকার গোলমাল তখন থেমে আসছে। তার মানে শিকারীরা জিতেছে। উত্তরের জলার দিক থেকে দুটি অনড় মানুষকে বয়ে নিয়ে এল একদল শিকারী। তিন বন্ধু যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণের জন্য সন্তর্পণে প্রান্তরে নেমে এল। শিকারীরা কেউ তাদের খেয়ালই করল না। প্রধান হাতির পালটা যেখানে আটকা পড়েছে সেইদিকেই তারা এগিয়ে গেল। ঝোপঝাড় ঠেলে এগোতে এগোতে হঠাৎ ভয়ে লাফ মেরে পিছিয়ে এল কিদগো। একটা ভাঙা গাছের ডালপালায় শুয়ে আছে একটা মুমূর্ষু হাতি। তার শুঁড়ের ডগাটা তখনো একটু নড়ছে। গাছটা তার ধাক্কাতেই ভেঙে পড়েছে। আরো এগিয়ে যেখানে গাছপালা কম সেখানে আরেকটা হাতি পা মুড়ে পিঠ কুঁজো করে পেটের উপর ভর দিয়ে পড়ে

আছে। বিরাট এক ধূসর পিণ্ড। মানুষের শব্দ শুনেই হাতিটা মাথা তুলল। তার নিষ্প্রভ, কোটরে বসা চোখের চারপাশে লোল চামড়া। মুখে তার বার্ধক্যের অসীম ক্লান্তির ছাপ। মাথা নামিয়ে দাঁতদুটোর উপর হাতিটা ভর রাখল। তারপর ধপ করে একপাশে পড়ে গেল। চারদিকে শোনা গেল শিকারীদের হাঁক ডাক। হাত নেড়ে কিদগো পিছন ফিরল — আরেক পাল হাতি দক্ষিণ দিকে দেখা দিয়েছে। পান্দিওনরা তাড়াতাড়ি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু বিপদের কোন কারণ নেই — দক্ষিণ থেকে আসছে হাতি জাতিদের পোষ মানা হাতির পাল।

গাছের সঙ্গে বাঁধা তরুণ হাতিগুলো ল্যাজ তুলে শুঁড় বাড়িয়ে শিকারীদের ধরার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে। মাহুতরা প্রতিটি বন্দী হাতির দুপাশে দাঁড় করিয়ে দিল একটা করে পোষা হাতিকে। তারা বন্দীদের দুপাশ থেকে চেপে রেখে গ্রামের দিকে নিয়ে গেল। সাবধানের মার নেই বলে বাচ্চা হাতিগুলোর প্রত্যেকটার গলায় আর পিছনের পায়ে দড়ির বাঁধন। সামনে আর পিছনে পনের জন লোকের হাতে সে দড়ি ধরা। শিকারের ভীষণ উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায় শিকারীদের মুখ জীর্ণ ক্লান্ত। সবাই গম্ভীর বিষণ্ণ। হাতির পিঠের পাতার হাওদায় চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এগারটি নিস্পন্দ অনড় শিকারীকে। আরো দুজনকে পাওয়া যাচ্ছে না, ঝোপঝাড়ে এখনো তাদের খোঁজ করা হচ্ছে।

বন্দী হাতিদের নিয়ে পোষ মানা হাতিগুলো চলে গেল। শিকারীরা কেউ মাটিতে বসে, কেউ বা শুয়ে পড়ে বিশ্রাম করতে লাগল। পান্দিওনরা সর্দার শিকারীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, তারা কোন সাহায্যে লাগতে পারে কিনা। সর্দার তাদের দিকে তাকিয়ে রুক্ষ গলায় বলে উঠল:

'সাহায্য? তোমরা আবার কী সাহায্য করবে বিদেশী? খুব সাংঘাতিক শিকার গেল। অনেক সাহসী শিকারীকে আমরা আজ হারিয়েছি। তোমাদের যেখানে থাকতে বলা হয়েছে সেখানেই থাক। গোলমাল কর না!'

এদের উপরেই তিন বন্ধুর সারা ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাই ওদের আর ঘাঁটাতে না চেয়ে তারা পাহাড়ের গায়ে নিজেদের জায়গায় এসে বসল।

যতক্ষণ না তাদের ডাক পড়ল ততক্ষণ ঐখানেই শুয়ে শুয়ে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে তারা গল্প করে চলল। সূর্য তখন অস্তে ঢলে পড়েছে। পাহাড়ের খাঁজকাটা দীর্ঘ ছায়া এসে পড়েছে প্রান্তরের বুকে। কাভি চিন্তান্বিত স্বরে বলল:

'বিরাট বিরাট হাতিগুলো কেন শিকারীদের সবাইকে মেরে ফেলল না, তা বুঝতে পারছি না। ভালভাবে লড়াই করতে পারলে হাতিগুলো তো শিকারীদের ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারত ...'

কিদগো সমর্থন জানাল, 'ঠিক বলেছ। হাতিদের হৃদয় যে দুর্বল। মানুষের পক্ষে সেটা সৌভাগ্যের কথা।'

'তা কী করে হয়?' কাভি অবাক হয়ে বলে উঠল।

'হাতি কখনো লড়াই করে অভ্যস্ত নয়। ওরা এত বিরাট আর শক্তিশালী যে অন্য কোন জন্তু কখনো তাদের আক্রমণ করে না। মানুষ ছাড়া আর কারো নেই হাতি শিকারের সাহস। তাই হাতির কোন বিপদ আপদও নেই। সেই জন্যই হাতিরা ভাল লড়তে পারে না। তাদের মনোবল সহজেই ভেঙে পড়ে। শত্রুকে সঙ্গে সঙ্গেই পিষে ফেলতে না পারলে হাতি গেল। অনেকক্ষণ ধরে লড়াই করার মুরদ তার নেই। মহিষ ঠিক এর উল্টো। মহিষের যদি হাতির মতো বুদ্ধি আর বিরাট শরীর থাকত, তবে মহিষ-শিকারী সবাই মারা পড়ত।'

কাভি বিড়বিড় করে কী একটা যেন বলে উঠল। কিদগোর কথাটা বিশ্বাস করবে কিনা সে বুঝতে পারল না। তারপর তার মনে পড়ল যুদ্ধের চরম মুহূর্তে হাতিদের দ্বিধা সেও লক্ষ্য করেছে। তাই সে আর কিছু বলল না।

পান্দিওন বলল, 'হাতি জাতিদের বর্শা আমাদের বর্শার চেয়ে একেবারেই অন্যরকমের। এদের বর্শার ফলাটা আট আঙুল চওড়া! এ বর্শা চালাতে প্রচণ্ড জোরের প্রয়োজন হয়।'

কিদগো হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে কী যেন শুনতে লাগল। শিকারীরা যেখানে বিশ্রাম করছিল সে দিক থেকে তো কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না। সূর্যাস্তের সোনালি আলোমাখা আকাশ দ্রুত অন্ধকার হয়ে উঠছে।

'ওরা দেখছি আমাদের কথা ভুলে গিয়ে চলে গেছে,' চেঁচিয়ে উঠে কিদগো পাথরের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল।

কেউ কোথাও নেই। দূরে অল্প অল্প শোনা যাচ্ছে মানুষের গলা। শিকারীরা পান্দিওনদের ফেলে রেখেই গ্রামের দিকে রওনা হয়েছে।

'চল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি, বহুদূরের পথ,' পান্দিওন ব্যস্ত হয়ে উঠল।

কিদগো কিন্তু তাকে ধরে রাখল। বলল:

'অনেক দেরী হয়ে গেছে। এক্ষুনি সূর্য ডুবে যাবে। অন্ধকারে আমরা পথ হারিয়ে ফেলব। বরঞ্চ এইখানেই অপেক্ষা করা ভাল চাঁদ ওঠা পর্যন্ত। তার বেশি দেরী নেই।'

পান্দিওন আর কাভি তার কথা মেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

বাতাসের সন্তান

দুর্ভেদ্য অন্ধকারে হায়েনার আর্তনাদ আর শেয়ালের করুণ ডাক। উৎকণ্ঠিত কিদগো চেয়ে রয়েছে পুব দিকে। সেখানে গাছের মাথায় ধূসর ছাই রঙা ছোপ। চাঁদ উঠছে।

'এখানে বুনো কুকুর আছে কিনা কে জানে। থাকলে বিপদ হবে। দল বেঁধে আক্রমণ করে কুকুররা, মহিষকেও ঘায়েল করে দেয় ...' কিদগো বিড়বিড় করতে লাগল।

আকাশে আলো দেখা দিল। কঠোর কালো পাথরগুলোয় রুপোলি ছোঁওয়া। ফুটে উঠল সমতলের গাছগুলোর কালো ছায়া। চাঁদ উঠল।

পাথুরে পাহাড়ের পথ ধরে তিন বন্ধু এগোল দক্ষিণ মুখে। বর্শাগুলো শক্ত করে ধরা। মরা হাতির মাংস খাওয়ায় ব্যস্ত মাংসলোলুপে ছেয়ে গেছে বিষণ্ণ লড়াইক্ষেত্র। পান্দিওনরা সে জায়গাটা ছেড়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল। জন্তুদের আর্তনাদ গেল পিছনে মিলিয়ে। চারদিকের প্রান্তর যেন সম্পূর্ণ মৃত। কেবল তিনজন যাত্রীর দ্রুত পদক্ষেপে রাত্রির নিস্তব্ধতা ব্যাহত।

ঘাসের উপর রহস্যময় কালো টিলার মতো মাথা তুলে দাঁড়ান ঘন গাছপালা, জঙ্গলগুলোকে কিদগো সযত্নে এড়িয়ে চলেছে। খোলা প্রান্তরটা যেন গাছপালায় ঘেরা কালো দ্বীপের গোলকধাঁধায় ভরা সাদা হ্রদ। কিদগো সেই খোলা মাঠের মাঝখান দিয়েই চলতে লাগল।

পাথুরে পাহাড়ের মালা পশ্চিমে ঘুরল। পথে একটা সরু কুঞ্জ পড়ায় পান্দিওনদের পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলতে হল। ডাইনে বেঁকে একটা দীর্ঘ পাথুরে ডান দিকে ঢালু হয়ে নামা মাঠ ধরে এগোতে এগোতে কিদগো হঠাৎ থেমে গেল। তারপর সাঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে কী যেন শুনতে লাগল। পান্দিওন আর কাভি কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও কিছুই শুনতে পেল না। চারিদিক আগের মতোই নিস্তব্ধ।

কিদগো একটু ইতস্তত করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। কাভি আর পান্দিওনের ফিসফিস প্রশ্নের কোনই জবাব দিল না। হাজার খানেক হাত গিয়ে কিদগো থামল। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় দেখা গেল তার দু চোখে উৎকণ্ঠার ছায়া।

‘কিছু একটা আমাদের পিছু নিয়েছে,’ বলেই সে মাটিতে কান পেতে শুয়ে পড়ল।

পান্দিওনও তার বন্ধুকে অনুসরণ করল। কাভি কিন্তু দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার রুপোলি পর্দা ভেদ করে দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

গরম পাথুরে মাটির উপর কান দিয়ে পান্দিওন শুয়ে আছে। প্রথম

প্রথম সে নিজের নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেল না। সেই নৈঃশব্দ্য আর ভয়াবহ অনিশ্চয়তা তাকে শংকিত করে তুলল।

হঠাৎ দূর থেকে মাটির গা ফুঁড়ে ভেসে এল একটা ক্ষীণ, প্রায় দুঃশ্রাব্য আওয়াজ। শব্দটা নিয়মিত ছন্দে আরো ঘন ঘন হয়ে উঠল — ক্লিক্, ক্লিক্, ক্লিক্। পান্দিওন একঝটকায় মাথা তুলল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা মিলিয়ে গেল। কিদগো প্রথমে একটা তারপর আরেকটা কান মাটিতে রেখে কিছুক্ষণ পর্যন্ত শুনল। তারপর স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠল।

'একটা মস্ত বড় জন্তু আমাদের পিছু নিয়েছে... মুশকিল হল, কী জন্তু তা জানি না। কুকুর আর হায়েনার মতো তার নখগুলো বাইরে বের করা। তার মানে সিংহ বা চিতাবাঘ নয়...'

'মহিষ বা গণ্ডার হবে,' কাভি বলল।

কিদগো জোরে মাথা নাড়ল।

'না, না, শিকারী জন্তু... লুকতে হবে... কাছাকাছি কোন গাছও নেই,' শংকিত চোখে চারদিকটা দেখে নিয়ে সে ফিসফিস করে বলল।

সামনে সমান পাথুরে মাঠ। এখানে ওখানে কিছু ঘাস আর ঝোপঝাড়।

'এগোও, যত জোর পার এগোও!' কিদগো তাড়া দিয়ে উঠল। ঝোপঝাড়ের কাঁটা আর শুকনো মাটির ফাটল এড়িয়ে তারা সাবধানে ছুটে চলল।

পিছনে পাথুরে মাটির গায়ে ভারী নখরের শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে শব্দ দ্রুত হয়ে ওঠায় বোঝা গেল জন্তুটাও দৌড়চ্ছে। ক্লিক্, ক্লিক্, ক্লিক্ — ভোঁতা আওয়াজটা ক্রমেই এগিয়ে আসতে থাকল।

পান্দিওন মাথা ঘুরিয়ে দেখল একটা দীর্ঘ ধূসর ছায়া দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

কিদগো খালি এপাশ ওপাশ তাকাচ্ছে। দেখছে সামনে কোথাও যদি গাছ মেলে। সেই সঙ্গে অজানা জন্তুটার গতিবেগও আঁচ করার চেষ্টা করছে। সে দেখল গাছ অনেক দূরে, সেখানে পেঁছিবার সময় তারা পাবে না। তাই সে দাঁড়িয়ে পড়ে উত্তেজিত স্বরে বলল:

'জন্তুটা আমাদের ধরে ফেলছে। পিছন ফিরে থাকলে আমাদের অত্যন্ত কাপুরুষের মতো মারা পড়তে হবে!..'

কাভি বিষণ্ণ গলায় বিড়বিড় করে বলল:

'ওটার সঙ্গে লড়তে হবে।'

নীরবে এগিয়ে আসা ভয়াবহ ধূসর ছায়াটার দিকে ফিরে তিনজন বন্ধু পাশাপাশি দাঁড়াল। তাড়া করার সময় জন্তুটা একবারও কোনরকম ডাক ছাড়েনি। এ বড়ই অদ্ভুত। সমতলের শিকারী জন্তু কখনো এরকমটা করে না। তিন বন্ধু তাতেই আরো বেশি শংকিত।

আবছা ধূসর শরীরটা আরো ঘন হয়ে উঠল। স্পষ্ট হয়ে উঠল তার শরীরের ঘের। প্রায় শ তিনেক হাতের মধ্যে এসে যাবার পর জন্তুটা দৌড়ন বন্ধ করে মাপা পায়ে হাঁটতে সুরু করল। তার শিকার যে পালাবে না সে বিষয়ে সে নিশ্চিত।

এরকম জন্তু তিন বন্ধু আগে কখনো দেখেনি: জন্তুটার সামনের মোটা মোটা পাদুটো পিছনের পায়ের চেয়ে অনেক লম্বা। শরীরের সামনের অংশটা পিঠের মাঝখানটার অনেক উপরে উঠেছে। পিঠটা ক্রমশ পাছার দিকে ঢালু হয়ে গেছে। মস্ত মাথাটা কেঁদো ঘাড়ের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। মোটা চোয়াল, আর খাড়া বেরিয়ে-আসা কপাল। ছোট ছোট লোমে ঘন রঙের ফোঁটা। মাথার পিছনে, গলায় লম্বা খাড়া খাড়া কালো লোম। চিতাহায়েনার সঙ্গে জন্তুটার কিছু মিল আছে কিন্তু আকারে অনেক বড়। এত বড় জন্তু কেউ কখনো দেখেনি। মাথাটা তার মাটি থেকে পাঁচ হাত উঁচুতে। মস্ত ছাতি, ঘাড় আর পিঠের বিরাট বহর দেখে ভয় হয়। মাংসপেশীগুলো ঢিবির মতো বেরন। নখওয়ালা বিরাট বিরাট থাবাগুলো মাটির বুকে আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে। সে শব্দ শুনলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়।

জন্তুটা হাঁটছে অদ্ভুত খাপছাড়া চালে। নিচু পাছাটা দুলছে। ভারী মাথাটা নুয়ে পড়েছে, তলের চোয়ালটা তার ফলে প্রায় গলা ছুঁয়েছে।

'এটা কী?' শুকনো ঠোঁটদুটো চেটে নিয়ে পান্দিওন ফিসফিস করে বলল।

'জানি না। এরকম জন্তুর কথা কখনো কানেও শুনিনি...' হতভম্ব কিদগো বলল।

জন্তুটা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। তার ভাঁটার মতো চোখদুটো সোজা অপেক্ষারত মানুষদের দিকে তাকিয়ে, তাতে যেন আগুনের শিখার চমক। পান্দিওনদের ডান পাশে অর্ধবৃত্তাকারে সরে গিয়ে জন্তুটা আবার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে লাগল। মাথা থেকে তার গোল কানদুটো আড়ভাবে খাড়া বেরিয়ে আছে।

'খুব চালাক জন্তু — ঘুরে দাঁড়িয়েছে, চাঁদের আলোটা যাতে আমাদের সামনে থাকে।' খাবি খেতে খেতে কিদগো ফিসফিস করে বলল।

পান্দিওনের সারা শরীর তখন কেঁপে উঠেছে। কোন মারাত্মক লড়াইয়ের আগে সবসময়ই তার এরকম হয়।

জন্তুটা জোরে নিঃশ্বাস টেনে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। তার চলায় তার নিষ্ঠুর নীরবতায় আর বেরিয়ে-আসা কপালের নিচে তার ভাঁটার মতো চোখদুটোর স্থির দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যা পান্দিওনদের পরিচিত সবরকম জীবজন্তু থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। পান্দিওনরা সহজপ্রবৃত্তিবশে বুঝতে পারল, এ জন্তুটা প্রাচীন জগতের দুর্লভ নিদর্শন। এর জীবনযাত্রার নীতি সম্পূর্ণ অন্যরকমের। কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে বর্শাগুলো বাগিয়ে ধরে তিন বন্ধু এগিয়ে গেল এই নিশীথ দৈত্যের দিকে। মুহূর্তের জন্য জন্তুটা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা ছোট্ট কর্কশ আওয়াজ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পান্দিওনদের উপর। বিরাট চোয়ালটা খুলে গেল; চাঁদের আলোয় ঝলকে উঠল মোটা মোটা দাঁতগুলো। সঙ্গে সঙ্গেই জন্তুটার চওড়া বুক আর ঘাড় ফুঁড়ে ফেলল তিনটে বর্শা। কিন্তু তার ওজন তারা ধরে রাখতে পারল না। তাছাড়া জন্তুটার গায়ের জোরও প্রচণ্ড। বর্শাগুলো হাড়ে লেগে হড়কে গিয়ে হাতছাড়া হয়ে গেল, তিন জনে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। কিদগো আর পান্দিওন কোন রকমে উঠে দাঁড়াল, কাভি কিন্তু তখন জন্তুটার তলে। পান্দিওন আর কিদগো তাকে বাঁচাবার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটে এল। জন্তুটা পিছনের পায়ের উপর বসে হঠাৎ জোরে চালাল তার সামনের থাবাদুটো। পিছনে ভোঁতা

নখের এক ঘা খেয়ে ছিটকে পড়ে পান্দিওনের তো প্রায় জ্ঞান হারানর অবস্থা। বিরাট থাবাটা এসে পড়ল ঠিক তার পায়ের উপর। অসহ্য যন্ত্রণা, পায়ের জোড়গুলো মটমট করে উঠল। জন্তুটার নখে ছিঁড়েখুঁড়ে গেল চামড়া আর মাংস।

বর্শাটা ধরে রেখে দুহাতে ভর দিয়ে পান্দিওন উঠতে চেষ্টা করল। সেই সঙ্গে শুনতে পেল কিদগোর বর্শার ডাণ্ডা ভাঙার আওয়াজ। হাঁটু গেড়ে উঠে বসে সে দেখতে পেল কিদগোকে জন্তুটা পেড়ে ফেলেছে। খোলা মুখটা তার দিকে এগিয়ে আসছে। মুখটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য কিদগো দুহাত দিয়ে জন্তুটার তলের চোয়ালটায় বৃথাই চাপ দিচ্ছে। কিদগোর চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। পান্দিওনের বিশ্বস্ত বন্ধু তার চোখের সামনেই মারা পড়তে বসেছে! আত্মবিস্মৃত পান্দিওন সমস্ত ব্যথা ভুলে লাফিয়ে উঠে জন্তুটার গলায় বর্শা চালিয়ে দিতে জন্তুটা সগর্জনে দাঁত খিঁচিয়ে উঠে তার দিকে ঘুরে তাকে এক ঝটকায় ফেলে দিল। পান্দিওন কিন্তু বর্শা ছাড়ল না। ডাণ্ডাটা মাটিতে চেপে ধরে রেখে সে কিছুক্ষণের জন্য জন্তুটাকে আটকে রাখল। কিদগো সেই ফাঁকে তার ছুরিটা বের করে নিয়েছে। দুজনেই লক্ষ্য করেনি জন্তুটার ওপাশ থেকে কাভিও তখন উঠে এসেছে। কাভি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় জন্তুটার একপাশ লক্ষ্য করে ঠিক কাঁধের হাড়ের পিছনটায় দুহাতে বর্শা গেঁথে দিল। লম্বা ফলাটা ঢুকে গেল হাতখানেক। জন্তুটার হাঁ-করা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা গর্জন। শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে জন্তুটা বাঁয়ে কাভির দিকে ঘুরল। সে দুকাঁধ তুলে মাথাটা তার ভিতর গুঁজে দিয়ে টলমল করে উঠল কিন্তু পড়ল না! কিদগো তখন মারাত্মক চীৎকার করে উঠে জন্তুটার গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। ঠিক সেই সঙ্গেই কাভির বর্শাও পেঁছিল জন্তুটার হৃৎপিণ্ডে। মস্ত জন্তুটা মোচড় দিতে লাগল। চারদিক ভরে গেল অসহ্য দুর্গন্ধে। পান্দিওন তার বর্শা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার জন্তুটার ঘাড়ে বসিয়ে দিল, কিন্তু তার আর প্রয়োজন ছিল না। জন্তুটা গলা ছড়িয়ে দিয়ে কাভির পায়ে মুখটা গুঁজে দিল। পিছনের পাদুটোও ছড়িয়ে দিল। পাদুটো তখনো নড়ছে, নখগুলো মাটি আঁচড়াচ্ছে। মাংসপেশীগুলো চামড়ার তলে

কুঁচকে গেছে। গলার পিছনের শক্ত চুলগুলো কিন্তু একেবারেই শুয়ে পড়েছে। এই ভীষণ দৈত্যের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তিন বন্ধুর সে কী আনন্দ। চাঁদের আলোয় জন্তুটা তাদের সামনেই পড়ে রইল।

আত্মস্থ হতে তারা কার কোথায় কী আঘাত লেগেছে, তা দেখে নিল। কাভির কাঁধের একখাবল মাংস গেছে উড়ে, তাছাড়া পিঠটাও জন্তুটা লম্বা নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছে। পান্দিওনের পাটা ভাঙেনি কিন্তু পায়ের পাতায় একটা মস্ত গভীর ক্ষত। শিরাগুলো হয় ছিঁড়ে গেছে নয়ত এমন শ্লথ হয়ে গেছে যে পান্দিওন পা ফেলতে পারছে না। জন্তুটার থাবার ঘায়ে তার শরীরের পাশটা ফুলে কালশিরে পড়ে গেছে, কিন্তু পাঁজরা ভাঙেনি। কিদগোর চোট সবচেয়ে বেশি — কয়েকটা গভীর ক্ষত, খুবই থেঁৎলে গেছে।

নেংটি ছিঁড়ে তিন জনে তিন জনের ক্ষতবিক্ষত জায়গাগুলো বেঁধে দিল। অন্যদের চেয়ে পান্দিওনেরই দুশ্চিন্তা বেশি। পায়ের চোটটার জন্য সে হাঁটতে পারছে না।

কিদগো তার বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, বিপদ কেটে গেছে, দৈত্যটার লাশটা আছে বলে অন্য সব শিকারী জন্তু আর এদিক মাড়াবে না। সকাল বেলা তাদের অনুপস্থিতি নিশ্চয় হাতি জাতির লোকেদের নজরে পড়বে, তখন তারা ঠিক সন্ধানে বেরবে।

প্রাণপণে কাটাছেঁড়ার জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করে তিন বন্ধু শক্ত পাথরের উপর শুয়ে পড়ল। কিন্তু উত্তেজনার চোটে ঘুমতে পারল না।

অপ্রত্যাশিতভাবে বেশ শীগ্‌গীরই ভোর হয়ে গেল। রাত্রের যত রহস্যময় অমঙ্গুলে ছায়া মিলিয়ে গেল সূর্যের আলোয়। কিদগোর চীৎকার শুনে পায়ের যন্ত্রণায় কাতর পান্দিওন ক্লান্ত চোখ মেলে তাকাল। কিদগো তখন রাত্রে পিছু নেওয়া জন্তুটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে কাভিকে বলে চলেছে, তা-কেমের সাদাপ্রাচীর সহরে এক সমাধিতে অন্যান্য জন্তুর ছবির মধ্যে এই জন্তুর ছবিও সে দেখেছে। কাভি অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে তার তলের ঠোঁটটা বের করে বসে আছে। কিদগো অনেক দিব্যি গেলে কাভিকে বিশ্বাস করাতে চাইল, তা-কেমের লোকেরা সত্যিই দূর অতীতে এ জাতীয় জন্তু দেখেছে।

সূর্য আরো উপরে উঠল। তিন বন্ধুর তখন তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, ক্ষতের ফলে ভীষণ জ্বর। কিদগো আর কাভি ঠিক করল জলের সন্ধানে বেরবে। এমন সময় হঠাৎ মানুষের গলা শোনা গেল। শিকারীকে পিঠে নিয়ে তিনটে হাতি পাথুরে ঢালুর নিচু দিয়ে প্রান্তর পেরিয়ে আসছে। ঐ ঢালুটায় গত রাত্রে পান্দিওনদের সেই ভীষণ জন্তুটার সঙ্গে মোলাকাত হয়। কিদগোর চীৎকার শুনে শিকারীরা তাদের দিকে হাতি ঘুরিয়ে গতি বাড়িয়ে দিল। বিদেশীদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে হাতিগুলো হঠাৎ ভয় পেয়ে শুঁড় তুলে চ্যাঁচাতে সুরু করল, কানগুলো মেলে দিল। শিকারীরা হাওদা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে 'গিশু! গিশু!' বলে চীৎকার করে উঠে মরা জন্তুটার দিকে ছুটে এল।

আগের দিনের সর্দারশিকারী পান্দিওনদের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধরা গলায় বলল:

'রাত্রের এই বিভীষিকাকে কেবল তোমরা তিন জনে মিলে যদি মেরে থাক তবে তোমরা সত্যিই খুব বড় বীর। জন্তুটা যে হাতি গণ্ডার মেরে খায়!'

শিকারীরা বিদেশীদের গিশু'র সব বৃত্তান্ত বলল। গিশু খুবই দুষ্প্রাপ্য প্রাণী, অত্যন্ত হিংস্র। দিনের বেলায় সে কে জানে কোথায় লুকিয়ে থাকে। রাত্রে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায়। ছোট হাতি, গণ্ডার আর অন্যান্য বড় বড় জন্তুর বাচ্চা পেলেই আক্রমণ করে। গিশুর অসম্ভব শক্তি আর লড়াইয়ের গোঁ। ওর ভয়ানক দাঁত এক কামড়ে হাতির পা কেটে নিতে পারে। সামনের জোরাল থাবা শিকারের হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দেয়।

কাভি হাত নেড়ে ইশারায় শিকারীদের বলল জন্তুটার চামড়া ছাড়ানর কাজে তাকে সাহায্য করতে। সেই সাংঘাতিক দুর্গন্ধের তোয়াক্কা না করেই শিকারীরা রাজী হয়ে নেমে গেল কাজে।

একটা হাতির পিঠে জন্তুটার মাথা আর চামড়াটা তুলে দেওয়া হল। আহত পান্দিওনদেরও হাতিতে তুলে দেওয়া হল। মাহুতদের অংকুশের নির্দেশ মেনে চলা হাতিগুলো দ্রুত পায়ে চলতে সুরু করল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, ঠিক দুপুর বেলাটা পান্দিওনরা গ্রামে পৌঁছে গেল।

গ্রামবাসীরা চেঁচিয়ে উঠে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। হাতির পিঠ থেকেই শিকারীরা বিদেশীদের বীরত্বের কথা সবিস্তারে ঘোষণা করতে থাকল।

মাটি থেকে পাঁচ হাত উঁচুতে হাতির দুলে ওঠা হাওদায় পান্দিওনের পাশে হাসিমুখে বসে কিদগো। কয়েকবার সে গানও ধরেছিল, কিন্তু শিকারীরা তাকে থামিয়ে দিয়েছে। বলেছে হাতিরা গোলমাল মোটেই পছন্দ করে না, চুপচাপ হাঁটতেই ভালবাসে।

হাতি জাতির গ্রাম এখন পিছনে পড়ে। মাঝখানে চারদিনের পথের ব্যবধান। বুড়ো সর্দার তার কথা রেখেছে। পান্দিওনরা সবাই পশ্চিমমুখী অভিযাত্রীদলের সঙ্গে যাবার অনুমতি পেয়েছে। তিন বন্ধুর ক্ষত এখনও সারেনি বলে তারা স্থান পেয়েছে ছটা হাতির একটায়। দলের বাকি ষোলজন পিছনে চলেছে পায়ে হেঁটে। দিনের অর্ধেকটা সময় কেবল হাতিরা হাঁটে। বাকি দিনটা তাদের খাওয়া দাওয়া আর বিশ্রামেই কাটে। যারা পায়ে হেঁটে চলেছে কেবল রাত্রেই তারা হাতিগুলোকে ধরে ফেলে।

লোকেরা এমনিতে যে পথে যায় মাহুতরা সে পথ বেছে নেয়নি। বড় বড় গাছের বন ছেড়ে তারা ঝোপঝাড় আর মাঠ ভেঙে এগোচ্ছে। সে ঝোপঝাড় এতই ঘন যে মানুষের পক্ষে তার ভিতর দিয়ে এগোন অসম্ভব, পথ কেটে যেতে হয়। থেকে থেকেই সামনের হাতিটাকে পিছনে বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হাতিরা পথ করে দিচ্ছে। পূর্বতন ক্রীতদাসরা সে পথ ধরে এগিয়ে আসছে, কোন ডাল কাটাকাটির প্রয়োজন হচ্ছে না। দুর্ভেদ্য ঝোপঝাড়গুলোকে এত সহজে পরাজিত করাতে তারা মুগ্ধ। হাতির পিঠে পান্দিওনরা আরো মজায় আছে। কাঁটাঝোপ পোকামাকড় বিষাক্ত সাপ নোংরা দুর্গন্ধ কাদা পাথুরে ঢালুর খোঁচা খোঁচা পাথর, পা কেটে যায় এরকম ঘাস আর গভীর হাঁ-করা ফাটলের উপর দিয়ে তাদের হাওদা অল্প দুলে দুলে ভেসে চলেছে। পান্দিওন এবার বুঝল আফ্রিকার জঙ্গল আর বনবাদাড়ে পায়ে হেঁটে যেতে হলে খুবই সাবধানেই চলা দরকার। অক্ষত অবস্থায়, শরীরের তাগদ আর লড়াইয়ের ক্ষমতা বাঁচিয়ে চলতে হলে সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হয়।

গ্রানিটের পাহাড়ের মতো হাতিগুলো সব বাধা ভেঙে এগিয়ে চলেছে। এই বিচিত্র দেশের রং রূপ গন্ধ, তার বড় বড় রাজকীয় গাছ জীবজন্তুর শোভা, সারা দেশটার সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করার যথেষ্ট সুযোগ পান্দিওন পেল। রৌদ্রধৌত মাঠে ফুলের নিখুঁৎ রঙের ছোপ এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যে তা দেখে উত্তরদেশীর মনে হল এই রঙের প্রলেপে অজান্তে কোথাও একটা কিছু ভুল হয়ে গেছে। তার নিজের দেশের ফুলের স্নিগ্ধ সুষম প্রলেপের তুলনায় এই বর্ণিমা অত্যন্ত চড়া আর বিষম। কিন্তু যেই মেঘ এসে আকাশ ঢেকে দেয় বা দলটা প্রবেশ করে ছায়াচ্ছন্ন বনের গভীর গোধূলিতে অমনি এই রংরেজিনী যায় মিলিয়ে।

বনের হঠাৎ বেরিয়ে আসা একটা অংশ পার হয়ে সবাই এসে পড়ল খোলামেলা লালমাটির বন্ধুর অঞ্চলে। সেখানে আবার দেখা গেল পাতাহীন গাছ, তা থেকে দুধের মতো রস বেরয়। আকাশের চোখ ধাঁধান আলোয় ছড়িয়ে আছে তাদের বিষণ্ণ নীলচে-সবুজ ডালপালা। গাছের গা দেখে মনে হয় মাটি থেকে হাত ত্রিশেক উঁচুতে ইচ্ছে করেই যেন তাদের ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। মোটা গুঁড়ি আর পাতাহীন ডালগুলো যেন সবুজ ধাতুর তৈরী মোমবাতির দণ্ড। ডালের মাথায় বড় বড় আগুনের মতো লাল ফুল। যেন বিষণ্ণ শ্মশানক্ষেত্রে শত শত মশাল। নিস্পন্দ ঝোপঝাড়ে নিরক্ষীয় গ্রীষ্মের মৃত্যুসম নিস্তব্ধতাকে ভাঙতে পারে এমন কোন পশুপাখি কোথাও নেই।

আরো দূরে মাটি কেটে এগিয়ে গেছে গভীর জলের খাত। লাল মাটি ধুয়ে খাতগুলো যেখান দিয়ে গিয়েছে সেখানে চোখ ঝলসান সাদা বালি। শখানেক হাত উঁচু ভঙ্গুর লাল দেয়ালের মাঝখান দিয়ে গেছে সরু পথের গোলকধাঁধা। যাত্রীরা সে পথ ধরেই এগোতে লাগল। ক্ষয়ে যাওয়া খাত, পিরামিড, উঁচু পাথুরে জায়গা আর সরু স্তম্ভের গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে সযত্নে পথ করে চলেছে হাতিগুলো। থেকে থেকে গভীর গর্তও পড়ছে, বাটির মতো গোল। তার সমান বুকে নানা দিক থেকে আড়াআড়িভাবে এসে পড়েছে কতগুলো পথ। মাটি পড়ে পড়ে সৃষ্টি হয়েছে ভঙুর মাটির খাড়া তীক্ষ্ন দেয়াল, তার কিছু কিছু হঠাৎ ভেঙেও

পড়ছে। হাতিরা তাতে ভয় পেয়ে দেয়াল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ক্ষয়ে যাওয়া মাটির রং থেকে থেকেই যাচ্ছে বদলে। খাড়া লাল রঙের দেয়ালের পর ফিকে খয়েরী রঙের দেয়াল। তারপর হয়ত আবার উজ্জ্বল হলদে রঙের পিরামিড। পিরামিডগুলোর গায়ে আবার উজ্জ্বল সাদা রেখা বা থাক। পান্দিওনের মনে হল সে যেন এক পরীর রাজ্য। এইসব গভীর শুকনো প্রাণহীন খাদের ভিতর লুকিয়ে আছে নানা রঙের বাহার, জড় প্রকৃতির আলোকবিচ্ছুরণ।

আবার এল ঘন জঙ্গলে ভরা পাহাড়। আবার যাত্রীদের ঘিরে ফেলল সবুজ প্রাচীর। হাতির হাওদাগুলো ডালপালা পাতার সবুজ সমুদ্রের উপর দিয়ে দ্বীপের মতো ভেসে চলেছে।

পান্দিওন দেখল মাহুতরা কী সতর্কতার সঙ্গে হাতিগুলোকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে, বিশ্রামের সময় কত যত্নে তাদের চামড়া পরীক্ষা করে দেখছে। তার কারণ জিজ্ঞেস করতে নিগ্রোটি তার কোমরবন্ধনী থেকে ঝোলা কাঠের পাত্রটায় হাত রাখল।

'হাতির চামড়ায় কোনরকম চোট লাগা খুবই খারাপ। রক্ত দূষিত হয়, হাতি তাতে তাড়াতাড়ি মারা পড়ে। আমাদের সঙ্গে তাই সবসময় মলম থাকে। হাতি কোনরকমে চোট পেলেই তা লাগিয়ে দিই।'

এরকম দৈত্যের মতো শক্তিশালী দীর্ঘজীবী প্রাণী যে এত সহজেই কাবু হয়ে পড়তে পারে, তা জেনে পান্দিওন বিস্মিত হল। বুঝতে পারল এই কারণেই হাতিরা এত সতর্ক আর সাবধানী।

হাতির খুবই তদ্বির তদারকীর প্রয়োজন। রাত্রের বিরাম আর বিশ্রামের জায়গাগুলো তাই সারা জায়গা ঘুরে অনেক সলাপরামর্শ করে ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হয়। বাঁধা হাতিদের চারপাশে থাকে তীক্ষ্নদৃষ্টি লোকেদের পাহারা। সারা রাত পাহারাদাররা জেগে থাকে। কাছাকাছি কোন বুনো হাতি আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য বিশেষ অনুসন্ধানী দল অনেক দূরে পাঠান হয়। বুনো হাতির সন্ধান মিললে তাদের চেঁচামেচি হৈহল্লা করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

রাত্রের বিরামের সময় পান্দিওনরা তাদের সহযাত্রীদের নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, সব প্রশ্নের উত্তর তারা দেয়।

বেঁটেখাট বয়স্ক তাদের দলপতিকে পান্দিওন একবার জিজ্ঞেস করল, এমন বিপদ সত্ত্বেও তারা কেন এত স্বেচ্ছায় হাতি শিকারে যায়।

দলপতির মুখের দুপাশে গভীর ভাঁজ গভীরতর হয়ে উঠল। অনিচ্ছার সঙ্গেই সে জবাব দিল।

'দেখে তো মনে হয় না তুমি ভীতু, কিন্তু কথা বলছ ভীতুর মতো। হাতি হল আমাদের দেশের শক্তি। হাতির দৌলতেই আমরা বেশ সচ্ছলভাবে খেয়ে পরে জীবন কাটাই। তার মূল্য দিই আমরা প্রাণ দিয়ে। যদি ভীতু হতাম তবে যে সব জাতি টিকটিকি আর শেকড়বাকড় খেয়ে জীবনধারণ করে আমাদেরও তাদের মতোই দশা হত। মরতে যারা ভয় পায় তারা খেতে পায় না, দারিদ্র্য আর ঈর্ষার মধ্যেই তারা দিন কাটায়। যখন জান, তোমার মৃত্যু হচ্ছে তোমার পরিবারের জীবনধারণের উপায় তখন সাহসের সঙ্গে যে কোন বিপদই বরণ করে নেওয়া সহজ হয়ে ওঠে! আমার ছেলে, খুবই সাহসী সে, ভরযৌবনে হাতি শিকার করতে গিয়ে মারা পড়ে।' বিষণ্ণ ভঙ্গীতে চোখদুটো কুঁচকে পান্দিওনের দিকে তাকাল দলপতি। 'বিদেশী, তুমি হয়ত অন্য রকম ভাব। তা যদি হয়, তাহলে এত দূর দূর দেশে তোমার ঘোরার কী দরকার ছিল? কী দরকার ছিল দাসত্বের বদলে মানুষ আর জন্তুর সঙ্গে লড়াই করার?'

লজ্জিত পান্দিওন আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। কিদগো একটা আগুনের কুণ্ডের কাছে বসে ছিল। হঠাৎ সে উঠে ছাউনি থেকে শদুয়েক হাত দূরের এক কুঞ্জের দিকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেল। বড় বড় ডিমের আকারের পাতাগুলোকে অস্তসূর্য সোনা মাখিয়ে দিয়েছে। পাৎলা ডালগুলো কাঁপছে ঝিরঝিরে হাওয়ায়। গাছগুলোর সরু কাণ্ডের অদ্ভুত ডুমো ডুমো বাকল ভাল করে দেখে নিয়ে কিদগো আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে তার ছুরি বের করে নিল। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এল দুগোছা লালচে-ধূসর বাকল নিয়ে। এক গোছা সে দিল কাফিলার দলপতিকে। বলল:

'কিদগোর বিদায় উপহার হিসেবে এটা সর্দারকে দিও। নীল প্রান্তরের ঘাসের মতো এটাও খুব ভাল ওষুধ। সর্দার যখন অসুস্থ বোধ করবে কিম্বা ক্লান্ত বা বিষণ্ণ তখন যেন এটা পিষে সিদ্ধ করে যে জল বেরবে তা খায়। অল্প একটু খেতে বল। বেশি খেলে ওষুধ আবার বিষে পরিণত হবে। এই বাকল বৃদ্ধদের শক্তি দেয়, বিষণ্ণদের মনে জোগায় আনন্দ, দুর্বলদের শরীরে এনে দেয় নতুন প্রাণ। এই গাছটা মনে রেখ, কাজে দেবে।'*

কাফিলার দলপতি সানন্দে উপহার নিয়ে তার অনুচরদের আরো বাকল নিয়ে আসার হুকুম দিল। দ্বিতীয় গোছাটা কিদগো লুকিয়ে রাখল কাভির গিশুর চামড়ায়।

পরের দিন হাতিগুলো এসে পেঁাছল একটা পাথুরে মালভূমিতে। জায়গাটা লম্বা লম্বা ঝোপে ভরা। ঝোপগুলো আবার হাওয়ার চোটে মাটিতে নুয়ে পড়েছে। ধূসর শুকনো ঘাসের বুকে যেন সবুজ ঢিবি ছড়িয়ে আছে।

মুখে বাতাসের প্রতিটি ছোঁওয়ায় একটা সুন্দর সজীবতা। পান্দিওন হঠাৎ যেন নতুন প্রাণ পেয়ে উঠল। বাতাসে একটা অদ্ভুত গন্ধ। সে গন্ধ বহুকাল বিস্মৃত, কিন্তু পরিচিত আর অত্যন্ত প্রিয়। তবু সে গন্ধ চাপা পড়ে যাচ্ছে হাওয়ায় ভেসে আসা নিচের বনের রৌদ্রতপ্ত পাতার কড়া গন্ধে। বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে চওড়া ঢালু মাটি। তার একটানা ফাঁকা নীল বুকের উপর লম্বা রেখা আর টুকরো টুকরো জঙ্গলের ঘন রঙের ছোপ। দূরে দিগন্তের অস্বচ্ছতায় একটা উঁচু পাহাড়ের নীলচে ছায়া।

'তেংগ্রেলা! ঐ যে আমার দেশ!' কিদগো আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠাতে সমস্ত দলটা একবার তার দিকে তাকায়।

হেসে কেঁদে কিদগোর সে কী হাত পা ছোঁড়া। উত্তেজনায় কেঁপে উঠল তার বিরাট কাঁধদুটো। বন্ধুর মনের অবস্থাটা ভাল করে বুঝতে

---

* রুবিয়াকিয়ে জাতের করিনান্‌থে জোহিম্‌বে। কুইনিন আর কফি গাছ এই জাতের অন্তর্গত।

পারলেও এক অবাধ্য ঈর্ষা পান্দিওনের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল। কিদগো তো পেঁাছে গেল তার বাড়িতে। পান্দিওনের জন্য কবে আসবে সেই মহান মুহূর্ত, যখন সেও তার বন্ধুর মতো চেঁচিয়ে উঠতে পারবে "ঐ আমার দেশ!" বলে। তাকে এখনো আরো কত কী পার হতে হবে।

সবার অলক্ষ্যে পান্দিওন ঘুরে দাঁড়াল। নুয়ে পড়ল মাথাটা। বন্ধুর আনন্দের ভাগ নেওয়া সে মুহূর্তে তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আগ্নেয়গিরির জমাট লাভার একটা গাছপালাশূন্য কালো ঢালু বেয়ে নেমে হাতিগুলো পার হয়ে চলেছে অজস্র ছোট ছোট হ্রদে ভরা একটা সমতল। কালো তীরের গায়ে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে পরিষ্কার গভীর নীল জল। পান্দিওন শিউরে উঠল, তার চোখের সামনে হঠাৎ তেস্সার গভীর নীল চোখদুটি আর কালো চুলের গোছা ফুটে উঠেছে। নীল হ্রদগুলো যেন তেস্সার চোখের মতোই মৌন ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। পান্দিওনের মন চলে গেল এনিয়াদাতে। দেখা দিল একটা অস্পষ্ট অথচ প্রবল অধীরতার ভাব। বন্ধুর কাছে এগিয়ে পান্দিওন তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। কাভির রোদে পোড়া শিরা-বের-করা হাতটা তখন কিদগোর কালো হাত ধরেছে। তিন বন্ধুর হাত এক হল আনন্দে ভরা দৃঢ় করমর্দনে।

হাতিরা তখনো নেমেই চলেছে। চওড়া নদী উপত্যকা ছড়িয়ে রয়েছে তাদের দুপাশে। আরেকটু এগিয়ে ডাইনে ওরকমই আরেকটি উপত্যকা এসে মিশেছে। দুই উপত্যকার দুই নদী একসঙ্গে এগিয়ে মিলে মিশে চলেছে। চলতে চলতে তাদের জল আরো বেড়েছে। হাতিগুলো কিছুক্ষণ পর্যন্ত ক্ষয়ে যাওয়া পাহাড়ের তল ঘেঁষে নদীর বাঁ তীর ধরে চলল। আরো এগিয়ে পাহাড় সরে গেল। নদীর নির্মল পরিষ্কার জল আনন্দের কলধ্বনি তুলে ছুটে চলল সবুজ খিলানের মতো বড় বড় গাছের ছায়ায় ছায়ায়। নদী এখানে প্রায় পনের হাত চওড়া। গাছগুলোর কাছে পেঁাছনর আগে হাতিগুলো থামল।

'ব্যস, এর বেশি আমরা আর এগোব না,' কাফিলার দলপতি বলল।

হাতির পিঠ থেকে নেমে তিন বন্ধু সবার কাছ থেকে বিদায় নিল।

নদী পার হয়ে চলেছে অভিযাত্রী দল। পান্দিওনরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল — ধূসর হাতিগুলো একটা ঢালু বেয়ে উঠে নদীর উত্তরের একটা সমান করা উঁচু জায়গার দিকে চলেছে। বিরাট জন্তুগুলো ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেলেই তিন জনেই ক্ষোভের দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর যারা পিছনে পায়ে হেঁটে আসছে তাদের দিক দেখাবার জন্য আগুন জ্বালল।

'চল, ভেলা বানানর জন্য গাছ আর নলখাগড়ার সন্ধান করা যাক,' কাভিকে বলল কিদগো, 'বাকি রাস্তাটা তবে জলপথে বেশ তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। তুমি খোঁড়া, এখানেই আগুনের ধারে বসে তোমার পায়ের তদ্বির কর,' রুক্ষভাবে অথচ স্নেহের সঙ্গে বলল কিদগো পান্দিওনকে।

কিদগোকে নদীতীরে তার জাতভাইদের কাছে রেখে পান্দিওন আর কাভি এগিয়ে গেল।

দুজনেই সাগরতীরে মানুষ। তাই কাছের সমুদ্রের গন্ধে তারা পাগল হয়ে উঠেছে। ভেলা ভাসিয়ে তারা নদীর বাঁ দিকের ফাঁড়ি ধরে এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পরেই ভেলাটা বালিতে আটকে পড়ল। খাড়া উঁচু পাড় ভেঙে পান্দিওনরা উঠতে লাগল, পায়ে জড়িয়ে যেতে থাকল বড় বড় লম্বা ঘাস। উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে তারা তাড়াতাড়ি একটা টিলার রেখা পার হল। তারপর তীরের ঢিবির মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে গেল, মুখ দিয়ে কথা সরল না। এমনকি নিঃশ্বাসও ফেলতে পারল না।

মহাসমুদ্রের অন্তহীন বিস্তার দেখে তারা তখন অভিভূত। ঢেউয়ের মৃদু শব্দ তাদের কাছে হয়ে উঠেছে বজ্রগর্জনের সামিল। বুক পর্যন্ত উঁচু কাঁটা ঘাসের ভিতর তারা দাঁড়িয়ে। অনেক উঁচুতে তালগাছের নরম পালকের মতো পাতা। সাগরতীরের রোদে ধোওয়া গরম বালির সঙ্গে যেখানে মিলেছে পাহাড়ের পাদদেশের সবুজ রং, সে জায়গাটা প্রায় কালো দেখাচ্ছে। সোনালি বালির প্রান্তে ফেনিল ঢেউয়ের রুপোলি রেখা। তার ওপারে স্বচ্ছ সবুজ তরঙ্গের আন্দোলন। সমুদ্রের আরো ভিতরে একটা সরল রেখা। তীরছাড়া শৈলমালার প্রান্ত। খোলা সমুদ্রের নীল বুকে

তার চোখ ঝলসান সাদা রং। আকাশের গায়ে ছেঁড়াখোঁড়া হালকা মেঘের ছোপ। সাগরতীরে পাঁচটা তাল গাছ একসঙ্গে ঝুঁকে পড়েছে জলের উপর। হাওয়ার ঝাপটায় তাদের পাতাগুলো একবার খুলছে আবার নুয়ে যাচ্ছে। যেন কোন পাখির বাদামী আর সোনালি পালকওয়ালা বিস্রস্ত ডানা। ঢালাই করা ব্রোঞ্জের মতো তালপাতাগুলোয় ঢেকে গেছে সমুদ্রের দৃশ্য। তাদের তীক্ষ্ণপ্রান্তে উজ্জ্বল আগুনের ঝলক, পাতার ভিতর দিয়ে আসা রোদের এমনই প্রচণ্ড তেজ। সমুদ্রের নোনতা গন্ধে ভরা ভেজা বাতাস বয়ে যাচ্ছে পান্দিওনের মুখ আর খোলা বুকের উপর দিয়ে, যেন বহু বছরের বিচ্ছেদের পর আলিঙ্গন করছে।

নিজের বাড়ির মেঝের মতো সমান ঠাণ্ডা শক্ত বালির উপর বসে পড়ল কাভি আর পান্দিওন।

একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ছুটে আসা নরম ঢেউয়ের উপর। সমুদ্রও সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের বুকে করে দোলাতে সুরু করল। উজ্জ্বল ঢেউ হাত দিয়ে কাটতে কাটতে পান্দিওন আর কাভি উপভোগ করে চলল নোনতা জলের ছিটের গন্ধ, যতক্ষণ না তাদের শুকিয়ে আসা ক্ষতগুলো সমুদ্রের জলে জ্বালা করে উঠল। জল ছেড়ে তীরে উঠে দুই বন্ধুতে দুচোখ মেলে চেয়ে রইল দূর মহাসমুদ্রের দিকে। নীল সেতুর মতো তা সামনে ছড়িয়ে আছে, সুদূরে কোথাও সংযোগ গড়ে তুলেছে পান্দিওন আর কাভির দেশের সমুদ্রের সঙ্গে। ঠিক এই সময়েই এলাদার সাদা পাহাড় আর কাভির দেশ এত্রুরিয়ার হলদে ঢিবির গায়েও আছড়ে পড়ছে এই একই রকমের ঢেউ।

পান্দিওনের চোখ ভরে গেল আনন্দ-উত্তেজনার অশ্রুতে। যে বিরাট দূরত্ব তখনো তাকে মাতৃভূমির কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছে তার কথা আর মনে রইল না। এই তো সমুদ্র, ওপারেই তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে তেস্সা। অপেক্ষা করে রয়েছে যা কিছু তার আপনার, তার প্রিয়, পরিত্যক্ত, বহু বছরের নির্মম পরীক্ষা আর পরিমাপহীন দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রার আড়ালে যা ঢাকা পড়েছে।

সংকীর্ণ সৈকতে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধু চেয়ে রইল সমুদ্রের দিকে।

পিছনে ভীষণ বনে ঢাকা বিরাট পাহাড়। এক অজানা প্রান্তর, যার জ্বলন্ত মরুভূমি, সমতল, শুষ্ক মালভূমি আর অন্ধকার আর্দ্র জঙ্গল এতদিন তাদের বন্দী করে রেখেছিল। তাদের জীবনের কয়েকটি বছর যা তাদের পরিবারের কাজে লাগত সে দেশ কেড়ে নিয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে তারা মুক্তি পেয়েছে, প্রাণপণ চেষ্টার পর। এই সব প্রচেষ্টা স্বদেশের কাজে লাগাতে পারলে অনেক যশ আর সম্মান তারা পেত।

পান্দিওনের কাঁধের উপর বিরাট হাতটা রেখে কাভি বলে উঠল:

'পান্দিওন, আমাদের ভাগ্য এখন আমাদের নিজেদের হাতে!' তার স্বভাবত কালো বিষণ্ণ চোখে অদ্ভুত প্রবল আবেগের দীপ্তি। 'আমরা এখন দুজন; এত সংগ্রাম করে যখন মহাগোলার্ধের তীরে আসতে পেরেছি তখন সবুজ সাগরেও ঠিক পেঁছিতে পারব। দেশে আমরা ঠিক ফিরব। পথে লিবীয়ার লোকেদের আমরাই হব প্রধান সহায়, কারণ জাহাজ চালানর ওরা কিছুই জানে না...'

পান্দিওন কোন কথা না বলে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের শক্তি সম্বন্ধে তার বিশ্বাস একেবারে পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে।

সমুদ্রতীরে ভেসে এল কিদগোর কণ্ঠস্বর। বেচারী উদ্বিগ্ন হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে বন্ধুদের। সঙ্গে রয়েছে জাতভাইদের একদল আর তার সহযাত্রীরা, সকলেই অত্যন্ত উত্তেজিত। পান্দিওন আর কাভিকে নদী-তীরে ফিরিয়ে এনে তারা ফেরি পার হয়ে পেঁছিল অন্য তীরে। সেখানে তখন দাঁড়িয়ে আছে একদল ষাঁড়, আহতদের আর অস্ত্রশস্ত্র মালপত্তর বয়ে নিয়ে যাবে বলে।

আর একটি ছোট্ট পর্ব। তার পরেই তাদের যাত্রা শেষ হবে। নীল নদীর তীরে গণ্ডারের সঙ্গে মারাত্মক লড়াইয়ের পর মুমূর্ষু সঙ্গীদের পাশে দাঁড়িয়ে কিদগো যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তা সফল হয়েছে। পূর্বতন ক্রীতদাসদের উনিশ জনকেই জানান হল সাদর অভ্যর্থনা। সমুদ্রের নিকটবর্তী বিরাট এক গ্রামে তাদের বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া হল। গ্রামটা

একটা বড় নদীর তীরে। হাতি জাতির লোকেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা যে নদীটার বুক দিয়ে বয়ে এসেছে এ নদীটা তার সমান্তরালেই চলেছে।

পান্দিওন আর কাভির পক্ষে অবশ্য সবচেয়ে ভাল খবর হল বাতাসের সন্তানরা কুড়ি বছর পর গত বছর প্রথম আবার এদেশে এসে গেছে। কিদগোর জাতের লোকেরা সমুদ্র জাতিদের বলে 'বাতাসের সন্তান'। সেই কোন স্মরণাতীত কাল থেকে তারা দক্ষিণ শিঙ অঞ্চলে এসেছে হাতির দাঁত সোনা ভেষজ গাছ আর বুনো জন্তুর চামড়ার সন্ধানে। স্থানীয় লোকেরা বলল বাতাসের সন্তানদের চেহারাটা নাকি কাভি আর পান্দিওনের মতো। কেবল রংটা একটু ময়লা আর চুলগুলোও বেশি কোঁকড়ান। আগের বছর পূর্বপুরুষদের প্রাচীন পথ ধরে চারটে কালো জাহাজ এসে তীরে লাগে। যাবার সময় বাতাসের সন্তানরা বলে যায় কুয়াশা সাগরের ঝড়ঝঞ্ঝার মরশুম কেটে গেলেই তারা আবার আসবে। অভিজ্ঞ লোকেদের হিসাব অনুযায়ী আর তিনমাসের মধ্যেই জাহাজ আসা উচিত। এদিকে নিজেরা জাহাজ তৈরী করতে অনেক সময় লেগে যাবে, তাছাড়া সমুদ্রের পথ যাত্রীদের একেবারেই জানা নেই। সমুদ্র জাতিরা তাদের এবং আরো দশ জন সঙ্গীকে জাহাজে নেবে কিনা সে বিষয়ে পান্দিওন আর কাভির মনে সন্দেহ দেখা দিল। কিদগো কিন্তু চোখ টিপে রহস্যজনকভাবে হেসে জানিয়ে দিল, সে সব ঠিক করে দেবে।

অনিশ্চয়তার প্রবল উৎকণ্ঠায় ভুগলেও চুপচাপ অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া আর কোনই উপায় রইল না। এমনও হতে পারে যে বাতাসের সন্তানরা হয়ত আরো কুড়ি বছর এদিকে এলই না। পান্দিওন আর কাভি এই বলে নিজেদের সান্ত্বনা দিল যে, বাতাসের সন্তানরা নির্দিষ্ট সময়ে না এলে পর তারা নিজেরাই জাহাজ বানাতে লেগে যাবে।

কিদগোর প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সুরু হল বিরাট হৈচৈ ভোজ। পান্দিওনের কাছে কিন্তু কয়েক দিন পরেই এই উৎসব হৈচৈ হয়ে উঠল ক্লান্তিকর। নিজের বীরত্বের প্রশংসা শুনে সেই সঙ্গে ফিরে ফিরেই

নিজের দেশের গল্প আর দুঃসাহসী কাজের কথা বলে সে হাঁপিয়ে উঠল।

কিদগোকে সারাক্ষণ তার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ঘিরে থাকে। মেয়েদের প্রশংসায় তার মন এখন অন্য দিকে। তাই সে অলক্ষ্যে পান্দিওন আর কাভির কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে তার দেখা শোনা হয় কম। কিদগো এখন নিজের জীবনপথ ধরে এগিয়ে চলেছে। বন্ধুদের পথের সঙ্গে তার মিল নেই। কিদগোর যাত্রাসঙ্গীদের মধ্যে যারা কাছাকাছি সগোত্র জাতির লোক তারা যার যার দেশে চলে গেছে। পড়ে রয়েছে কেবল পান্দিওন, কাভি আর লিবীয়ার দশটি লোক যাদের দেশে ফেরা নির্ভর করছে কাভি আর পান্দিওনের উপর।

দশ জন বিদেশীকে রাখা হল ধূসর-সবুজ রঙের রোদে শুকোন মাটির তৈরী এক বিরাট বাড়িতে। কিন্তু পান্দিওন আর কাভিকে কিদগো জোর করে তার নিজের বাড়ির কাছে একটা গম্বুজ আকারের সুন্দর বাড়িতে নিয়ে গেল। বহু বছর ঘুরে বেড়ানর পর পান্দিওন অবশেষে নিজের বিছানায় ঘুমবার সুযোগ পেল। এখানকার লোকেরা চামড়া বা ঘাসের আঁটিতে শোয় না। এরা খাটিয়া তৈরী করে — পায়ার উপর কাঠের ফ্রেম, তার উপর নরম বৃন্তের জাল পাতা। শরীরটা তাতে বেশ আরাম পায়। পান্দিওনের জখম পাটার পক্ষে তো তা বিশেষ ভাল।

পান্দিওনের হাতে এখন অনেক সময়। প্রায়ই সে সমুদ্রের ধারে বসে থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, হয় একা, নয় তো কাভিকে সঙ্গে নিয়ে। শোনে ঢেউয়ের ছন্দ বাঁধা গর্জন। মনটা তার সদা উৎকণ্ঠিত। অসাধারণ গরম আবহাওয়ার ভিতর দিয়ে দীর্ঘ বিপদসংকুল যাত্রা তার অসীম প্রাণশক্তি শুষে নিয়েছে। পান্দিওন অনেক বদলে গেছে। সে কথা সে নিজেও স্বীকার করে। একসময় যৌবন আর প্রেমের উদ্দীপনায় সে ছেড়ে এসেছিল তার প্রিয়াকে, ছেড়ে এসেছিল তার ঘরদোর দেশ প্রাচীনদের শিল্পকলা শেখার আগ্রহে, দেশ দেখা আর জীবনকে চেনার উৎসাহে।

এখন সে বুঝতে পারে দেশের জন্য ভীষণ মন খারাপ করার মর্ম, জেনেছে নিরানন্দ বন্দীদশার অর্থ, হতাশার ভার, ক্রীতদাসের অসাড় করে তোলা ক্লান্তিকর জীবন। অস্বস্তির সঙ্গে নিজেকে জিজ্ঞেস করেছে, সৃষ্টির

প্রেরণা তার মনে এখনো আছে কি, — আছে কি বড় শিল্পী হবার সামর্থ্য? সেই সঙ্গে এও অনুভব করেছে — অনেক কিছু সে দেখেছে জেনেছে, সে সবের প্রভাব পড়েছে তার উপর। জীবনের বিরাট পরিচয়ে তারা তাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। রেখে গেছে নানা অবিস্মরণীয় ছাপ।

যাকে সে হারিয়েছে সেই ইরুমার বাবার দেওয়া বর্শাটার দিকে সে প্রায়ই চেয়ে থাকে সপ্রেম নয়নে। বহু জঙ্গল সমতল পার করে নিয়ে এসেছে বর্শাটা। মৃত্যুর হাত থেকে বহুবার তাকে রক্ষা করেছে। বর্শাটা তার কাছে হয়ে উঠেছে মানুষের সাহসের প্রতীক, আফ্রিকার উত্তপ্ত বিস্তৃত দেশের সর্বময়ী কর্ত্রী যে প্রকৃতি তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষের নির্ভয়তার সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। দীর্ঘ ফলাটার উপর সযত্নে হাত বুলিয়ে সে বর্শাটা আবার ভরে রাখে ইরুমার সেলাই-করা খাপটায়। দেশে ফেরার কঠোর যাত্রায় একসময় যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই বহুদূরের প্রীতিতে ভরা কোমল মেয়েটির কথা মনে পড়িয়ে দেবার জন্য রয়েছে কেবল পশমের রঙিন কাজ তোলা এই চামড়ার টুকরোটা। একথাই ভাবতে ভাবতে পান্দিওন তাকায় কালো পাহাড়গুলোর দিকে। যে দেশ সে পার হয়ে এসেছে তার আর মহাসমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই পাহাড়। তার চোখের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে ভেসে যায় সেই দীর্ঘ যাত্রার অন্তহীন দিনগুলো...

আর সেসব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে ইরুমার মূর্তি, প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা। ক্রমাগত হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকে... ইরুমাকে শেষ মুহূর্তে পান্দিওন যেভাবে দেখেছিল এখনো সে ঠিক সেইভাবেই হেলে দাঁড়িয়ে আছে একটা গাছের গুঁড়িতে ভর দিয়ে। গাছটার ফুলগুলো লাল মশালের মতো... পান্দিওনের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে। কল্পনায় সে দেখতে পায় ইরুমার কালো, নরম ত্বকের দীপ্তি আর কামনার আগুনে ভরা তার দুষ্টু চোখদুটোর নিখুঁৎ ছবি... ইরুমার ছোট্ট গোল মুখটা তার মুখের কাছে এগিয়ে আসে। পান্দিওন শুনতে পায় তার কণ্ঠস্বরের সুন্দর সুর...

কিদগোর দেশের আমুদে আর বন্ধুত্বে ভরা লোকদের আচার ব্যবহার চালচলনে পান্দিওন ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠল। এরা সবাই বেশ লম্বা।

কালো চামড়ায় তামাটে আভা। শরীরও সবার সুগঠিত। অধিকাংশই চাষবাসে রত। তেলের বাদামের জন্য এরা ছোট ছোট পামগাছ লাগায়। সেই সঙ্গে কলাগাছও, নরম কাণ্ড থেকে পাখার মতো ছড়ান বিরাট পাতাওয়ালা বিশাল ওষধি। কলাগাছের বাঁকা চাঁদের মতো দেখতে ফলগুলো গজায় একসঙ্গে বিরাট বিরাট কাঁদিতে। তার স্বাদ আর গন্ধ দুইই অতি চমৎকার। সংগ্রহ করা হয় প্রচুর পরিমাণে। কলাই এদের প্রধান খাদ্য। সিদ্ধ, তেলে ভাজা আর এমনি কাঁচাই খায় ফলগুলো। পান্দিওনের খুবই ভাল লাগে। স্থানীয় লোকেরা শিকারেও যায়, হাতির দাঁত আর জন্তুর চামড়া নিয়ে আসে। সংগ্রহ করে সেই মন্ত্রপূত চেস্টনাটের মতো বাদাম, যা খেয়ে দূর হয়েছিল পান্দিওনের অদ্ভুত অবসাদ। তাছাড়া পশুপাখিও পোষে।

কিদগোর লোকদের মধ্যে অনেক ভাল কারিগরও আছে — রাজমিস্ত্রী, কামার আর কুমোর। শিল্পীদের অনেকের কাজ দেখে পান্দিওন মুগ্ধ হয়েছে, কিদগোর চেয়ে তাদের কাজ এতটুকুও খারাপ নয়।

বাড়িগুলো তৈরী চৌকো পাথর, রোদে পোড়ান ইঁট বা শক্ত পেটান মাটি দিয়ে। প্রত্যেকটার দেয়ালে জটিল ও অত্যন্ত সুন্দর সংযত কারুকাজ। কোন কোনটায় আবার রঙিন দেয়ালচিত্রও আছে। সেগুলো দেখে পান্দিওনের মনে পড়ে যায় ক্রীটের পুরনো দেয়ালচিত্রের কথা। সূক্ষ্ম সুন্দর নক্সা আঁকা সুঠাম মাটির পাত্রও সে দেখেছে। সাধারণ সভাঘর আর সর্দারদের বাড়িগুলোয় আছে রঙিন কাঠের মূর্তি। মানুষ আর জন্তুর খোদাইকাজগুলো দেখে পান্দিওন মুগ্ধ হয়েছে, মূর্তির মনের ছাপের বিশ্বস্ত চিত্রণে ফুটে উঠেছে তাদের বিশিষ্ট চরিত্রটি।

কিন্তু তবু তার মনে হয় এখানকার ভাস্করদের মধ্যে রয়ে গেছে রূপের মর্মগ্রহণের অভাব। এ কথা আইগিপ্‌তসের শিল্পীদের বেলায়ও খাটে। খোদাইয়ের যাথার্থ্য আর কাজ সারার বহুশতাব্দীর অভিজ্ঞতাজাত চমৎকার দক্ষতা সত্ত্বেও তা-কেমের মূর্তিগুলো তাদের বাঁধাধরা ভঙ্গীতে প্রাণহীন। কিদগোর লোকেরা আবার তার উল্টো। তারা তাদের খোদাই কাজে ধরে রেখেছে জীবনের সাড়, কিন্তু কেবল

আংশিকভাবে আর ইচ্ছে করেই বাড়ান খুঁটিনাটিতে। স্থানীয় কারিগরদের কাজ দেখতে দেখতে পান্দিওনের অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছে, ভাস্কর্যের নিখুঁৎ রূপ অর্জন করতে হবে সম্পূর্ণ নতুন পথে, প্রকৃতির প্রতিচিত্রণের অন্ধ চেষ্টা বা মনের কতগুলো আংশিক ছাপের প্রতিফলনে তা হবে না।

কিদগোর লোকেরা সংগীতপ্রিয়। লম্বা লাউয়ের খোলের উপর সারি সারি ছোট কাঠের পাত বসিয়ে তৈরী করা একধরনের জটিল যন্ত্র তারা বাজায়। কতগুলো টানা নরম সুরের দুঃখের গান শুনে পান্দিওনের মন আকুল হয়ে ওঠে, মনে পড়ে যায় নিজের দেশের গানের কথা...

বাড়ির কাছের নিভে আসা আগুনের ধারে বসে কাভি বলকারী পাতা* চিবচ্ছে আর একটা কাঠি দিয়ে বিমর্ষভাবে খুঁচিয়ে চলেছে ছাই। তাতে সেঁকা হচ্ছে হলদে ফল। কলা থেকে আটা তৈরী করার প্রক্রিয়াটা কাভি শিখে নিয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পান্দিওন তার বন্ধুর পাশে বসে পড়ে অলসভঙ্গীতে চেয়ে রইল উঁচু ছাদ বাড়ির সারিগুলো আর পথচারীদের দিকে।

সন্ধ্যার নরম আলো ধুলোয় ভরা পথের উপর পড়ে হারিয়ে গেছে ছায়ায় ঘেরা গাছের নিশ্চল ডালপালায়।

হঠাৎ পথচলতি একটি মেয়ের প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। কিদগোর গ্রামে ঢোকার প্রথম দিনগুলোয় মেয়েটিকে সে দেখেছিল। কিন্তু তার পর আর তার সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ মেলেনি। মেয়েটির পরিচয়ও সে জানে — নিওরা, কিদগোর এক আত্মীয়ের বউ। কিদগোর জাতের মেয়েরা সৌন্দর্যের জন্য এমনিতেই বিখ্যাত: নিওরা আবার তাদের মধ্যেও বিশেষ সুন্দর। ধীরে ধীরে সে দুই বন্ধুকে পার হয়ে চলে গেল। তার হাঁটার ভঙ্গীতে ফুটে উঠল নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন নারীর সম্ভ্রম। অকপট প্রশংসার দৃষ্টিতে পান্দিওন চেয়ে রইল তার দিকে... সৃষ্টির প্রেরণা আবার ফিরে এল আগের মতোই পূর্ণ সতেজতায়।

---

* স্টেরকুলেসী জাতের যে কোন ঝোপের পাতা।

নিওরার অধোদেশে আঁট করে পরা একটা নীলচে-সবুজ খাট কাপড়। গয়নাগাটি বলতে কেবল গলায় একটা নীল পুঁতির মালা, কানে পান আকারের মোটা দুল, বাঁ হাতের কব্জিতে একটা সরু সোনার বালা। ছোট্ট কালো চুলগুলো মাথার উপর অদ্ভুতভাবে চুড়ো করে বাঁধা, মাথাটা তার ফলে আরো লম্বা দেখায়। দীর্ঘ পলকের নিচে বড় বড় চোখদুটোর শান্ত দৃষ্টি। চোখের নিচে গালের গোল হাড়দুটো উঁচু হয়ে আছে, ঠিক গ্রীকদের সুস্থসবল বাচ্চাদের মতো।

তার মসৃণ কালো ত্বক এমন টান টান মনে হয় যেন লোহা দিয়ে তৈরী। অস্তসূর্যের আলোয় তা জ্বলে উঠেছে। তামাটে আভাটা পরিণত হয়েছে সোনালিতে। সামনে স্বল্প এগোন তার ঈষৎ দীঘল গ্রীবায় একটা দর্পভরা ভঙ্গী।

নিওরার ছিপছিপে লম্বা শরীরটি নিখুঁত। তার চলার ভঙ্গীতে অসাধারণ অনায়াস সংযত ভাব। পান্দিওনের মনে হল, তার দেশের বিশ্বাস অনুযায়ী সৌন্দর্যকে সজীব আর তার আকর্ষণ শক্তিকে দুর্বার করে তোলেন যাঁরা, সেই তিন সৌন্দর্যলক্ষ্মীর একজনই বুঝি রূপগ্রহণ করেছেন নিওরার মধ্যে।

কাভি হঠাৎ পান্দিওনের মাথায় হাতের কাঠিটা দিয়ে টোকা মারল।

'ওর পিছনে ছোট না কেন?' কিছুটা ঠাট্টা করে, কিছুটা দুঃখের সঙ্গেই বলল এত্রাস্‌কান। 'তোমরা গ্রীকরা তো মেয়েদের প্রেমে পড়ার জন্য একেবারে মুখিয়ে থাক...'

বন্ধুর দিকে ঘুরে তাকাল পান্দিওন। তার দৃষ্টিতে রাগের চিহ্ন নেই, কিন্তু মনে হল এই যেন সে প্রথম দেখছে কাভিকে। তারপর সে সাবেগে জড়িয়ে ধরল কাভির কাঁধ।

'শোন কাভি, তুমি কখনো নিজের কথা কিছু বল না... মেয়েদের প্রতি তোমার কি কোনই আগ্রহ নেই? ওদের সৌন্দর্য কি কখনো অনুভব কর না? তোমার কি মনে হয় না ওরা এই সবের একাংশ?' হাতটা ঘুরিয়ে চারদিক দেখিয়ে সে বলল, 'এই সমুদ্র, সূর্য, সুন্দর জগতের অঙ্গ?'

'না, সুন্দর কিছু দেখলেই আমার খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করে,' হেসে বলল কাভি। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, 'না, ঠাট্টা করছি। মনে রেখ, আমার বয়স তোমার দ্বিগুণ। জগতের উজ্জ্বল মুখটার সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখতে পাই তার উল্টো দিকের অন্ধকার কদর্যতাও। তা-কেমের কথা তুমি এর মধ্যেই ভুলে গেলে?' পান্দিওনের কাঁধের লাল মার্কাটায় একবার হাত বুলিয়ে দিল কাভি। 'আমি কিছুই ভুলি না। কিন্তু তোমায় দেখে আমার হিংসে হয়। তুমি সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পার, আমি পারি কেবল অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধ্বংস করতে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কাভি কম্পিত গলায় বলে চলল, 'দেশে তোমার আপনার জন যারা রয়েছে তাদের কথা তুমি কম ভাব... কতদিন হয়ে গেল ছেলেমেয়েগুলোকে দেখি না। তারা বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না। জানি না আমার গাঁই গোষ্ঠী এখনো টিকে আছে কিনা। নানা শত্রু জাতির মাঝখানে কত কীই তো হতে পারে...'

স্বভাবত সংযত কাভির গলার দুঃখের ছোঁয়ায় পান্দিওনের মন ভরে উঠল সহানুভূতিতে। কিন্তু কী সান্ত্বনা সে দেবে তার বন্ধুকে? তাছাড়া কাভির কথা তার মনে খুবই বিঁধেছে, "দেশে তোমার আপনার জন যারা রয়েছে তাদের কথা তুমি কম ভাব..." কাভি যখন এ কথা বলতে পারল... না, তেস্‌সা, তার দাদু আর আগেনর তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়নি। কিন্তু তাহলে তো তারও কাভির মতোই বিষণ্ন হয়ে পড়া উচিত ছিল। জীবনের মহান বৈচিত্র্য সে তো তবে উপভোগ করতে পারত না, পারত না সৌন্দর্যের মর্মগ্রহণ করতে... পান্দিওনের ভাবনাগুলো এতই আপাত বিরোধী যে, নিজেই সে তাদের বুঝতে পারল না। লাফিয়ে উঠে সে কাভিকে সমুদ্র স্নানের আহ্বান জানাল। কাভিও রাজী হয়ে গেল। দুজনে তখন এগিয়ে গেল টিলা পার হয়ে। টিলাগুলোর ওপারেই গ্রাম থেকে পাঁচ হাজার হাত দূরে সমুদ্র।

এর কয়েকদিন আগে কিদগো তার জাতের যত জোয়ান তরুণদের জুটিয়ে বলেছে, তার বন্ধুদের বর্শা আর লেংটি ছাড়া আর কিছুই নেই অথচ বাতাসের সন্তানরা বিনা মাশুলে তাদের কিছুতেই জাহাজে নেবে

না। বলেছে, 'তোমরা প্রত্যেকে সামান্য একটু সাহায্য করলেই বিদেশী বন্ধুরা দেশে ফিরতে পারে। বন্দীদশা পার হয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আসতে ওরা আমায় সাহায্য করেছে।'

সবার সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে কিদগো বলেছে, সোনার সঞ্চয় আছে যে মালভূমিতে সবাই মিলে সেখানে যেতে হবে। যারা তা পারবে না তারা দেবে হাতির দাঁত, বাদাম, চামড়া কিম্বা একটা করে দামী কাঠের গুঁড়ি।

তার পরদিনই কিদগো তার বন্ধুদের জানায়, সে শিকারে যাচ্ছে। বন্ধুদের কিন্তু কিছুতেই সে সঙ্গে নিতে রাজী হয়নি। আগামী যাত্রার জন্য তাদের শক্তি সঞ্চয় করতে বলে গেছে।

কিদগোর যাত্রাসঙ্গীরা তাই তার এই অভিযানের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেনি। বাড়ি ফেরার জাহাজ ভাড়া নিয়ে চিন্তিত হলেও তারা ভেবেছে রহস্যময় বাতাসের সন্তানরা তাদের দাঁড় বাওয়ার কাজে নিয়ে নেবে। তেমন দরকার হলে পান্দিওন ঠিক করে রেখেছে বুড়ো সর্দারের দেওয়া পাথরগুলোই দিয়ে দেবে। কাভিও ওদিকে কিদগোকে কিচ্ছু না বলে লিবীয়ার লোকদের নিয়ে দুদিন পরে নদীর উজানে চলে গেল কালো কাঠের গাছের সন্ধানে। ঠিক করে রেখেছে কয়েকটা গাছ কেটে ভাঁটার স্রোতে ভাসিয়ে আনবে হালকা কাঠের ভেলায় চড়িয়ে, কারণ আবলুস আর অন্যান্য জাতের কালো কাঠ জলে ভাসার পক্ষে বড় ভারী।

পান্দিওন তখনো খোঁড়াচ্ছে, তাই তার শত আপত্তি সত্ত্বেও কাভি তাকে নিয়ে যায়নি। এই দ্বিতীয়বার পান্দিওনকে তার সঙ্গীরা একা ফেলে রেখে গেল। প্রথমবার রেখে গিয়েছিল জিরাফ শিকারের সময়ে। পান্দিওন তো রেগে আগুন। কাভি কিন্তু মুরুব্বীচালে দাড়ি উঁচিয়ে বলেছিল, প্রথমবারের মতো এবারও পান্দিওনের সময়টা বৃথা যাবে না। পান্দিওন এত রেগে গিয়েছিল যে, মুখ দিয়ে তার একটিও কথা বেরয়নি, ভীষণ অপমানে সে বন্ধুদের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। কাভিও দৌড়েছিল তার পিছনে। তার পিঠে চড় মেরে ক্ষমা চেয়েছিল।

কিন্তু খুব জোর দিয়েই জানিয়েছিল, পান্দিওনের সম্পূর্ণ সেরে ওঠার জন্য থেকে যেতে হবে।

অনেক তর্কাতর্কির পর পান্দিওন রাজী হয়। নিজেকে তখন তার ভাগ্যহীন অথর্ব বলে মনে হচ্ছিল। সুস্থসবল সঙ্গীদের বেরনোটা যাতে আর দেখতে না হয় তাই সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল।

একা পড়ে গিয়ে পান্দিওনের ভীষণ ইচ্ছা হল নিজের সামর্থ্যটা একবার পরীক্ষা করে দেখে। মনে পড়ল হাতি শিক্ষকের মূর্তি বানানয় তার সাফল্যের কথা। গত কয়েক বছর ধরে মৃত্যু আর ধ্বংস সে এত দেখেছে যে, মাটির মতো নশ্বর জিনিস নিয়ে সে কাজ করতে চায় না। সে চায় আরো টেকসই জিনিস। কিন্তু সেরকম কিছুই হাতের কাছে নেই। তারোপর নেই খোদাই করার যন্ত্রপাতি।

ইয়াখ্‌মসের পাথরটা পান্দিওন প্রায়ই মুগ্ধ চোখে দেখে। কিদগোর ধারণা, ঐ পাথরের জোরেই তারা সমুদ্রে এসে পেঁছেছে। কিদগো সাদাসিধে মানুষ, তার তাই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন জিনিসে বিশ্বাস।

পাথরটার নির্মল স্বচ্ছতা দেখে পান্দিওনের মাথায় এল ক্যামিও খোদাইয়ের কথা। ঈজীয়ান সাগরের নাক্‌সোস্‌ দ্বীপ থেকে আনা পালিশের পাথর ঘষে গ্রীক দেশে এক জাতের বিশেষ পাথরে ক্যামিওর কাজ করা হয়। এটা তার চেয়ে বেশি শক্ত। হঠাৎ তার মনে পড়ল তার কাছে আরেক ধরনের পাথর রয়েছে। হাতি জাতির সর্দারের কথা ঠিক হলে ঐ পাথরের চেয়ে শক্ত পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।

দক্ষিণের পাথরগুলোর মধ্যে থেকে সবচেয়ে ছোটটা বেছে নিয়ে পান্দিওন নীলচে-সবুজ স্ফটিকটার প্রান্তে সযত্নে দাগ কেটে দিল — পাথরের শক্ত বুকে ফুটে উঠল একটা সাদা রেখা। আরো জোরে চাপ দিতে রেখাটা গভীর হয়ে উঠল, কালো ব্রোঞ্জের বাটালি যেমন নরম শ্বেত পাথর কেটে যায়। সত্যিই দক্ষিণ থেকে আনা স্বচ্ছ পাথরগুলোর মতো এমন অসাধারণ শক্ত জিনিস পান্দিওন কখনো চোখে দেখেনি। এই অলৌকিক যন্ত্রের সাহায্যে তার কাজ বেশ সহজেই এগোবে।

ছোট্ট পাথরটা ভেঙে ফেলে পান্দিওন সযত্নে প্রতিটি ধারাল টুকরো সংগ্রহ করে নিল। তারপর শক্ত পিচের সাহায্যে সেগুলোয় লাগাল কাঠের হাতল। তার ফলে তৈরী হল নানা আকারের ডজনখানেক বাটালি। সাধারণ খোদাই কাজ আর সূক্ষ্ম রেখা কাটা দুয়ের পক্ষেই তারা উপযুক্ত।

বহু হাজার বছরের পুরনো মন্দির থেকে ইয়াখ্মস এই সুন্দর নীলচে-সবুজ পাথর নিয়ে এসেছিল। পান্দিওনও তা বহুযত্নে নিরাপদে বয়ে এনেছে এই সমুদ্রের কাছে। মাটির রাজ্যের হাঁপধরান বন্দীদশার দীর্ঘ বছরগুলোয় এই পাথরই তার কাছে হয়ে উঠেছিল সমুদ্রের প্রতীক। এর বুকে সে এখন কী খোদাই করবে? অস্পষ্ট সব ভাব দেখা দিল পান্দিওনের মনে।

গ্রাম ছেড়ে একা একা ঘুরতে ঘুরতে পান্দিওন এসে পৌঁছল সাগরতীরে। অনেকক্ষণ সে পাথরের উপর বসে চেয়ে রইল দূর দিগন্তে নয়ত পায়ের কাছের বালির উপর ছুটে আসা পাতলা জলের দিকে। সন্ধ্যা এল। ক্ষণস্থায়ী গোধূলির আলো মুছে নিল সমুদ্রের বুকের দীপ্তি। ঢেউয়ের আন্দোলন আর দেখা যায় না। রাত্রির কালো মখমল ক্রমেই হয়ে উঠছে আরো দুর্ভেদ্য। সেই সঙ্গেই আকাশ আলো করে ফুটে উঠল বড় বড় উজ্জ্বল তারা। আকাশের দীপমালা ঢেউয়ের বুকে দুলে উঠে মৃত সমুদ্রকে দিল নতুন প্রাণ। মাথা তুলে পান্দিওন দেখতে সুরু করল অজানা সব নক্ষত্রপুঞ্জ। ছায়াপথের বাঁকা রেখা রুপোলি সেতুর মতো চলে গেছে আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। ঠিক তার নিজের দেশের মতোই। তবে এখানে রেখাটা কিছু সংকীর্ণ, তার একটা প্রান্ত ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে চওড়া চওড়া কালো রেখার মধ্যে ছাড়া ছাড়া দাগে। ছায়াপথের নিচে আর এক ধারে চমকাচ্ছে দুটো নীহারিকাপুঞ্জের নীলচে-সাদা মেঘ।* তাদের খুব কাছেই একটা মস্ত দুর্ভেদ্য অন্ধকার বিবর, নাসপাতির

* বড় আর ছোট মাগেল্লানিক নীহারিকাপুঞ্জ — দক্ষিণ গোলার্ধের বড় বড় তারকাপুঞ্জ আর নীহারিকা।

মতো দেখতে; যেন বিরাট একটুকরো কয়লা ঢেকে দিয়েছে আকাশের ঐ অংশের সমস্ত তারাগুলোকে।* উত্তরে তার নিজের দেশের আকাশে পান্দিওন এমন দৃশ্য কখনো দেখেনি। কালো ছোপ আর শ্বেত তারকাকণিকার বিপরীত সমাবেশে সে হতবাক। সেই সাদা কালোর দ্বন্দ্বে তরুণ গ্রীকটি হঠাৎ খুঁজে পেল আফ্রিকার মর্ম। তার সরাসরি সুস্পষ্ট স্থূলতায় এই সমন্বয়ই গড়ে তুলেছে আফ্রিকাকে, তার সম্পূর্ণ রূপটিকে — পান্দিওনের মনে তা এখন যে ভাবে ধরা দিয়েছে। সেই অদ্ভুত ঘোড়াগুলোর সাদা কালো ডোরা, দেশবাসীদের কালো ত্বকে সাদা রঙের প্রলেপ, তাদের সাদা দাঁত আর চোখের সাদা অংশের ফলে তা আরো সুস্পষ্ট, কালো আর মুক্তা শুভ্র কাঠের তৈরী জিনিসপত্র, বনের কালো সাদা গাছের গুঁড়ি, উজ্জ্বল ঘাসের জমি আর অন্ধকার বন, কালো পাহাড়ের গায়ে সাদা কোয়ার্ৎজের রেখা। পান্দিওনের চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল এই সব আর আরো অনেক কিছু।

সবুজ সাগরের ঊষর পাথুরে তীরে পান্দিওনের দেশ একেবারেই অন্যধরনের। সেখানে প্রাণস্রোত কখনো ছুটে চলে না এরকম দুর্বার বন্যাধারায়, তার সাদায় কালোয় নেই এরকম প্রবল বিরোধ।

পান্দিওন উঠে পড়ল। অতল অনন্ত সমুদ্র। তার ওপারে এনিয়াদা। এই মহাসমুদ্র পান্দিওনকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে আফ্রিকার কাছ থেকে। বিমর্ষ পাহাড়শ্রেণীর নিশীথ ছায়ায় শুয়ে আছে আফ্রিকা। মনে মনে পান্দিওন এর মধ্যেই তাকে ছেড়ে এসেছে। সামনে তার ঢেউয়ের বুকে ছুটে বেড়াচ্ছে তারার ছায়া। আর ঐ উত্তরে সমুদ্র হাত মিলিয়েছে তার স্বদেশ এনিয়াদার সঙ্গে, যেখানে বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তেস্‌সা। দেশে ফেরার আশায়, তেস্‌সার জন্য রক্ত আর বালিতে, গরম আর অন্ধকারে সে লড়াই করেছে, যুঝেছে মানুষ আর বন্য জন্তুর সৃষ্ট অসংখ্য বিপদের সঙ্গে।

সপ্তর্ষির প্রান্ত যেখানে ছুঁয়েছে দিগন্তকে, সেইখানে সমুদ্রের উপরে

---

* কয়লার বস্তা (coalsack) — আকাশের দক্ষিণ গোলার্ধে জমাটবাঁধা কালো অস্বচ্ছ পদার্থ।

রয়েছে অস্বচ্ছ তারার দল। তেস্‌সাও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই তারাদের মতোই — বহুদূরের আদরের, ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

হঠাৎ তার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেল পান্দিওন — সমুদ্রের ক্ষয়হীন প্রতীক এই পাথরটির বুকে সে গড়বে সাগরতীরে দাঁড়িয়ে থাকা তেস্‌সার মূর্তি।

পান্দিওন পাগলের মতো এত জোরে বাটালিটায় চাপ দিল যে শক্ত কাঠটা গেল ভেঙে। বেশ কয়দিন ধরে সে ইয়াখ্‌মসের পাথরটা নিয়ে কাজ করে চলেছে প্রাণপণে মনের অধৈর্যকে চেপে রেখে। কখনো প্রত্যয়ের সঙ্গে টেনে দিচ্ছে দীর্ঘ রেখা, কখনো আবার অসীম যত্নের সঙ্গে কেটে চলেছে ছোট ছোট আঁচড়। মূর্তিটা ক্রমেই ফুটে উঠছে। তেস্‌সার মাথাটা খুবই ভাল হয়েছে — বিদায় মুহূর্তে আখেলই অন্তরীপের সাগর তীরে, তেস্‌সার মাথার সেই দর্পিত ভঙ্গীটি পান্দিওনের চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। পাথরের স্বচ্ছ গভীরতায় সে ফুটিয়ে তুলেছে সেই মাথাটি। ঘষা নীল মুখটা তীক্ষ্ন রেখায় ফুটে উঠেছে পাথরের কাঁচের মতো বুকে। একটা সুস্পষ্ট বাঁকা রেখায় দেখান হয়েছে কাঁধের ডৌল। তার উপর স্বচ্ছন্দ অনায়াস রেখায় লুটিয়ে আছে অলকদল। কিন্তু তারপর ... তারপর পান্দিওন হঠাৎ দেখল তার প্রেরণা গেছে ফুরিয়ে। নিজের উপর এখন তরুণ শিল্পীর আগের চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাস। দৃঢ় দীর্ঘ রেখায় সে গড়ে তুলল তেস্‌সার শরীরের ঘের। রেখার সৌন্দর্যে প্রকাশ পেল তার কাজের সাফল্য। চারপাশের পাথর কেটে ফেলে পান্দিওন তার খোদাই কাজটিকে আরো সুস্পষ্ট করে তুলল। তখন তার হঠাৎ খেয়াল হল, এ তো তেস্‌সার প্রতিকৃতি নয়। অধোদেশ, হাঁটু আর বুকের রেখায় প্রাণ পেয়েছে ইরুমার দেহ। কোন কোন জায়গায় নিঃসন্দেহে নিওরার ছাপ। তেস্‌সার শরীরটি তো গ্রীক মেয়ের দেহ নয়। পান্দিওন গড়ে তুলেছে এক নির্বস্তুক মূর্তি। সে কিন্তু চেয়েছিল অন্য কিছু, চেয়েছিল তার প্রিয় তেস্‌সার জীবন্ত রূপ দিতে। সাম্প্রতিকের ছায়াকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য সে প্রাণপণে প্রয়োগ করল তার স্মৃতিশক্তিকে। কিন্তু সবই ব্যর্থ হল, নতুন যা তা আরো সজীব হয়ে উঠল।

মূর্তিতে এবারেও সে প্রাণের স্পন্দন ফোটাতে পারেনি, এ কথা বুঝতে পেরে পান্দিওনের খুবই খারাপ লাগল। যতক্ষণ শরীরের ঘেরটুকু কেবল ছিল, ততক্ষণ তার রেখায় প্রাণের ছন্দও দেখা গিয়েছিল। সমান শরীরটাকে খুদে তুলতে গিয়ে তা পাথরে পরিণত হল, হয়ে গেল নিরুত্তাপ অনড় জড়। তার মানে শিল্পের গোপন রহস্য পান্দিওন এখনো ধরতে পারেনি। এই মূর্তিও তবে থেকে যাবে প্রাণহীন! মনের ভাবকে সে পারবে না রূপ দিতে।

উত্তেজনার চোটে বাটালিটা ভেঙে ফেলে পান্দিওন পাথরটা তুলে নিয়ে দূরে ধরে দেখতে লাগল। না, তেস্‌সার মূর্তি সে রচনা করতে পারেনি। অত্যাশ্চর্য ক্যামিওটি তবে আর শেষ হবার নয়।

স্বচ্ছ পাথরটার ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো ফুটে উঠে পাথরটাকে পান্দিওনের দেশের সমুদ্রের সোনালি আভায় ভরে দিয়েছে। পাথরের গায়ের এক ধারে একেবারে ডান দিক ঘেঁষে পান্দিওন খোদাই করেছে মেয়েটির প্রতিকৃতি, অধিকাংশ জায়গাই রয়েছে ফাঁকা। তেস্‌সার মতো মুখ অথচ তেস্‌সা নয়, সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে পাথরের এক ধারে যেন সমুদ্র তীরেই। যে প্রেরণার উৎসাহে পান্দিওন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করেছে, অধীরভাবে অপেক্ষা করে থেকেছে নতুন দিনের, তা এখন লুপ্ত। পাথরটা সে লুকিয়ে রাখল। বাটালিগুলো তুলে রেখে খাড়া করল টনটন করে ওঠা পিঠটা। পরাজয়ের বেদনা কিছু লাঘব হয়েছে, সুন্দর জিনিস সে এখনো সৃষ্টি করতে পারে এই চেতনায় ... কিন্তু হায়, সজীব সত্তার তুলনায় তা কত খেলো! নিজের কাজে পান্দিওন এতদিন এতই মগ্ন হয়ে ছিল যে সঙ্গীদের আসার কথা একেবারেই খেয়াল ছিল না। একটি ছোট ছেলেকে ছুটে আসতে দেখে পান্দিওনের যত বিষণ্ণ চিন্তা দূর হয়ে গেল।

'ঘন দাড়িওয়ালা লোকটি ফিরে এসেছে। তোমায় নদীর কাছে যেতে বলেছে,' অমন একটা কাজের ভার পেয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে জানাল কাভির চর।

কাভি নদীতীর থেকে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে বলে পান্দিওন বেশ চিন্তিত হয়ে উঠল। কাঁটাঝোপের ভিতর একটা আঁকাবাঁকা পথ ধরে সে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল নদীতীরে। দূর থেকে নদীর বালিতীরে দেখতে পেল কয়েকটি সঙ্গীকে। এক গোছা নলখাগড়ার উপর একজন কে যেন পড়ে আছে। অন্যেরা দাঁড়িয়ে আছে তাকে ঘিরে। জখম পাটা যাতে না ফেলতে হয় তাই পান্দিওন অদ্ভুতভাবে দৌড়ে এগিয়ে এসে যোগ দিল বন্ধুদের দলে। তারা তখন সবাই নির্বাক। পান্দিওন দেখল নলখাগড়ার উপর পড়ে আছে তাকেল। এই তরুণ লিবীয়ার লোকটিও যোগ দিয়েছিল মরুভূমি পার হয়ে পালানর দলে। হাঁটু গেড়ে তার সঙ্গীর উপর ঝুঁকে পড়ল পান্দিওন। পান্দিওনের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা ছবি — ভীষণ হাঁপধরান গরম বালিপাথরের গিরিবর্ত্ম দিয়ে সে ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে তেষ্টায় অর্ধমৃত। আখ্‌মির সঙ্গে যারা তখন তার জন্য কুয়ো থেকে জল নিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে তাকেলও ছিল। তাকেলের উপর ঝুঁকে পড়ে পান্দিওন এই প্রথম অনুভব করল, সেই বিদ্রোহ আর পালানর ব্যাপারে যারা যোগ দিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই তার কত প্রিয়। তাদের সাহচর্যে সে এমনই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, তাদের বাদ দিয়ে নিজের জীবনটা সে কল্পনাই করতে পারে না। সঙ্গীরা সবাই কাছেই নিরাপদে জেনে, দিনের পর দিন নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, তাদের সঙ্গে সে তেমন কোন যোগাযোগ না রেখে চলতে পেরেছে। কিন্তু এই আকস্মিক মৃত্যুতে সে ভেঙে পড়ল। হাঁটু গেড়ে বসে থেকেই সে ঘুরে তাকাল কাভির দিকে জিজ্ঞাসু চোখে।

'আবলুস কাঠের খোঁজ করছিলাম। এমন সময় ঝোপের মধ্যে তাকেলকে সাপে কামড়াল,' করুণ স্বরে বলল কাভি, 'কোন ওষুধপত্র তো জানা নেই —' গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলে চলল, 'তাই সব কিছু ছেড়ে নৌকো বেয়ে ফিরে এলাম। তীরে যখন নামাচ্ছি তখনই ও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তোমায় ডেকে পাঠালাম ওকে বিদায় জানাবার জন্য ... কিন্তু দেরী হয়ে গেছে ...' কাভি আর কথা শেষ করতে পারল না। মাথাটা সে নামিয়ে নিল, হাতদুটো জোরে মুঠো করা।

পান্দিওন উঠে দাঁড়াল। তাকেলের মৃত্যুটা তার কাছে অত্যন্ত অর্থহীন আর অন্যায় বলে মনে হল। কোন মহান যুদ্ধ বা বুনো জন্তুর সঙ্গে লড়াই নয়। মৃত্যু এখানে এই শান্তিপূর্ণ গ্রামে, যেখানে রয়েছে দীর্ঘযাত্রার নানা বীরত্ব আর সাহসিকতার পর ঘরে ফেরার প্রতিশ্রুতি! এই মৃত্যু পান্দিওনের মনে গভীরভাবে বাজল। চোখ তার জলে ভরে উঠল। নিজেকে সামলে নেবার জন্য সে মুখ ঘুরিয়ে নদীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। বালুতীরের দুধারে ঘন নলখাগড়ার সবুজ দেয়াল। হালকা সোনালি রঙের বালির ঢিবিগুলো যেন সবুজ তোরণের মধ্যে দাঁড়িয়ে। বনের প্রান্তে রয়েছে গাঁটওয়ালা পাকান পাকান গাছ, ছোট ছোট পাতায় ভরা। গাছের ডাল থেকে কে যেন ঝুলিয়ে দিয়েছে অজস্র টকটকে লাল ফুলের* মালা। ফুলের ফোলা ফোলা গুচ্ছগুলো দেখে মনে হয় আড়াআড়িভাবে বসান সরু ডালের উপর কেউ বুঝি সুতো দিয়ে সূক্ষ্ম নক্সা তুলেছে। কিছু ঝুলে রয়েছে নিচের দিকে আর বাকি গুচ্ছ ঊর্ধ্বমুখে আকাশে চেয়ে। ফুলগুলির লাল ছায়া পড়েছে। মৃত তাকেলের আত্মা যে-লোকে যাত্রা করেছে সেখানে সবুজ তোরণের বুকে উদ্দীপ্ত মশালের মতো জ্বলছে সাদা গাছগুলি। দুপাশের বালুচড়ার মধ্যে দিয়ে অলস ধারায় ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে নিষ্প্রভ নদী। শত শত কুমীর পাড়ের উপর শুয়ে। পান্দিওন যেখানে দাঁড়িয়ে তার কাছেই একটা বালির চড়ায় কয়েকটা বিরাট বিরাট কুমীর হাঁ করে দিব্যি ঘুমচ্ছে। সূর্যের আলোয় তাদের ভয়ংকর দাঁতগুলো যেন কালো গহ্বর ঘিরে সাদা সাদা কাঁটার সারি। কুমীরগুলো বালির উপর শরীর মেলে দিয়েছে যেন নিজের ভারেই তারা পিষ্ট। তাদের চেপ্‌টা পিঠ দুধারে ঢাকা পড়েছে পেটের আঁশওয়ালা চামড়ার বড় বড় ভাঁজে। পিঠের উপরে সারি সারি অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের ফুলে ওঠা কাঁটা, তার ফাঁকে ফাঁকে কালচে সবুজ রং। থাবার গ্রন্থিগুলো অদ্ভুতভাবে বাইরের দিকে ফিরিয়ে থাবাগুলোকে কুৎসিত ভঙ্গীতে মেলে দিয়েছে শরীরের দুপাশে। মাঝে মাঝে একটা

---

* কম্‌ব্‌রেতুম্‌ পুর্‌পুরেউম।

কুমীর হয়ত তার খাঁজকাটা লম্বা লেজটা দিয়ে আরেকটার গায়ে লাগায় এক ঝাপট, অন্যটাও ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বিরক্ত হয়ে সজোরে মুখ বন্ধ করে ফেলে। সেই শব্দ নদীর বুকে জোর প্রতিধ্বনি তোলে।

যাত্রীরা মৃতদেহটি তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বয়ে নিয়ে চলল গ্রামের দিকে। শঙ্কিতদৃষ্টি গ্রামবাসীরা ছুটে এল। কাভির কাছ থেকে দূরে সরে সবার পিছন পিছন হাঁটছে পান্দিওন। তাকেলের মৃত্যুর জন্য কাভির নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছে, কারণ আবলুস কাঠ আনতে যাওয়ার মৎলবটা তারই দেওয়া। বিষাদমগ্ন শবযাত্রার পাশে পাশে ঠোঁট কামড়ে ঘন দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে চলেছে কাভি।

পান্দিওনের মনেও তখন বিবেকের জ্বালা। নিজেকে তারও দোষী মনে হচ্ছে। প্রণয়িনীর মূর্তি খোদাই করার জন্য তার এত উৎসাহিত হয়ে ওঠার কী অধিকার ছিল? সেই সময়টা তার উচিত ছিল সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন জাতির বন্ধুত্বের স্মরণে শিল্পসৃষ্টি করা, যারা সব পরীক্ষা একসঙ্গে পার হয়েছে, মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণার মুখে, অত্যন্ত ক্লান্তিকর যাত্রার দুঃখে ভরা দিনেও যারা ছিল সত্যনিষ্ঠ। "আগে কেন এ কথাটা মাথায় এল না?" পান্দিওন নিজেকেই জিজ্ঞেস করে। তার কাজ বৃথাই পণ্ড হয়নি — অকৃতজ্ঞতার জন্য দেবতারা তাকে শাস্তি দিয়েছেন ... আজ যে দুঃখ সে পেল সে দুঃখে যেন তার চোখ খুলে যায় ...

এক পাল মোষের মতো হালকা বেগুনী-ধূসর রঙের শক্ত জমাট বাঁধা মেঘের দল ধীরে ধীরে গুড়ি মেরে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। বাজের চাপা আওয়াজে বাতাস ধ্বনিত। গ্রীষ্মাঞ্চলের প্রবল বৃষ্টি নামল বলে। বাইরে যা কিছু ছড়ান ছিল লোকেরা তাড়াতাড়ি ঘরে তুলে ফেলল।

কাভি আর পান্দিওন কোনরকমে যেই ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে তখুনি কে যেন আকাশটা দিল উপুড় করে। জলধারার গর্জনে ডুবে গেল মেঘের আওয়াজ। যেমন হয়, একটু পরেই বৃষ্টি গেল থেমে। ফুরফুরে ভিজে হাওয়ায় গাছপালার তীব্র গন্ধ। অসংখ্য জলধারা অস্পষ্ট কলকল

শব্দে ছুটে চলেছে নদী বা সমুদ্রের দিকে। হাওয়ায় ভেজা গাছে চাপা খসখস শব্দ। বিষণ্ণ, দুঃখে ভরা এই শব্দের সঙ্গে পরিষ্কার খট্‌খটে দিনে পাতার দ্রুত আন্দোলনের শব্দের তুলনা হয় না। বনের নানা রকম শব্দ শুনতে শুনতে কাভি হঠাৎ বলে উঠল:

'তাকেলের মৃত্যুর জন্য আমি কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। আমারই দোষ — অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক ছাড়া ওভাবে যাওয়াটা উচিত হয়নি। এ দেশে আমরা আগন্তুক, এখানে অসাবধানতা মানেই সাক্ষাৎ মৃত্যু। ফলে আবলুস কাঠ তো জুটলই না, উলটে আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু ঐ নদীর ধারে পাথরের স্তূপের নিচে পড়ে রইল... আমার বোকামির ভীষণ দাম দিতে হল ... আরেকবার চেষ্টা করার জন্য মন স্থির করে উঠতে পারছি না; অথচ বাতাসের সন্তানদের মাশুল দেবার মতো কিছুই নেই ...'

পান্দিওন নিঃশব্দে থলি থেকে একমুঠো উজ্জ্বল পাথর বের করে বন্ধুর সামনে মেলে দিল। তা দেখে কাভি সম্মতিসূচক ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, কিন্তু তক্ষুনি আবার তার মুখে দেখা দিল দ্বিধার আভাস।

'এই পাথরের দাম যদি ওরা না জানে, তবে হয়তো নিতে রাজী হবে না। আমাদের দেশে এসব পাথরের নাম কেই বা শুনেছে? মূল্যবান জিনিস বলে কে কিনবে ... যদিও ...' কাভি চিন্তিত হয়ে একটু থামল।

পান্দিওন ভয় পেল। কাভির এই সহজ ইঙ্গিতটা এতদিন তার মাথায় ঢোকেনি। বণিকদের কাছে যে পাথরগুলো মূল্যহীন হতে পারে এ কথাটা সে ভাবেনি। পাথরগুলোর দিকে বাড়ান তার হাতটা ভবিষ্যত সম্পর্কে ভয় আর আশংকায় কাঁপতে থাকল। পান্দিওনের মুখে শংকার ছায়া দেখে কাভি বলল:

'কোথায় যেন শুনেছি, একধরনের অত্যন্ত শক্ত স্বচ্ছ পাথর নাকি সুদূর পূর্বদেশ থেকে সাইপ্রাস আর কারিয়ায় মাঝে মাঝে আনা হত, তার দামও নাকি প্রচুর। বাতাসের সন্তানরা হয়তো সে কথা জানতেও পারে ...'

কাভির সঙ্গে আলাপের পরদিন সকালবেলা পান্দিওন একটা পথ ধরে এগিয়ে গেল পাহাড়ের পাদদেশে। অনেক কলাগাছ সেখানে। কিদগোর ফেরার সময় হয়ে আসছে, বন্ধুরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে। বাতাসের সন্তানদের জন্য দামী জিনিস কিছু কী করে জোগাড় করা যায় সে বিষয়ে তারা তার সঙ্গে পরামর্শ করতে চায়। কাভির সন্দেহের পর দক্ষিণের পাথরগুলোর উপর পান্দিওনের আর ভরসা নেই। তার মনের শান্তিও ব্যাহত। নিজের অজান্তেই সে তার নিগ্রো বন্ধুর অভিযাত্রী দলের আশায় পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে। এ ছাড়া অবশ্য আরেকটা কারণও আছে। একটা নতুন শিল্পসৃষ্টি তার মনে রূপ নিতে সুরু করেছে। তা নিয়ে সে একটু নির্জনে ভাবতে চায়। পায়ে চলা শক্ত পথটা ধরে পান্দিওন নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। আর সে খোঁড়াচ্ছে না, ফিরে পেয়েছে আগেকার সহজ চলার ভঙ্গী। স্থানীয় লোকেরা হলদে ফলের কাঁদি নিয়ে পথ দিয়ে যেতে যেতে তার দিকে চেয়ে বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসেবে হেসে বা পাতার গুচ্ছগুলো নেড়ে চলে যাচ্ছে। পথটা বাঁয়ে বেঁকেছে। সোনালি রোদ মাখা রসে ভরা গাছের সবুজ দেয়ালের মাঝখান দিয়ে পান্দিওন হেঁটে চলেছে। উত্তপ্ত রোদে একটি মেয়ে মোহন ভঙ্গীতে ঐ পথ ধরেই চলেছে। মেয়েটিকে পান্দিওন চিনতে পারল। নিওরা। কলার ঝুলেপড়া কাঁদিগুলোর মধ্যে থেকে সবচেয়ে সবুজ ফলগুলো বেছে বেছে ছিঁড়ে নিয়ে সে একটা লম্বা ঝুড়িতে ভরছে। বড় বড় কলাপাতার ছায়ায় পান্দিওন দাঁড়িয়ে গেল। তার মন থেকে অন্য সব চিন্তা দূর করে দিল শিল্পীর আবেগ। তরুণী নিওরা এক ঝাড় থেকে আরেক ঝাড়ে যাচ্ছে। ঝুড়ির উপর মোহন ভঙ্গীতে ঝুঁকে পড়ছে তার দেহ। তারপর আবার সে আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠছে। উপরের ফলগুলো ধরার জন্য মেলে দিচ্ছে হাতদুটো। সোনালি রোদ তার মসৃণ কালো ত্বকে ঝলমল করে উঠছে, উজ্জ্বল সবুজ পাতার পটভূমিকায় তার কালো গা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটু লাফিয়ে উঠে শরীরটা ধনুকের মতো বাঁকা করে নিওরা উপরের মখমলের মতো নরম কলা পাতাগুলোর দিকে হাত বাড়াল। মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে পান্দিওন একটা শুকনো ডালে ধাক্কা খেতে জোর শব্দ

হল। সঙ্গে সঙ্গেই নিওরা ঘুরে দাঁড়িয়ে থেমে গেল। পান্দিওনকে সে চিনতে পেরেছে। তার যন্ত্রের বাঁধা তারের মতো টান শরীরটা শান্ত হয়ে গেল। পান্দিওনের দিকে তাকিয়ে সে হাসল। পান্দিওন কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করল না। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা পুলকের আবেগোক্তি। বড় বড় সোনালি চোখদুটি নিওরার দিকে চেয়ে। কিন্তু সে চোখ নিওরাকে দেখছে না। মুখে তার ফুটে উঠেছে ক্ষীণ হাসি। নিওরা হকচকিয়ে গিয়ে পান্দিওনের কাছ থেকে কয়েক পা দূরে সরে গেল। হঠাৎ অপরিচিত ভাষায় কী যেন চেঁচিয়ে উঠে পান্দিওন দৌড়ে চলে গেল।

পান্দিওন হঠাৎ একটা মহান আবিষ্কার করে ফেলেছে। নিজের অজান্তে অথচ একান্তভাবে এটাই সে খুঁজছিল। এতদিন সারাক্ষণ সে মনে মনে যা খুঁজেছে, যার খুব কাছাকাছি এসেছে, এত কিছু দেখা আর তুলনা ছাড়া, শিল্পের নতুন পথের সন্ধান ছাড়া তা খুঁজে পাওয়া যেত না। যার মধ্যে প্রাণ আছে তা কখনো জড় হতে পারে না। সুন্দর সজীব শরীরে কখনো দেখা যায় না নিষ্প্রাণ নিশ্চলতা। দেখা যায় কেবল শান্ত বিরাম, সে মুহূর্তে একটি আন্দোলন সম্পূর্ণ হয়ে সুরু হয় আরেকটা বিপরীত আন্দোলন। এই মুহূর্তটিকে পান্দিওন যদি নিশ্চল জিনিসে ফুটিয়ে তুলতে পারে তবে মৃত পাথরও প্রাণ পেয়ে উঠবে।

নিশ্চল নিওরাকে কালো ধাতুতে তৈরী মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পান্দিওনের এই কথাই মনে হল। ছোট্ট খোলা জায়গার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাছের কাছে সে একা এগিয়ে গেল। কেউ তখন তাকে দেখলে ভাবত সে নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে: নড়েচড়ে হাত-পা ছড়িয়ে ঘাড় নেড়ে চোখ পাকিয়ে সে নানা কাণ্ড জুড়ে দিল। ঘরে যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পান্দিওন তখন উত্তেজিত, চোখে তার প্রবল দীপ্তি। কাভি তো ভীষণ অবাক। সামনে দাঁড় করিয়ে পান্দিওন তাকে একবার হাঁটায়, আবার দাঁড় করায়। প্রথম প্রথম কাভি তার বন্ধুর এই খেয়ালে ধৈর্য ধরেই ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর সইতে পারল না। কপাল চাপড়ে গোঁয়ারের মতো মাটিতে চেপে বসে পড়ল। পান্দিওন কিন্তু তবু তাকে ছাড়ে না। তখনো কাভির দিকে ঠায় চেয়ে প্রথমে দেখে

বাঁ দিক থেকে, তারপর ডান দিক থেকে। শেষ পর্যন্ত কাভি তেড়ে গালাগাল দিয়ে বলে উঠল, পান্দিওনের অসুখ হয়েছে, তাকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখবে বলে ভয় দেখাতেও লাগল।

'মরগে যাও! তোমায় আমি থোড়াই ডরাই। সাদা হরিণের শিঙের মতো তোমায় মুচড়ে পেঁচিয়ে দেব,' পান্দিওন সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল।

কাভি তার বন্ধুকে কখনো এরকম বাচ্চাছেলের মতো হাসিখুসি দেখেনি। সে তাতে খুসিই হল, কারণ বহুদিন থেকেই সে পান্দিওনের মনমরা ভাবটা লক্ষ্য করছে। বিড়বিড় করে কী যেন বলে কাভি পান্দিওনকে আস্তে করে একটা ঘুষি মারল। পান্দিওন সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গিয়ে জানাল তার মারাত্মক ক্ষিদে পেয়েছে। দুবন্ধুতে বসে গেল রাতের খাবার নিয়ে । পান্দিওন বন্ধুকে বোঝাতে লাগল তার মহান আবিষ্কারের কথাটা। অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা গেল কাভিও ব্যাপারটাতে বেশ কৌতূহলী। পান্দিওনকে অনেক কথা সে জিজ্ঞেস করল। সত্যিকার প্রাণকে রূপ দিতে গিয়ে পান্দিওন যে সব বাধা পেয়েছে সেসব বুঝতে চেষ্টা করল।

দুই বন্ধুর কথাবার্তা যখন শেষ হল, তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

খোলা দরজা দিয়ে তারার আলো এসে পড়েছে, হঠাৎ সে আলো ঢাকা পড়ে গেল কার আড়ালে। কিদগোর গলার স্বরে পান্দিওনরা আনন্দে চমকে উঠল। কিদগো হঠাৎ ফিরে এসে একেবারে সোজাসুজি তার বন্ধুদের কাছেই চলে এসেছে। শিকারের ফলাফলের কথা জিজ্ঞেস করতে সে যা বলল তা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বলল, সে বড় ক্লান্ত, পরদিন সকালে সে তার শিকার সব দেখাবে। আবলুস কাঠের সন্ধানে তাদের অভিযান আর তাকেলের মৃত্যুর কথা কাভি আর পান্দিওন কিদগোকে জানাল। কিদগো তো তা শুনে ক্ষেপেই আগুন। বন্ধুদের গালাগাল দিয়ে সে বলল, তার আতিথ্যকে তারা অপমান করেছে কাভিকে 'বুড়ো হায়েনা' বলে গালাগাল পর্যন্ত দিল। শেষ কালে ঠাণ্ডা হল কিদগো, তার রাগ

ছাপিয়ে উঠল সঙ্গীদের একজনের মৃত্যুবেদনা। কাভি আর পান্দিওন তখন তাকে জানাল বাতাসের সন্তানদের কী মাশুল দেওয়া যায় তা নিয়ে তারা বড় ভাবনায় পড়েছে, কিদগো এ বিষয়ে কী বলে। কিদগো সে কথা কানেও তুলল না। কোন জবাব না দিয়ে সে চলে গেল।

পান্দিওনরা হতাশ হয়ে পড়ল। ধরে নিল তাকেলের মৃত্যুশোকই বুঝি কিদগোর এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ। অনেকক্ষণ দুজনের ঘুম এল না, শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করে নিজেদের অবস্থা নিয়ে ভাবতে লাগল।

পরদিন সকাল অনেকটা গড়িয়ে গেলে পর কিদগো আবার তার বন্ধুদের কাছে এল। তার স্নেহকোমল মুখটায় একটা ধূর্তামির ভাব। তার সঙ্গে লিবীয়ার সবাই আর কিদগোর তরুণ জাতভাইদের একটা দল। কিদগোর জাতভাইরা হতভম্ব বিদেশীদের দিকে তাকিয়ে কখনো চোখ ঠারে, কখনো নিজেদের মধ্যে কানাকানি করে জোরে হেসে ওঠে আর দুর্বোধ্য কী সব বলে ওঠে। তারা বোঝাতে চায়, তাদের জাতি নাকি যাদুবিদ্যার জন্য বিখ্যাত, কিদগো সাধারণ লাঠিকে আবলুস কাঠ আর হাতির দাঁতে পরিণত করতে পারে, নদীর বালি নিয়ে বানিয়ে দিতে পারে সোনা। এইসব বাজে কথা শুনতে শুনতে বিদেশীরা এগোতে লাগল কিদগোর বাড়ির দিকে। কিদগো একটা ছোট্ট ভাঁড়ার ঘরে তাদের নিয়ে গেল। ভাঁড়ার ঘরটা অন্য বাড়িগুলোর চেয়ে একটু ছোট। তার একটা দরজা, বাইরে থেকে সেটা বিরাট পাথর দিয়ে বন্ধ করা। দলের লোকজনের সাহায্যে কিদগো পাথরটা সরিয়ে দিল। খোলা দরজাটার দুপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল তরুণ গ্রামবাসীরা। গুড়ি মেরে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে কিদগো তার বন্ধুদেরও হাত নেড়ে ডাকল। কাভি, পান্দিওন আর লিবীয়ার লোকেরা ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অন্ধকারের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সামনের বের করা চালাটা আর মাটির দেয়ালের মধ্যে যে সরু ফাঁক, সেখান দিয়ে অল্প আলো আসছে। পান্দিওনদের চোখ ক্রমশ সে আলোয় অভ্যস্ত হয়ে এল। তখন চোখে পড়ল অনেকগুলো মোটা আবলুস গাছের গুঁড়ি, একগাদা হাতির দাঁত আর পাঁচ ঝুড়ি

ভর্তি কবিরাজী বাদাম। কিদগো তার সঙ্গীদের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে বলল:

'এসবই তোমাদের। তোমাদের যাত্রা সহজ আর সুখের করে তোলার জন্য আমার জাতের লোকেরা এই সব জোগাড় করেছে। এমন মাশুলের পর বাতাসের সন্তানদের দশ নয় বিশজন যাত্রীই নেওয়া উচিত ...'

'তোমার লোকেরা আমাদের এইসব উপহার দিচ্ছে,' কাভি বলে উঠল, 'কেন?'

'কারণ তোমরা বীরপুরুষ, তোমরা খুব ভাল লোক। কারণ তোমরা এত সব বীরত্বের কাজ করেছ। তাছাড়া তোমরা আমার বন্ধু, আমার বাড়ি ফিরে আসায় তোমরা সাহায্য করেছ। কিন্তু একটু অপেক্ষা কর, এইই সব নয়!' অবিচলিত শান্ত ভাব দেখাবার চেষ্টা করে কিদগো বলল। তারপর একপাশে সরে এসে ঝুড়িগুলোর মাঝখান থেকে তুলে নিল মানুষের মাথার সমান একটা শক্ত চামড়ার থলে।

'নাও,' কাভিকে থলেটা দিয়ে বলল কিদগো।

হাত বাড়িয়ে থলেটা নিয়ে কাভি ভারের চোটে সেটা প্রায় ফেলেই দেয় আরকি। কিদগো তো হো হো করে হেসে উঠে আনন্দে নেচেই ফেলল। বাইরের তরুণদের মুখে যেন সেই হাসিরই প্রতিধ্বনি।

'কী এটা?' থলেটা বুকে আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞেস করল কাভি। কিদগো হেসে বলে উঠল:

'তোমার মতো বিচক্ষণ পুরনো যোদ্ধার মুখে এই প্রশ্ন? অত ভারী পৃথিবীতে আর কী হতে পারে বল!'

'সোনা!' নিজের ভাষাতেই বলে উঠল কাভি। কিদগো কিন্তু তবু বুঝতে পেরে বলল: 'হ্যাঁ, সোনা।' পান্দিওন সোনাভরা শক্ত থলেটায় চিমটি কেটে জিজ্ঞেস করল:

'এত সোনা কোথায় পেলে?'

'শিকারে না গিয়ে আমরা গিয়েছিলাম সোনার মালভূমিতে। আটদিন ধরে বালি খুঁড়ে জলে ধুয়েছি ...' একটু থেমে কিদগো আবার বলল, 'বাতাসের সন্তানরা তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত পেঁছে দেবে না। নিজেদের সমুদ্রে পেঁছলে পর তোমাদের পথ যাবে আলাদা হয়ে, প্রত্যেককে তখন নিজের পথে চলতে হবে। সোনাগুলো ভাগ করে নিয়ে ভাল করে লুকিয়ে রেখ বাতাসের সন্তানরা যাতে সোনার কথা জানতে না পারে।'

'এই "শিকারে" তোমার সঙ্গে আর কারা গিয়েছিল?' কাভি জিজ্ঞেস করল।

'এরা সবাই,' দরজার কাছের তরুণদের ভিড় দেখিয়ে কিদগো বলল।

গভীর আনন্দে আর আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় পান্দিওনরা তরুণদের ধন্যবাদ জানাতে এগিয়ে গেল। তরুণরা তো তাতে অপ্রস্তুত হয়ে উস্‌খুস করতে লাগল, শেষ কালে একে একে বাড়ির পথে রওনা দিল।

ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে বন্ধুরা পাথরটা আবার দরজার গায়ে ঠেলে দিল। কিদগো কিন্তু হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। তার হাসিখুসি ভাব গেল মিলিয়ে। পান্দিওন তাকে জড়িয়ে ধরতে সে সরে গিয়ে পান্দিওনের কাঁধের উপর হাত রেখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল তার সোনালি চোখের দিকে।

'তোমায় কী করে ছেড়ে যাব জানি না!' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল পান্দিওন।

কিদগোর আঙুলগুলো চেপে বসে গেল তার কাঁধে। মোটা গলায় বলল:

'বিদ্যুতের দেবতাকে সাক্ষী মেনে বলছি, তুমি যদি এখানে চিরকালের মতো থেকে যাও তবে মালভূমির সমস্ত সোনা, আমার যা কিছু আছে সব, শেষ বর্শাটা পর্যন্ত বিসর্জন দিতে রাজী আছি ...' কিদগোর মুখে বেদনার ছায়া। দুহাতে সে মুখ ঢেকে ফেলল। 'কিন্তু তোমার কাছে আমার কোনোও প্রার্থনা নেই...' গলাটা তার কেঁপে উঠে আটকে গেল, 'বাড়ির

মর্ম আমি বন্দীদশাতেই বুঝতে পেরেছি ... তুমি যে এখানে থাকতে পারবে না, তা আমি বুঝি... দেখতেই তো পাচ্ছ, তোমার যাত্রার ব্যাপারে আমি সবরকমেই সাহায্য করছি ...' হঠাৎ পান্দিওনকে ছেড়ে দিয়ে কিদগো এক ছুটে তার নিজের বাড়িতে চলে গেল।

তরুণ গ্রীকটি তখনো তার দিকে চেয়ে। চোখ তার ঝাপসা হয়ে উঠেছে। কাভি পান্দিওনের পিছনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

'আমাদের মধ্যেও একদিন এরকম ছাড়াছাড়ি হবে,' দুঃখের সঙ্গে মৃদু স্বরে বলল কাভি।

'আমাদের দেশ অবশ্য খুব বেশি দূরে নয়। জাহাজ চলাচলও আছে,' পান্দিওন তার দিকে ফিরে বলল। 'কিন্তু কিদগো ... কিদগো এখানেই থাকবে, এই ওইকুমেনার প্রান্তে।'

কাভি একটি কথাও বলল না।

পান্দিওন এখন তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত। তাই সে তার শিল্পে পুরো মন ঢেলে দিয়েছে। তার এখন ভীষণ তাড়া, মুক্তির সংগ্রামে পাওয়া বন্ধুত্বের মহিমার প্রবল প্রেরণা তাকে আর সময় নষ্ট করতে দিচ্ছে না। তার খোদাই কাজের পুরো নক্সাটা সে তখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে।

তিনজন তারা দাঁড়িয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ, পিছনে থাকবে সমুদ্র, সেই সমুদ্রের দিকে যাবার জন্যই তো তারা এত সংগ্রাম করেছে, সমুদ্রই তো তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে দেশে।

পাথরটার বিরাট চ্যাপ্টা গায়ে পান্দিওন তিন বন্ধুকে আঁকবে — কাভি, কিদগো আর সে। পটভূমিতে থাকবে সমুদ্রের উজ্জ্বল স্বচ্ছ আলোকিত উদার বিস্তৃতি। সমুদ্রের সেই রং এই নীলচে-সবুজ পাথর ছাড়া আর কিসে ধরা যাবে।

একধরনের হাতির দাঁতের তৈরী চ্যাপ্টা হাতা দিয়ে ঘষে কিদগোর দেশের মেয়েরা এক জাতের মলম বানায়। সেই কয়েকটা হাতা নিয়ে পান্দিওন তার উপর কয়েকটা নক্সা আঁকল। সাম্প্রতিক আবিষ্কারের ফলে

চোখের সামনে তার সবসময় একটা সজীব শরীরের প্রয়োজন। তা নিয়ে অবশ্য তেমন অসুবিধা নেই। কাভি তো সারাক্ষণই সঙ্গে রয়েছে। জাহাজ শীগ্‌গীরি আসবে ভেবে কিদগোও সব কাজকর্ম ছেড়েছুড়ে যতক্ষণ পারে বন্ধুদের সঙ্গেই কাটায়।

পান্দিওন প্রায়ই কিদগো আর কাভিকে গলা জড়াজড়ি করে দাঁড়াতে বলে। ওরাও হাসতে হাসতে দাঁড়ায়।

তিন বন্ধুতে বসে বসে প্রায়ই অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে। একে অন্যকে জানায় নিজের নিজের মনের কথা, তাদের দুঃখ পরিকল্পনা। অথচ মনের গভীরে কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে অনিবার্য বিচ্ছেদ বেদনা।

পান্দিওন কথা বলতে বলতেই শক্ত পাথরের গায়ে খোদাই করে চলে। মাঝে মাঝে সে বসে থাকে চুপ করে। তার দৃষ্টি তখন তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে — বোঝা যায় বন্ধুদের মুখের প্রয়োজনীয় কোন রেখা সে ধরার চেষ্টা করছে।

আলিঙ্গনে আবদ্ধ তিনটি শরীর ক্রমশ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে, আরো সজীব আর বাস্তব। মাঝখানে রয়েছে কিদগোর বিরাট শরীর। ডাইনে, পাথরের সাদা ফাঁকা অংশের দিকে অল্প ফিরে দাঁড়িয়ে আছে পান্দিওন। কাভি দাঁড়িয়ে বাঁয়ে। দুজনের হাতেই বর্শা। কাভি আর কিদগোর মতে তাদের প্রতিকৃতি অনেকটাই বাস্তব হয়েছে, কিন্তু পান্দিওনের নিজের ছবিটি মোটেই ভাল হয়নি। তার জবাবে পান্দিওন হেসে উঠে বলে, ওটা অত প্রয়োজনীয় নয়।

বন্ধুদের শরীরগুলো আকারে অত ছোট হলেও অত্যন্ত সজীব আর বাস্তব। প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠেছে শিল্পকৌশল। তাদের শরীরে রয়েছে বলিষ্ঠ অধীর আন্দোলনের প্রকাশ, সেই সঙ্গে কমনীয় সংযম। কাভি আর পান্দিওনের কাঁধে কিদগোর দুহাত। সে হাতে পান্দিওন ভাইয়ের ভালবাসা আর রক্ষার আন্দোলন ফুটিয়ে তুলেছে। কাভি আর পান্দিওন একাগ্রচিত্তে মাথা হেলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চেহারায় শত্রুর আক্রমণ পরাস্ত করতে উদ্যত শক্তিশালী যোদ্ধার তীক্ষ্ন সতর্কতা। তিনজনের এই প্রতিকৃতিতে ফুটে উঠেছে শক্তি আর প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি। দাসত্ব থেকে

মাতৃভূমির পথে যাত্রার এই দীর্ঘকালে পান্দিওন যে বন্ধুদের পেয়েছে তাদের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। ভাস্কর উপলব্ধি করেছে, শেষ পর্যন্ত সত্যিই সে শিল্পসৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। কিদগো আর কাভিও পান্দিওনকে নিয়ে হাসিঠাট্টা বন্ধ করেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা দম বন্ধ করে ভাস্করের হাতের খোদাই করার মায়া যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে থাকে। পান্দিওনের প্রতি তাদের নতুন মনোভাবে ক্রমশ ফুটে উঠেছে অস্ফুট ভক্তির ভাব। তাদের এই সাহসী হাসিখুসি এমনকি শিশুসুলভ তরুণ বন্ধুটি — মাঝে মাঝে মেয়েদের প্রতি উৎসাহে হাস্যকরও — যে সত্যিই বড় শিল্পী, তার প্রমাণ সে দিয়েছে। কিদগো আর কাভি তা দেখে যেমন খুসি, তেমনি অবাকও।

সৃষ্টির উৎসাহে পান্দিওন ঢেলে দিয়েছে বন্ধুদের প্রতি তার সমস্ত ভালবাসা। প্রথমে ভেবেছিল তেস্সার প্রতিমূর্তি সে খোদাই করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা তার পছন্দ হয়নি। তেস্সা, ইরুমা, নিওরা, বিভিন্ন জাতির মেয়ে তারা, কিন্তু সৌন্দর্যের মধ্যে রয়েছে তাদের আত্মীয়তা। তার কাছে তাদের প্রত্যেকেরই সমান আকর্ষণ শক্তি ... অন্য সব ব্যাপারে তাদের সমধর্মিতা আছে কিনা তা পান্দিওন কিন্তু জানে না। কিদগোর সঙ্গে তার যে বন্ধুত্ব, নিওরার সঙ্গে তেস্সার সে বন্ধুত্ব কি সম্ভব? কাভি আর কিদগোর সঙ্গে, অন্য পলাতক ক্রীতদাসদের সঙ্গে — এখন অবশ্য সংখ্যায় তারা খুবই কম — পান্দিওনের যে-সখ্য সাহচর্য তাতে রূপ নিয়েছে সমচিন্তা আর সমপ্রচেষ্টা থেকে উদ্ভূত ভ্রাতৃত্ববোধ। আনুগত্য আর সাহসের ফলে সে বন্ধুত্ব হয়ে উঠেছে পাথরের চেয়ে দৃঢ়। তারা এখন সত্যিকার ভাই হয়ে উঠেছে, যদিও তাদের একজনের জন্ম আফ্রিকার অদ্ভুত গাছের ছায়ায়, তার মতোই কালো মায়ের গর্ভে, দ্বিতীয় জন তখন উত্তরের দেশের ভীষণ ঝড়ে কেঁপে ওঠা কুঁড়েঘরের দোলনায় শুয়ে, তৃতীয় জন সৈন্যদলে যোগ দিয়ে কালো সমুদ্রের তীরবর্তী দূর প্রান্তরের ভীষণ যাযাবর দলের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত ... তাদের হৃদয় বহু বিপদের আগুনে পুড়ে দৃঢ় বাঁধনে এক হয়েছে ... দেশ, চেহারা, ধর্মের বিভিন্নতা এখন তাদের কাছে তুচ্ছ!

দেখতে দেখতে দিন কেটে গেল। পান্দিওন হঠাৎ একদিন দেখল, দেড় মাস পার হয়ে গেছে, সেইসঙ্গে বাতাসের সন্তানদের পেঁছনর নির্দিষ্ট সময়ও। একই সঙ্গে পান্দিওন ভয় আর স্বস্তি অনুভব করল। ভয়, পাছে বাতাসের সন্তানরা একেবারেই না আসে। স্বস্তি, কারণ কিদগোর সঙ্গে অনিবার্য বিচ্ছেদ তবে পিছিয়ে যাবে। উৎকণ্ঠার ফলে পান্দিওনের কাজ প্রায়ই থেমে থাকে — কাজটা অবশ্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রায়ই সমুদ্রের কাছে গিয়ে পান্দিওন তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। বেশিক্ষণ সে বন্ধুদের ছেড়ে থাকতে চায় না।

একদিন পান্দিওন বরাবরের মতো সমুদ্র স্নানে বেরবার জন্য তৈরী হয়ে বন্ধুদের ডাক দিল। তারা কিন্তু যেতে রাজী নয়। তারা তখন চিবনর পাতা সবচেয়ে ভাল করে কীভাবে তৈরী করা যায় তাই নিয়ে তর্কে ব্যস্ত। হঠাৎ দূরে শোনা গেল অনেকের গলা, চেঁচামেচি আর আনন্দধ্বনি। কিদগোর জাতভাইরা যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই এরকম উত্তেজিত হয়ে ওঠে। গোলমাল শুনেই কিদগো লাফিয়ে উঠল, মুখ তার তখন ফ্যাকাশে, শক্তিশালী চওড়া বুকে পর্যন্ত সেই পাঁশুটে রং ছড়িয়ে পড়েছে। অল্প টলে কিদগো তার নিজের বাড়িতে ছুটে গেল। তার হতভম্ব বন্ধুদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে গেল:

‘নিশ্চয় বাতাসের সন্তানরা!’

কাভি আর পান্দিওনও লাফিয়ে উঠে পান্দিওনের পরিচিত একটা পথ ধরেই তীরের দিকে দৌড়তে সুরু করল। একটা টিলার মাথায় উঠে তারা দাঁড়িয়ে গেল। কাভি চীৎকার করে বলল:

‘বাতাসের সন্তানরা!’

বিরাট পাহাড়ের ঘন লাইলাক ছায়া অনেকদূর ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের বুকে। ঢেউয়ের উজ্জ্বলতা বনের ঘন জঙ্গলের বিষণ্ণ অন্ধকার ছায়ায় ম্লান। ধূসর বালির উপর টেনে তোলা হয়েছে কতগুলো কালো জাহাজ। অনেকটা গ্রীক জাহাজের মতোই চেহারা, হাঁসের বুকের মতো বাঁকা গলুই। জাহাজ পাঁচটার মাস্তুলগুলো নামান। যেন পাঁচটা কালো হাঁস তীরে উঠে ঘুমচ্ছে।

ছাই রঙের রুক্ষ জোব্বা পরা যোদ্ধারা জাহাজের সামনে ঘোরাফেরা করছে। ঝক্‌মক্‌ করছে তাদের ব্রোঞ্জের ঢাল। হাতে তাদের লম্বা হাতলওয়ালা চওড়া পরশু। সর্দাররা, ব্যবসায়ীরা আর যাদের পাহারার কাজ নেই তারা নিশ্চয় ইতিমধ্যেই কিদগোর গ্রামে গিয়ে পেঁছেছে। কাভি আর পান্দিওন ফিরে গেল।

কিদগো তাদের বাড়িতে পান্দিওনদের জন্যই অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল।

'বাতাসের সন্তানরা সর্দারদের ওখানে রয়েছে,' কিদগো জানাল। 'মামাকে বলেছি বড় সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে। মামা নিজে তোমাদের কথা ওদের বলবেন। সেটাই ভাল হবে। মামার সঙ্গে ঝগড়া করার সাহস বাতাসের সন্তানদের হবে না, ওরা ঠিক তোমাদের পেঁছে দেবে।' কিদগোর মুখে ফুটে উঠল একটা ক্ষীণ নিরানন্দ হাসি।

শত শত লোক তীরে এল যাত্রী জাহাজগুলোকে বিদায় জানাতে। বাতাসের সন্তানদের তখন মহা তাড়া। সূর্য ওদিকে অস্তে ঢুলে পড়েছে। অথচ কী কারণে যেন তারা সেদিন বেরবেই বলে পণ করেছে। মালবোঝাই জাহাজগুলো শৈলমালার কাছেই দুলছে। অন্যান্য মালের মধ্যে রয়েছে কিদগোর জাতভাইদের উপহার — পূর্বতন ক্রীতদাসদের স্বদেশে ফেরার মাশুল। বালিতীরের বুকজল ঠেলে সবাই জাহাজে উঠবে। বাতাসের সন্তানদের সর্দাররা তীরে দাঁড়িয়ে নিগ্রো সর্দারদের সঙ্গে কথা বলছিল। বলে গেল, আসছে বছর আবার তারা নির্দিষ্ট সময়ে নিশ্চয় আসবে, আরো বেশি মাল যেন তৈরী রাখা হয়।

কাভি কিদগোর পাশে দাঁড়িয়ে। হাতে তার মস্ত একটা পোঁটলা। তাতে সেই মারাত্মক 'গিশুর' চামড়া আর মাথার খুলি। বিদায় উপহার হিসেবে কিদগো, কাভি আর পান্দিওনকে দুটো বড় ছুঁড়ে মারার ছুরি দিয়েছে। অস্ত্রটি তেংগ্রেলা জাতির তৈরী। পাঁচটা ফলায় ভাগ করা একটা মস্ত ব্রোঞ্জের পাত। তার চারটে কাস্তের মতো বাঁকা, ধারগুলোও ধারাল। পঞ্চমটা আঙুলের মতো করা, তাতে শিঙের হাতল। দক্ষ হাতে পড়লে

সশব্দে বাতাস কেটে এগিয়ে গিয়ে কুড়ি হাত দূরের শত্রুকেও ঘায়েল করতে পারে।

বিষণ্নমনে পান্দিওন চারদিকে চেয়ে নতুন সহযাত্রী আর জাহাজের মালিকদের যাচাই করে নিল। তাদের রুক্ষ, বাতাসে পোড়া মুখের রং ঝামার মতো। অবিন্যস্ত দাড়ি জড়িয়ে আছে চিবুকের উপর। তাদের ভারী চলনে, ঠোঁট আর কপালের কঠোর ভাঁজে কিদগোর জাতির স্বভাবসিদ্ধ মায়ামমতার কোন ছাপ নেই। কিন্তু তবুও তাদের প্রতি পান্দিওনের বিশ্বাস আছে। তার কারণ হয়ত বাতাসের সন্তানরাও তার মতো সমুদ্রের ভক্ত, তারাও সমুদ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জীবনধারণ করে, সমুদ্রকে জানে, কিম্বা হয়ত তাদের কথাবার্তায় কাভি আর পান্দিওন পরিচিত শব্দ শুনতে পেয়েছে, তাই...

মাশুল পেয়ে বাতাসের সন্তানরা সহজেই পূর্বতন ক্রীতদাসদের সঙ্গে নিতে রাজী হল। কিদগোর মামা, ইওরুমেফু তো আবার দরদস্তুর করে ছটা হাতির দাঁত আর দুঝুড়ি কবিরাজী বাদাম কমিয়েও নিয়েছে। অবশ্য সেগুলোকেও জাহাজে তোলা হয়েছে কাভি, পান্দিওন আর লিবীয়ার লোকেদের সম্পত্তি হিসেবে। বাতাসের সন্তানরা যাত্রীদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের আলাদা করে দিল। লিবীয়ার ছজন উঠল এক জাহাজে, তাদের বাকি তিনজন পান্দিওন আর কাভি আরেক জাহাজে।

বাতাসের সন্তানদের বন্দর কুয়াশাদ্বারের কাছাকাছি। কিদগোর দেশ থেকে অনেক অনেক দূরে — ভাল আবহাওয়াতেও দুমাসের যাত্রা। কাভি আর পান্দিওন তাই বড়ই মুষড়ে পড়ল। এই বিরাট দূরত্বের কোন ধারণাই তাদের নেই। তবে একথা বুঝল যে, বাতাসের সন্তানরা সমুদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে খুবই দক্ষ হাতি জাতিরা যেমন দক্ষ আফ্রিকার সমতলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। বাতাসের সন্তানদের বন্দর থেকে পান্দিওনকে যেতে হবে আরো দূরে, প্রায় পুরো সবুজ সাগরটা পেরিয়ে। কিন্তু বাতাসের সন্তানদের জাহাজ-ঘাটা থেকে কিদগোর গ্রাম যতদূর পান্দিওনের দেশ তার একতৃতীয়াংশের অল্প কিছু বেশি হবে। বাতাসের সন্তানরা পান্দিওন আর কাভিকে অনেক আশ্বাস দিল। বলল, টায়ার,

ক্রীট, সাইপ্রাস আর সিদ্রা উপসাগর থেকে প্রায়ই ফিনিশীয় জাহাজ তাদের দেশে আসে।

পান্দিওন অবশ্য তীরে দাঁড়িয়ে সেসব কথা ভাবছিল না। সে তখন সমুদ্রের দিকে চেয়ে যেন যাত্রার দীর্ঘপথটা মাপতে চায়। তারপর কিদগোর দিকে ঘুরে তাকাল। জাহাজদলের দলপতি, কোঁকড়া চুলে খাঁটি সোনার পাত পরা লোকটি হাঁক দিয়ে সবাইকে জাহাজে উঠে পড়তে বলল।

কিদগো, পান্দিওন আর কাভির হাতদুটো চেপে ধরল। চোখের জল লুকবার কোন চেষ্টাই সে করল না। ফিসফিস করে বলল:

'চিরবিদায় পান্দিওন, চিরবিদায় কাভি! তোমাদের দূর দেশে গিয়েও কিদগোকে মনে রেখ। সে তোমাদের দুজনকে সত্যিই ভালবাসে। মনে রেখ তা-কেমে আমাদের দাসত্বের দিনগুলো, আমাদের বন্ধুত্বই তখন ছিল আমাদের একমাত্র সহায়। মনে রেখ বিদ্রোহের কথা, তারপর আমাদের পলায়ন, আর সমুদ্রের উদ্দেশে মহাযাত্রা… আমার মন সবসময় তোমাদের কাছেই পড়ে থাকবে। তোমরা চিরকালের মতো আমায় ছেড়ে যাচ্ছ। আমার কাছে তোমরা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়!' কিদগোর গলার স্বর জোর হয়ে উঠল। 'আমার বিশ্বাস এমন দিনও আসবে যখন সমুদ্রকে আর মানুষ ভয় করবে না। সমুদ্রই তখন সবাইকে যুক্ত করবে… কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না… আমার দুঃখের ভার সহ্যের অতীত।' কিদগোর বিরাট শরীর কান্নায় কেঁপে উঠল।

বাতাসের সন্তানরা ডাক দিতে তিন বন্ধু শেষবারের মতো হাতে হাতে মেলাল…

তারপর পান্দিওনের হাত গেল আলগা হয়ে, কাভি জাহাজের দিকে এগোল। উষ্ণ জলে পা ফেলে পিছল পাথরের উপর ভর রেখে তারা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল জাহাজের দিকে।

বহু বছর পর এই প্রথম পান্দিওন জাহাজের পাটায় পা দিল। মনে পড়ল দূর অতীতে জাহাজে ভাসার খুসিতে ভরা দিনগুলো। সে স্মৃতি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য ভেসে এসে মিলিয়ে যায়। পান্দিওনের সমস্ত

মন পড়ে রয়েছে তীরে একেবারে জলের ধারে সবার থেকে তফাতে দাঁড়ান একটি দীর্ঘকায় কালো লোকের কাছে। দাঁড়ের শব্দ হল। তালে তালে বেড়ে উঠল দাঁড়ের গতি। পাথরমালা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল জাহাজ। মাল্লারা মেলে দিল বড় পালটা। জাহাজটাকে ঠেলে নিয়ে চলল বাতাস।

তীরের লোকেরা ক্রমশ ছোট হয়ে গেল। কিদগো — বন্ধুদের কাছ থেকে সে চিরদিনের মতো দূরে পড়ে গেছে — পরিণত হল কালো ফোঁটায়। ঘনিয়ে আসা গোধূলির ছায়ায় তটরেখা ঢাকা পড়েছে, কেবল কালো পাহাড় তখনো রয়েছে বিষণ্ণভাবে জাহাজের হালের পিছনে। চোখের জলের একটা বড় ফোঁটা কাভি মুছে ফেলল, এটাই প্রথম ফোঁটা নয়। একটা মস্ত বাদুড় তীরের দিক থেকে উড়ে এসে পান্দিওনের মুখে ডানার ঝাপটা মেরে চলে গেল — তীরের সমান্তরালেই চলেছে জাহাজটা। ডানার হালকা রেশমী ছোঁয়ায় পান্দিওনের মনে হল এ দেশ বুঝি তাকে শেষ বিদায়ের বাণী পেঁছে দিল।

গভীর দুঃখের সঙ্গে পান্দিওন ছেড়ে এল তার নিগ্রো বন্ধুকে। ছেড়ে এল এই মহা দেশকে, যেখানে তাকে পার হতে হয়েছে কতকিছু, তার হৃদয়ের একটি অংশ সে যেখানে রেখে দিয়ে যাচ্ছে। পান্দিওনের অস্পষ্টভাবে মনে হল, ভবিষ্যতে অবসাদ আর দুঃখের সময়ে মাতৃভূমিতে তার নিজের বাড়িতে চোখের সামনে ভেসে উঠে হাতছানি দেবে আফ্রিকা। ইরুমার মতো সে দেশকেও চিরদিনের জন্য হারিয়েছে বলেই তার সৌন্দর্য সবসময় তাকে আকর্ষণ করবে। পান্দিওনের সত্তার অংশ হয়ে উঠেছিল যা সব তাদের ছেড়ে যাবার সময়, হেলাসের দিকে মুখ আর হৃদয় ফেরাতেই তার মনে দেখা দিল ভয়ের ছায়া। এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর সেখানে গিয়ে সে কী দেখবে, কী পাবে?

যে পান্দিওন দেশ ছেড়েছিল তার সঙ্গে আজকের পান্দিওনের অনেক তফাৎ। ফিরে গিয়ে সে কাকে পাবে? কারা বেঁচে আছে কে জানে? তেস্‌সা... এখনো কি সে বেঁচে আছে, এখনো কি সে তাকে ভালবাসে কিম্বা...

ক্লান্ত ভঙ্গীতে ঢেউ কেটে এগিয়ে চলেছে পশ্চিমমুখী জাহাজগুলো। বাতাসের সন্তানরা যাত্রীদের বলেছে, একমাস পশ্চিমমুখে চলে তারপর তারা উত্তরে ঘুরবে। মহাসমুদ্রের জোরাল হাওয়া পান্দিওনের চুল ঘেঁটে দিচ্ছে। কড়ামুখ মৌন খালাসীরা চারপাশে কাজ করে চলেছে। ক্রীটের প্রাচীন নাবিকদের বংশধর বাতাসের সন্তানরা আফ্রিকার কালো লোকদের চেয়ে পান্দিওনের কাছে বেশি অপরিচিত। বুকের কাছের ঝোলাটা চেপে ধরে — তার ভিতরে কিদগোর প্রতিকৃতি খোদাই করা পাথরটা রয়েছে — পান্দিওন এগিয়ে গেল তার সঙ্গীদের দিকে। তারা তখন সবাই বিষণ্ণ মনে একত্র হয় বিদেশী জাহাজের এককোণে...

পাহাড়ের আড়াল থেকে উঠে এল গোল একখানা কমলারঙা চাঁদ। তার আলোয় সারা পৃথিবীকে ঘিরে থাকা মহাগোলার্ধ, মহাসমুদ্রের জলে দেখা দিল কালো কালো গর্ত, তাদের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে ঢেউয়ের আলোকমুকুট। ছোট্ট জাহাজগুলো সাহসে ভর করে এগিয়ে চলেছে। তাদের তীক্ষ্ণ গলুই মাথা তুলছে তারায় ভরা রুপোলি আলো ঝরান আকাশের দিকে, পর মুহূর্তে নেমে আসছে একঘেয়ে গর্জনে ভরা বিষণ্ণ অন্ধকারে। পান্দিওনের মনে হল তার জীবন কাহিনীই যেন এতে ফুটে উঠেছে। সামনে, বহুদূরে ঢেউয়ের নানা রং চূড়াগুলো মিলেমিশে সৃষ্টি করেছে এক উজ্জ্বল আলোর পথ। তারাগুলো নেমে এসে দোল খাচ্ছে জলের বুকে। ঠিক তার জন্মভূমিতে যেমনটি করত। মহাসমুদ্র এই সাহসী পুরুষদের গ্রহণ করেছে, রাজী হয়েছে বুকে করে তাদের দূর পথ পার করে দিতে — বাড়ি পৌঁছে দিতে...

'ইউপালিন, সমুদ্ররঙের পাথরের ক্যামিওটা দেখেছ? এনিয়াদায়, সত্যি বলতে কি, সারা হেলাসেই এমন নিখুঁৎ কাজ আর পাবে না।'

ইউপালিন সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল না। শক্তিশালী লম্বা এক ক্রীতদাসের হাতে ধরা তার প্রিয় ঘোড়ার ডাক মন দিয়ে শুনতে শুনতে সে সুন্দর পশমের জোব্বাটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল। চালার ছাউনিতে বসন্তের হাওয়ায় একটু শীতের আমেজ। অবশ্য সামনে পাথুরে

পাহাড়গুলোর পাঁশুটে ঢালুর বুক তখন ফুলফোটা গাছে ছেয়ে গেছে। নিচে বাদাম কুঞ্জ ঢেউ ছড়িয়েছে পেলব গোলাপী রঙের। তার উপরে, ঢালুর আরো উঁচুতে, ঘন গোলাপী রঙের ছোঁয়া — প্রায় বেগুনীই বলা যায় — পরিচয় দিচ্ছে ঘন ঝোপঝাড়ের! পাহাড় থেকে আসা ঠাণ্ডা হাওয়ায় বাদামগাছের গন্ধ। এনিয়াদার উপত্যকায় নব বসন্তের দূত তারা। জোরে নিঃশ্বাস টেনে ইউপালিন একটা কাঠের স্তম্ভের গায়ে আঙুল ঠুকল।

তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'শুনেছি আগেনরের পালিত সন্তানের কাজ ঐ ক্যামিওটা। বহু বছর সে বিদেশে কাটায়... সবাই ধরে নিয়েছিল, ও মরে গেছে। কিন্তু সম্প্রতি সে কোন দূর দেশ থেকে যেন ফিরে এসেছে।'

'আগেনরের মেয়ে সুন্দরী তেস্‌সার কথাও নিশ্চয় শুনেছ?'

'শুনেছি ছ'বছর ধরে মেয়েটি কাউকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তার প্রণয়ী ফিরে আসবে। তার বাবা, শিল্পী আগেনর, তাকে অনুমতিও দিয়েছিলেন...'

'শুধু যে তেস্‌সাকে অপেক্ষা করার অনুমতি দিয়েছিলেন তাই নয়, নিজেও পালিত ছেলের পথ চেয়ে ছিলেন।'

'আশা সফল হওয়ার যত দুর্লভ ঘটনা শোনা যায় এটিও তার একটি। লোকটি মারা যায়নি। তেস্‌সাকে বিয়ে করে বড় শিল্পী হয়ে উঠেছে। ক্যামিওটা তুমি দেখতে পেলে না, এ বড়ই দুঃখের কথা। সমঝদার লোক তুমি কাজটার খুবই তারিফ করতে।'

'আগেনরের ওখানে তবে যাব একবার। উনি তো আখেলই অন্তরীপের কাছে থাকেন। এখান থেকে কুড়ি স্টেডিয়ার বেশি হবে না...'

'কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেল যে ইউপালিন। ক্যামিওর শিল্পী খোদাই-করা পাথরটা তার এক এত্রাস্‌কান বাউণ্ডুলে বন্ধুকে উপহার দিয়েছে — একবার ভেবে দেখ, কী কাণ্ড! এত্রাস্‌কান লোকটি বাড়ি ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শিল্পী তাকে আগেনরের বাড়ি নিয়ে যায়। সেবাশুশ্রূষা করে তাকে ভাল করে তোলে তারপর তাকে ঐ রত্ন উপহার দেয়, যে রত্নের ফলে সারা এনিয়াদা বিখ্যাত হয়ে

উঠতে পারত। এত্রাস্কান লোকটি তার বদলে একটা বিশ্রী জন্তুর চামড়া তাকে দিয়ে গেছে। সেই বীভৎস জন্তুর কথা কেউ কখনো শোনেওনি ...'

'লোকটি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিল ভিখারী হয়ে, ফিরেও এল ভিখারীর মতো। ভ্রমণের সময় সে কি কিছুই শেখেনি যার ফলে অমন দুর্মূল্য উপহারও সে যাকে তাকে দিয়ে দিতে পারে!'

'বহুবছর দেশবিদেশে যে কাটিয়েছে তাকে বুঝতে পারা তোমার আমার সাধ্য নয়। কিন্তু তবু ক্যামিওটা দেশ ছাড়া হল বলে আমার দুঃখ হয়!'

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবোভ্স্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

Иван Ефремов

НА КРАЮ ОЙКУМЕНЫ